Uniform Curriculum Structure for 2 Year B.Ed. Programme in West Bengal

SEMESTER-II
COURSE-VII-(A)

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ইতিহাস)

Pedagogy of Social Science Teaching (History)

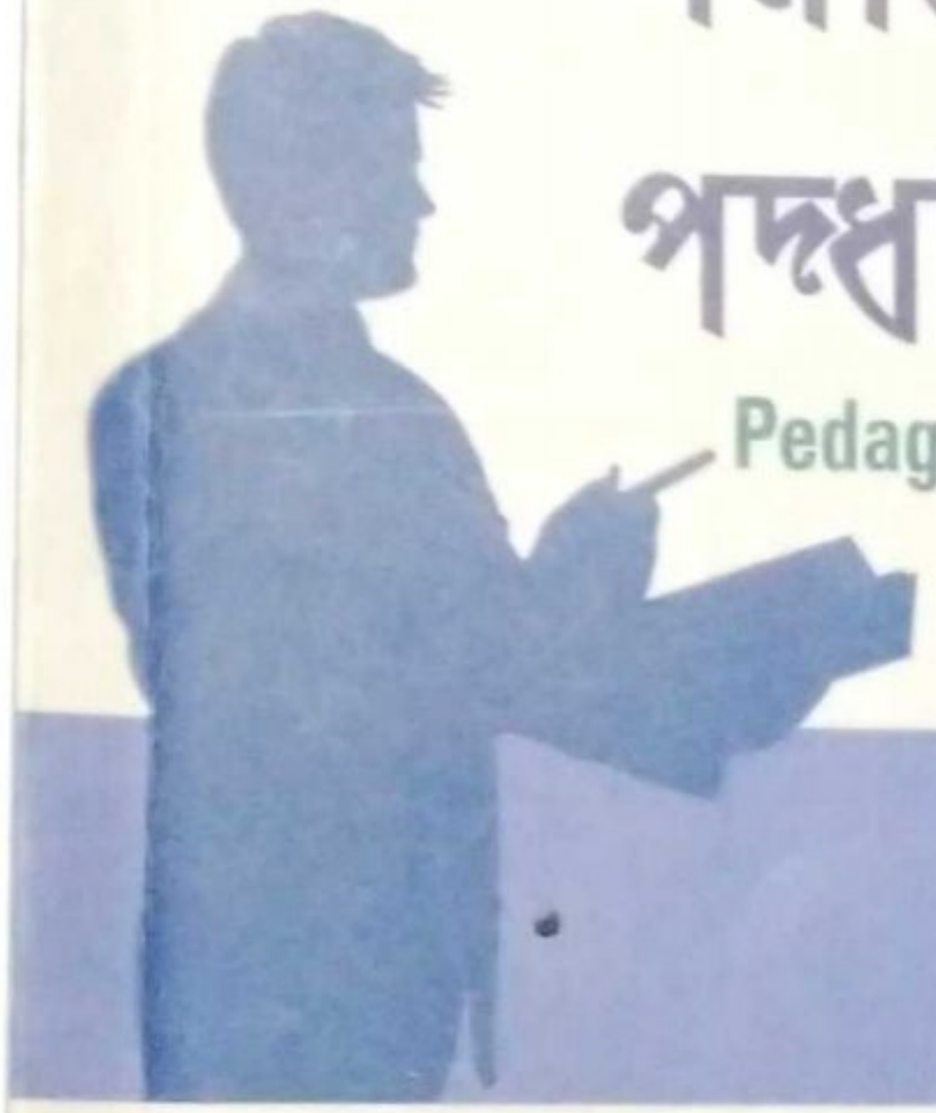

তারিণী হালদার
গৌতম কুমার বিশ্বাস

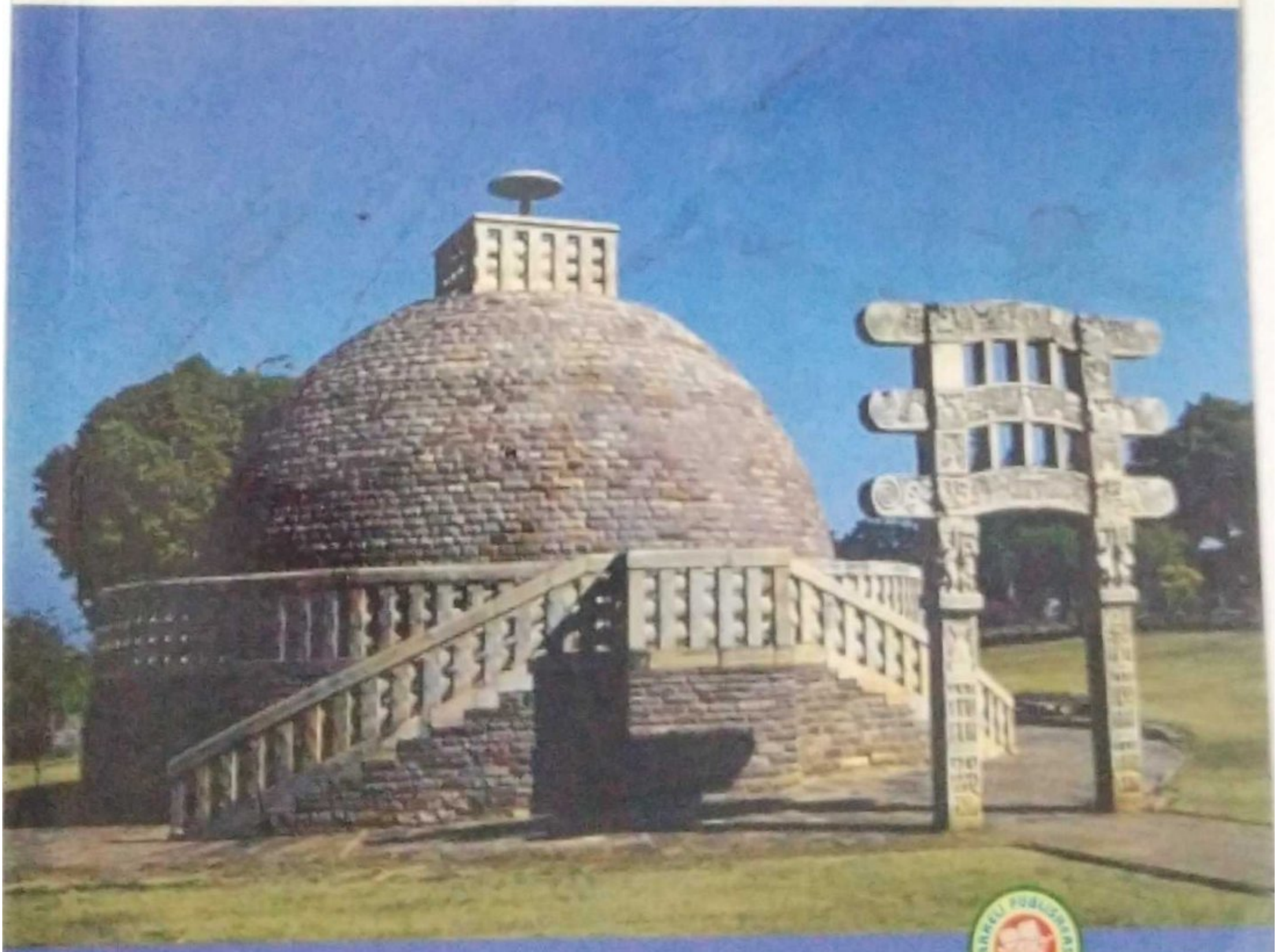

ebook.dascoaching.in

আহেলি পাবলিশার্স

Scanned with CamScanner

'The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration' অধীনস্ত পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, West Bengal State University, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়) সুনির্দিষ্ট, অভিন্ন (Uniform) পাঠ্যক্রম অনুসারে রচিত একটি আদর্শ মানের বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ।

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ইতিহাস)

Pedagogy of Social Science Teaching (History)

Course–VII-(A) (1.2.7A)

তারিণী হালদার

সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

গৌতম কুমার বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, উলুবেড়িয়া কলেজ, বিএড বিভাগ, হাওড়া

Dinajpur B. Ed. College • D/Dinajpur • EST—2009

আহেলি পাবলিশার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০০৯

Ph : (033) 2241 0308 Mb : 9007428045/9874378128

E-mail : aahelipublisherscal@gmail.com

Website : www.aahelipublishers.com

Scanned with CamScanner

Dakshin Dinajpur B. Ed. College
Call No.....
Acc No....3004

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৬
প্রকাশক : অসীমকুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকার

আহেলি পাবলিশার্স
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯

অক্ষরবিন্যাস : আহেলি পাবলিশার্স

মুদ্রণ : অনিতা এন্টারপ্রাইজ

ISBN : 81-89169-40-8

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক ও প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। অন্য কোনোরকম বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এই বইটি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না এবং বইটির কোনো গ্রহীতার ক্ষেত্রেও তাকে এই একই শর্ত আরোপ করতে হবে। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মূল্য : ১৯০.০০ টাকা (INR 190/-)

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং এর সকল নাগরিক যাতে :

সামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ন্যায়বিচার; চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন; এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে;

তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করে আমাদের সংবিধান সভায় আজ, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

Scanned with CamScanner

THE CONSTITUTION OF INDIA
Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all—

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do hereby Adopt, enact and give to ourselves this constitution.

ভূমিকা

NCTE 2014-র নতুন Regulation অনুসারে, West Bengal Government থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে "The West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration" অধীনে একটি Uniform B.Ed. Syllabus দেওয়া হয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিএড কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ভিত্তিগত সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম।

এই পাঠক্রমে এসেছে অভিনবত্ব ও নতুনত্বের ছোঁয়া। এই পাঠক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্রান্ত দিকদর্শন হল বই, যা শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করে নানা ভাবরসে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন পাঠক্রম অনুসারে বিএড শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হল—**সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ইতিহাস)** [Pedagogy of Social Science Teaching (History) Course–VII-(A) (1.2.7A)] বইটি।

যুগ প্রয়োজনে যেমন অনিবার্য হয় পাঠক্রম পরিবর্তন, তেমনি সেই পরিবর্তিত পাঠক্রম নির্ভর গ্রন্থের বিষয়, প্রকরণ, প্রকাশনেও ঘটে তার স্বাভাবিক রূপান্তর। নতুন পাঠসূচি অনুযায়ী লিখিত পাঠ্যপুস্তক বাজারে নেই। শিক্ষার্থীদের অসুবিধা দূর করার জন্য এবং চাহিদা পূরণ করার জন্য পুস্তকটি রচনা করার পথে অগ্রসর হই। নব প্রবর্তিত পাঠক্রম অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বইটি অপরিহার্য করে তোলার জন্যে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না, আমাদের দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বইটি তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে আহেলি পাবলিশার্স-এর দুই কর্ণধার অসীম কুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকারকে জানাই আশেষ ধন্যবাদ এবং এই সংস্থার প্রকাশনার কাজে যুক্ত তন্ময় ভট্টাচার্য ও সমীর নস্করকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম প্রকাশিত এই পুস্তকখানিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে বা বক্তব্য বিশ্লেষণে যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তবে আশা করব, আপনারা তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং বিষয়টির গঠনমূলক সমালোচনা করে আমাকে সমৃদ্ধ করবেন। পুস্তকটি যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

বিএড পাঠক্রমের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রার্থনা করি পুস্তকখানির গুণগত মান সম্পর্কে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মতামত।

২৮ মার্চ, ২০১৬
কলকাতা-৯

তারিণী হালদার
গৌতম কুমার বিশ্বাস

Scanned with CamScanner

The West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration

SEMESTER-II

Course-VII-(A) (1.2.7A)	Pedagogy of a School Subject Part-I	Theory	Engagement With the Field	Credit	2+2
		50	50	Class Hours	32+64
Pedagogy of Language Teaching	**History, Geography, Political Science, Economics, Education, Commerce, Sociology, Philosophy, Music, Fine Arts, Psychology**				
Objectives	The student teachers will be able to :- 1. Appreciate the significance of teaching Social Science. 2. Be acquainted with the approaches & Methods of Teaching Social Science. 3. Be used to the application of knowledge and skills in Social Science. 4. Be acquainted with various practical aspects of Social Science.				
COURSE CONTENT/SYLLABUS					
Unit-I	**Foundation of Social Science Teaching:** ● Aims and objectives of Social Science Teaching. ● Social Science Curriculum, Values of Social Science Teaching. ● Inter relationship of various branches of Social Science ● Innovations in Social Science teaching ● Inculcation of National Integrity through social science teaching.				6 hrs.
Unit-II	**Strategies of Social Science Teaching:** ● Features, Limitations and comparison of different me ● Lecture Method, ● Interactive Method ● Demonstration-observation method, ● Regional Method ● Heuristic Method, ● Project Method ● CAI				7 hrs.

Scanned with CamScanner

Unit-III	**Learning Resource in Social Science Teaching:** ● Meaning, type and importance of Learning Resources. ● Quality of good social science text book. ● Teaching aids in Social Science. ● Improvisation of Teaching Aids. ● Planning and organization of Social Science Laboratory	6 hrs.
Unit-IV	**Social Science Teacher:** ● Qualifications and qualities of social science Teachers. ● Professional growth of Social Science Teacher.	6 hrs.
Unit-V	**Evaluation in Social Science Education:** ● Evaluation devices, evaluation programme in social studies ● Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation; formative and summative evaluation, diagnose and remediation; construction of assessment tools like achievement test.	7 hrs.

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় **সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের ভিত্তি** ১৭-১৪২
Foundation of Social Science Teaching

১.০ ইতিহাসের ধারণা (Concept of History)

১.১ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Social Science Teaching)

১.১.১ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Teaching History at Secondary Stage)

১.১.২ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য (Aims of Teaching History at Higher Secondary Level)

১.২ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) পাঠক্রম এবং সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Social Science Curriculum, Values of Social Science Teaching)

১.২.১ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের মূল্য (Values of Social Science Teaching)

১.২.২ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) পাঠক্রম (Social Science Teaching)

১.৩ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter relationship of various branches of Social Science)

১.৩.১ ইতিহাস ও ভূগোল (History and Geography)

১.৩.২ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (History and Political Science)

১.৩.৩ অর্থনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক (Relation between Economics and History)

১.৩.৪ ইতিহাস ও সাহিত্য (History and Literature)

১.৪ সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি [Innovations in teaching Social Science (History)]

Scanned with CamScanner

১.৪.১ নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ (Constructivist Approach of Teaching)
১.৪.১.১ নির্মিতিবাদের অর্থ (Meaning of constructivism)
১.৪.১.২ নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of constructivism)
১.৪.১.৩ নির্মিতিবাদের প্রকারভেদ (Type of constructivism)
১.৪.১.৪ নির্মিতিবাদী শিখনের নক্শা (Constructivist Learning Design)
১.৪.১.৫ নির্মিতিবাদের পঞ্চ 'E' (Five Es of Constructivism)
১.৪.১.৬ নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Constructivist classroom)
১.৪.১.৭ নির্মিতিবাদী শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in constructivist approach of Teaching)
১.৪২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা কৌশল (Brain Storming Strategy)
১.৪.২.১ মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝার অর্থ (Meaning of Brain Storming)
১.৪.২.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা সংগঠিত করার পদ্ধতি (Brain Storming Method)
১.৪.২.৩ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা (Advantages of Brain Storming Strategy)
১.৪.২.৪ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের অসুবিধা (Disadvantages of Brain Storming Strategy)
১.৪.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণ (Reflective Teaching)
১.৪.৩.১ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and defination of Reflective Teaching)
১.৪.৩.২ চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Reflective Teaching)
১.৪.৩.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Reflective Teaching)
১.৪.৩.৪ চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা (Role of teacher & learner in Reflective Teaching)
১.৪.৩.৫ চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাসমূহ (Advantages of Reflective Teaching)
১.৪.৩.৬ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Reflective Teaching)
১.৪.৪ নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching)

১.৪.৪.১ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা (Specific Problems of Learners)
১.৪.৪.২ নিরাময়কারী শিক্ষার অর্থ (Meaning of Remedial Education)
১.৪.৪.৩ শিখন অক্ষমতা এবং নিরাময়কারী শিক্ষা (Learning Disabilities and Remedial Education)
১.৪.৪.৪ নির্দিষ্ট পশ্চাদপদতা এবং শিখন অক্ষমতার বিভিন্ন লক্ষণ (Specific Backwardness and different warning signs of learning disabilities)
১.৪.৫ শিক্ষণ কৌশলে নতুন প্রযুক্তি (New Technology in Teaching Stratigies)
১.৪.৫.১ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ভূমিকা (Role of Multimedia as Technology in Teaching Stratigies)
১.৪.৫.২ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে সি.ডি.রম (CD-Rom as Technology in Teaching Strategies)
১.৪.৫.৩ শিক্ষণ-কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনা (Web-based instructions as Tecechnology in Teaching Stratigies)
১.৪.৫.৪ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি (Intelligent tutoring system as technology in teaching strategies)
১.৫ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির বিকাশ (Inculcation of National Integrity through social science teaching)
১.৫.১ জাতীয় সংহতির ধারণা (Concept of National Integration)
১.৫.২ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা
১.৫.৩ জাতীয় সংহতির বিকাশে ইতিহাস শিক্ষণের ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের কৌশল ১৪৩-১৮২
(Strategies of Social Science Teaching)

২.০ বিভিন্ন শিক্ষার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা এবং তুলনা (Features, Limitations and comparison of different methods)
২.১ বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)
২.২ আলোচনা বা মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি (Interactive Method)
২.৩ প্রতিপাদন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Demonstration-observation method)

Scanned with CamScanner

২.৪ **আঞ্চলিক পদ্ধতি** (Regional Method)
২.৫ **আবিষ্কার পদ্ধতি** (Heuristic Method)
২.৬ **প্রকল্প পদ্ধতি** (Project Method)
২.৭ **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা** (CAI)

তৃতীয় অধ্যায় **সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) শিখনসম্পদ ১৮৩-২৫৬**
(Learning Resource in Social Science Teaching)

৩.১ **শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব** (Meaning, type and importance of Learning Resources)
৩.১.১ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Resoures)
৩.১.২ শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources)
৩.১.৩ শিখন সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Learning Resources)
৩.১.৪ শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Learning Resources)
৩.১.৫ ইতিহাস শিক্ষণে শিখন সম্পদ
৩.২ **সমাজ বিজ্ঞানের (ইতিহাস) ভালো পাঠ্যবই-এর গুণাবলি** (Quality of good social science text book)
৩.২.১ ভূমিকা (Introduction)
৩.২.২ পাঠ্য পুস্তক (Text Book)
৩.২.৩ পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance of text book)
৩.২.৪ ভালো সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good Social Science Text book)
৩.২.৫ ভালো ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good History Text book)
৩.৩ **সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) শিখন সহায়ক উপকরণ** (Teaching aids in Social Science)
৩.৩.১ শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণের ধারণা (Concept of Teaching Aids and Appliances)
৩.৩.২ শিক্ষণ প্রদীপনের সংজ্ঞা (Definitions of Teaching Aids)
৩.৩.৩ শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা (Utility of Teaching Aids)
৩.৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি (Essential Qualities of Teaching Aids)

৩.৩.৫ শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা (Limitation in the uses of Teaching Aids)
৩.৩.৬ শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Teaching Aids)
৩.৪ **শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন** (Improvisation of Teaching Aids)
৩.৪.১ ভূমিকা (Introduction)
৩.৪.২ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Improvised Teaching Aids)
৩.৪.৩ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ পদ্ধতি (Process of Developing Improvised Teaching Aids)
৩.৪.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষণ প্রদীপন তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের গুরুত্ব (Importance of Improvised Teaching Aids in Teaching Education)
৩.৪.৫ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণ ও কার্যকরী ব্যবহারে সমস্যা (Problems in the Development and Effective use of Improvised Teaching Aid)
৩.৪.৬ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের দৃষ্টান্ত (Improvisation of Teaching Aids Example)
৩.৫ **সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) গবেষণাগারের পরিকল্পনা** (Planning and organization of Social Science Laboratory)
৩.৫.১ ইতিহাস ল্যাবরেটারির অর্থ (Meaning of Education Laboratory)
৩.৫.২ ইতিহাস ল্যাবরেটারির প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব (Need and Importance of Education Laboratory)
৩.৫.৩ ইতিহাস ল্যাবরেটারির পরিকল্পনা (Designing of Education Laboratory)
৩.৫.৪ ইতিহাস ল্যাবরেটারিতে যে সমস্ত শিক্ষামূলক সামগ্রী ও উপকরণ রাখা যেতে পারে (Type of Maerial and Equipment to be kept in a Education Laboratory)

চতুর্থ অধ্যায় **সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাসের) শিক্ষক ২৫৭-২৭৪**
(Social Science Teacher)

৪.১ **সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের (ইতিহাসের) যোগ্যতা ও গুণাবলি** (Qualifications and qualities of social science Teachers)
৪.১.১ ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি (Important Qualities of Teacher according to National Knowledge Commission, 2008)

Scanned with CamScanner

৪.২ **সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন** (Professional Growth of the Social Science)
৪.২.১ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন—ধারণা
৪.২.২ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব (Importan of professional development of Teacher)
৪.২.৩ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি (Type of Professional Development Programme)
৪.২.৪ ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি (Professional Development Programme of History Teacher)
৪.২.৫ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের সংস্থা (Agencies of Professional Development of Teacher)

পঞ্চম অধ্যায় **সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাসের) মূল্যায়ন ২৭৫-৩৪৪**
(Evaluation in Social Science Education)

৫.১ **সমাজবিজ্ঞানে মূল্যায়নের হাতিয়ার ও মূল্যায়নের কর্মসূচি** (Evaluation devices, evaluation programme in social studies)
৫.১.১ মূল্যায়নের হাতিয়ার (Evaluation devices)
৫.১.২ সমাজবিজ্ঞানের মূল্যায়নের কর্মসূচি (Evaluation programme in social studies)
৫.২ **সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন, নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন, গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন, নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন, মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা** (Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation, formative and summative evaluation, diagnose and remediation, construction of assessment tools like achievement test.)
৫.২.১ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন (Competency based evaluation)
৫.২.২ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন (Continuous and comprehensive evaluation)
৫.২.৩ গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Formative and summative evaluation)
৫.২.৪ নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন (Diagnose and remediation
৫.২.৫ মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা (Construction of assessment tools like achievement test)

ব্যবহারিক অংশ ৩৪৫
Practicum [Engagement with Field]

Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in
This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
www.ebook.dascoaching.in
Scanned with CamScanner

অধ্যায় ১

সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের ভিত্তি
(Foundation of Social Science Teaching)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

১.০ ইতিহাসের ধারণা (Concept of History)

১.১ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Social Science Teaching)

১.১.১ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Teaching History at Secondary Stage)

১.১.২ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য (Aims of Teaching History at Higher Secondary Level)

১.২ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) পাঠক্রম এবং সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Social Science Curriculum, Values of Social Science Teaching)

১.২.১ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের মূল্য (Values of Social Science Teaching)

১.২.২ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) পাঠক্রম (Social Science Teaching)

১.৩ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter relationship of various branches of Social Science)

১.৩.১ ইতিহাস ও ভূগোল (History and Geography)

১.৩.২ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (History and Political Science)

১.৩.৩ অর্থনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক (Relation between Economics and History)

১.৩.৪ ইতিহাস ও সাহিত্য (History and Literature)

১.৪ সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি [Innovations in teaching Social Science (History)]

১.৪.১ নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ (Constructivist Approach of Teaching)

Scanned with CamScanner

১.৪.১.১ নির্মিতিবাদের অর্থ (Meaning of constructivism)
১.৪.১.২ নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of constructivism)
১.৪.১.৩ নির্মিতিবাদের প্রকারভেদ (Type of constructivism)
১.৪.১.৪ নির্মিতিবাদী শিখনের নক্‌শা (Constructivist Learning Design)
১.৪.১.৫ নির্মিতিবাদের পঞ্চ 'E' (Five Es of Constructivism)
১.৪.১.৬ নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Constructivist classroom)
১.৪.১.৭ নির্মিতিবাদী শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in constructivist approach of Teaching)
১.৪২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা কৌশল (Brain Storming Strategy)
১.৪.২.১ মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝার অর্থ (Meaning of Brain Storming)
১.৪.২.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা সংগঠিত করার পদ্ধতি (Brain Storming Method)
১.৪.২.৩ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা (Advantages of Brain Storming Strategy)
১.৪.২.৪ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের অসুবিধা (Disadvantages of Brain Storming Strategy)
১.৪.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণ (Reflective Teaching)
১.৪.৩.১ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and defination of Reflective Teaching)
১.৪.৩.২ চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Reflective Teaching)
১.৪.৩.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Reflective Teaching)
১.৪.৩.৪ চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা (Role of teacher & learner in Reflective Teaching)
১.৪.৩.৫ চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাসমূহ (Advantages of Reflective Teaching)
১.৪.৩.৬ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Reflective Teaching)
১.৪.৪ নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching)
১.৪.৪.১ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা (Specific Problems of Learners)

১.৪.৪.২ নিরাময়কারী শিক্ষার অর্থ (Meaning of Remedial Education)
১.৪.৪.৩ শিখন অক্ষমতা এবং নিরাময়কারী শিক্ষা (Learning Disabilities and Remedial Education)
১.৪.৪.৪ নির্দিষ্ট পশ্চাদপদতা এবং শিখন অক্ষমতার বিভিন্ন লক্ষণ (Specific Backwardness and different warning signs of learning disabilities)
১.৪.৫ শিক্ষণ কৌশলে নতুন প্রযুক্তি (New Technology in Teaching Stratigies)
১.৪.৫.১ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ভূমিকা (Role of Multimedia as Technology in Teaching Stratigies)
১.৪.৫.২ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে সি.ডি.রম (CD-Rom as Technology in Teaching Strategies)
১.৪.৫.৩ শিক্ষণ-কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনা (Web-based instructions as Tecechnology in Teaching Stratigies)
১.৪.৫.৪ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি (Intelligent tutoring system as technology in teaching strategies)

১.৫ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির বিকাশ (Inculcation of National Integrity through social science teaching)
১.৫.১ জাতীয় সংহতির ধারণা (Concept of National Integration)
১.৫.২ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা
১.৫.৩ জাতীয় সংহতির বিকাশে ইতিহাস শিক্ষণের ভূমিকা

✪ ১.০ ইতিহাসের ধারণা (Concept of History) :

ল্যাতিন শব্দ 'Historia', ফরাসি শব্দ Historie এবং ইংরেজি History শব্দের অর্থ হল অনুসন্ধান। পরবর্তীকালে গ্রিকরা মনে করেন ইতিহাস হল 'a record or narration of the result of inquiry'। সুতরাং ইতিহাস বলতে শুধুমাত্র অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে বোঝায় না, অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বা জ্ঞানের লিপিবদ্ধকরণ—এই উভয় প্রক্রিয়াকে বোঝায়। ইতিহাসের জনক হিসেবে খ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক **হেরোডোটাস** প্রথম History (Humanstory) শব্দটি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ইতিহাস হল মানুষের কাহিনি। এর পর থেকেই শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে। বাংলায় ইতিহাস শব্দটি এসেছে 'ঐতিহ্য' শব্দ থেকে

Scanned with CamScanner

যার অর্থ হল 'অতীতে যা ঘটেছে'। এই অর্থে ইতিহাস হল অতীতের কাহিনি। হেরোডোটাস ইতিহাসকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে মর্যাদা দেন (an independent field of study)।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মানব সভ্যতার রাজনৈতিক উত্থান পতনের কাহিনিই ইতিহাসের উপাদানরূপে বিবেচিত হত। এমনকি অলৌকিক রাজা-বাদশার কাহিনি ও যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনি ইতিহাস রূপে মর্যাদা পেত। বিভিন্ন ঘটনা বা লোকগাথা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জার্মান ঐতিহাসিক **র‍্যাঙ্কে** এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আজকের ইতিহাস রচনার জয়যাত্রা শুরু হয়। ইতিহাস ক্রমে তথ্য নির্ভর ও বিজ্ঞানধর্মী হয়ে ওঠে। ইতিহাসের পরিসর সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা হতে থাকে। মনস্তত্ত্ব, পরিবেশ বিদ্যা (Environmental study), নারীবিদ্যা চর্চা (Women study) প্রভৃতি ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তৃণমূলের ইতিহাস চর্চা আজ ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য (Sub-altern study)। মানুষের জনজীবনের বিশ্লেষণ হল ইতিহাসের প্রধান কাজ। তাই ইদানিংকালে ইতিহাস চর্চায় মানুষের মনের কদর বাড়ছে। ইতিহাস বলতে ব্যাপক অর্থে অতীতে যা কিছু ঘটেছে তাকেই বোঝায়। ব্যাপক অর্থে যখন যা কিছু ঘটেছে তাই ইতিহাস **(ড. হেনরি জনসন)**। কিন্তু সাধারণ অর্থে ইতিহাস বলতে আমরা মানুষের ইতিহাসকেই বুঝি। ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হল মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের কাহিনি। এই কারণে ইংরেজ ঐতিহাসিক **মেটল্যান্ড** বলেছিলেন, "অতীতে মানুষ যা করেছে ও বলেছে, সর্বোপরি তারা যা ভেবেছে তাই ইতিহাস হিসেবে পরিগণিত"। সভ্যতার বিবর্তনে শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ মানব সমাজ কীভাবে অগ্রসর হয়েছে তাই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষই ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু। তাই **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,** "There is only one history–the History of Man." ঐতিহাসিক **মার্ক ব্লকের** মধ্যেও ঐ একই মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তার মতে, ইতিহাস হল দেশ ও কালের সীমায় মানুষের কাহিনি।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ইতিহাসের মূল আকর হল মানুষ। মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক **রমেশচন্দ্র মজুমদারের** (১৯৬৫) মতে, "মানুষ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে বৃহত্তর মানব সমাজের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণই হল ইতিহাস।" তবে এই মানুষ শুধুমাত্র রাজা-বাদশা বা বীর যোদ্ধা বা মহৎ ব্যক্তিবর্গ নন, দেশের আপামর জনসাধারণ। উনিশ শতকের খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক **টমাস কার্লাইল,** যিনি একদা দুর্ভাগ্যবশত বলেছিলেন "ইতিহাস হচ্ছে মহামানবের জীবনী।" তিনিই কিন্তু অন্যত্র ইতিহাসে সাধারণ মানুষের

Library Dinabandhu Dinajpur B. Ed College ESTD—2009 D/Dinajpur

ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন। এ[illegible] ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিগণ (নেপো[illegible], লেনিন, মাও সে তুং, গান্ধিজি, নেতাজি, রামমোহন প্রমুখ) তাঁদের অনন্য কৃতিত্ব ও জীবনাদর্শের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবন ও সমসাময়িক ইতিহাসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে গেছেন ও সমাজ গঠনে বা ইতিহাসের গতি প্রকৃতি পরিবর্তনে অনামী বৃহত্তর সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেক সময়েই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। আধুনিক যুগের এক প্রথিতযশা ঐতিহাসিক **এডওয়ার্ড হ্যালেট কার** (E.H.Carr) ইতিহাস চর্চায় উচ্চাসনের মানুষদের কেন্দ্র করে লেখাকে অধুনা অচল বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত রাজন্যবর্গ বা বাদশা সম্প্রদায়, যোদ্ধা, সেনাপতি বা মহৎ ব্যক্তি বর্গের কথা জানা জরুরি হলেও রাজ দরবারের বাইরে যা বৃহত্তর জন সমাজ তার ক্রমবিবর্তন, রূপান্তর এবং পরিবর্তনের অতীতাশ্রয়ী ব্যাখ্যার নাম হল ইতিহাস।

বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে ইতিহাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ঐতিহাসিক **র‍্যাঙ্কের** মতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হল—'অতীত ঠিক যা ছিল।' ঐতিহাসিক **ট্রেভর রোপর** ঐ একই ধরনের মত পোষণ করেন। এই কারণে তিনি বলেন—ঐতিহাসিকের উচিত অতীতকে ভালোবাসা। ঐতিহাসিক **ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের** মতে, ইতিহাস হল মানব সমাজের অতীতের কার্যাবলির বিবরণ। **Mr. Hill** তাঁর আন্তর্জাতিক পুস্তকে লিখেছেন, অতীত দলিল পত্রাদি পরীক্ষা করে মানব সমাজের যে অতীত বিবরণ পাওয়া যায় তাই হল ইতিহাস। অধ্যাপক **জনসন** বলেন, "বুদ্ধির আকারে যে সভ্যতা তার নিজের অতীতের বিবরণ দেয় তাই ইতিহাস।" ইংরেজ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক **টমাস কার্লাইল**-এর মতে ইতিহাস হল ব্যক্তি পূজা বা বীরপূজা। ইতিহাস হল মহান ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপের ইতিহাস এবং একটি দেশের সামাজিক অগ্রগতির পেছনে মহান ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই **R.W. Emerson** বলেন, "There is properly no history but only biography."

কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাসের নেতিবাচক সংজ্ঞা প্রদান করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভলতেয়ার, গিবন, জেমস জয়েস প্রমুখ। **ভলতেয়ারের** মতে, ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনি। আরও এক ধাপ এগিয়ে **গিবন** বলেছেন যে—ইতিহাস হল মানবজাতির দুর্ভাগ্য, মুর্খতা ও অপরাধের নথিবদ্ধ বিবরণী। ইতিহাসের নেতিবাচক ধারণা চূড়ান্ত প্রকাশ **জেমস জয়েসের** লেখায়। তাঁর মতে, History is a nightmare from which I am trying to awaken. অর্থাৎ ইতিহাস তাঁর কাছে একটি দুঃস্বপ্ন, যা কাটিয়ে উঠার অবিরাম চেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন। এঁরা ইতিহাসের নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, ধ্বংসলীলা, অমানবিক অত্যাচার, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতির প্রতি আলোকপাত করেন এবং এর দ্বারা বিচলিত ও মর্মাহত হন।

Scanned with CamScanner

অধ্যাপক **এম. ওকসট** (১৯৩৩) বলেন, "ইতিহাস হল ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতা, ঐতিহাসিক ছাড়া আর কেউ তাকে তৈরি করেন না। ইতিহাস তৈরি করার একমাত্র উপায় সেটি লিখে ফেলা।"

"ইতিহাস রচনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক তথ্য। ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ এবং তথ্যগুলি অতীতের। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ; ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। অতএব ইতিহাস হল ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক অব্যাহত প্রক্রিয়া। বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।" (ই.এচ. কার)।

বেনেদেত্তো ক্রোচের (১৯৪১)-মতে সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস। ইতিহাস মূলত বর্তমানের চোখ দিয়ে ও তারই সমস্যার নিরীখে অতীতকে দেখা। আর ঐতিহাসিকের আসল কাজ নথিকরণ নয়। বরং মূল্যায়ন, তিনি যদি মূল্যায়ন না করেন তাহলে কোনটি নথিবদ্ধ করার উপযুক্ত তা তিনি জানবেন কী করে।

নৈতিক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে **ফ্রয়েড** বলেছেন—"যুগ-যুগান্তরের ন্যায় ও অন্যায়ের নিয়মাবলির ধারক হচ্ছে ইতিহাস।" ঐতিহাসিক বলেছেন ইতিহাস হল জীবন বোধের অভিজ্ঞতার খনি স্বরূপ। কল্পমূলক ভাববাদের প্রবক্তা **হেগেল** বলেছেন—"পরম ইচ্ছার ক্রম উন্মেষের অবিচ্ছেদ্য বিবরণী হল ইতিহাস।" মার্কসীয় দর্শনানুসারে, আজ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস হল শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁর মতে—মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের বিশ্লেষণ হল ইতিহাস। **ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের** মতে, "ইতিহাস জাতির স্মৃতি।" **র‍্যাপসনের** মতে ভাবধারার উন্নতির ধারাবাহিক বিবরণ হল ইতিহাস। **Rickman** তাঁর Meaning in History গ্রন্থে বলেছেন—"The whole historical world spreads before us as a field of human activity."

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদের মতে, ইতিহাস একটি লিপিবদ্ধ বিবরণী, যাতে মানুষের জীবন ও সমাজের কাহিনি আলোচিত হবে। যে সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ অতিক্রম করে বিবর্তিত হয়েছে, সেই পরিবর্তনের কথা থাকবে। যে সমস্ত চিন্তা বা আদর্শ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে বা প্রভাবিত করেছে তার বর্ণনা থাকবে এবং সব শেষে যে বাস্তব প্রেক্ষাপট বা অবস্থা সেই মানুষের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত বা বাধাপ্রাপ্ত করেছে তার বিবরণও থাকবে।

ইতিহাস যে শুধু রাজকাহিনি নয়, তা বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত। একদা অবশ্য তাই ছিলো, এই কারণে **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবন বৃত্তান্ত, দেশের ইতিহাস নহে।" এতদিন কেন এমন করা হত তা বোঝা কঠিন নয়, জোর দেওয়া হত শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের উপর। তাও শুধু শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক ইতিহাস। অথচ শুধু শাসকশ্রেণির

দিকে দৃষ্টি দিলেই কী একটি যুগের জাতির বা সমস্ত মানব সমাজের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়? আদৌ যায় না। মানুষের জীবন, জীবিকা, বেঁচে থাকার লড়াই, সুখ-দুঃখের কাহিনি, উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, খাদ্য, পোষাক, রীতিনীতি, উৎসব, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, প্রভৃতি আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তাই রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জরুরি এবং এই ইতিহাস বলার প্রধান শর্ত হল বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ইতিহাসের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি এবং এটা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের অভিজ্ঞতার নিরীখে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলির ব্যাখ্যা দেন। তাই বলা যায় "to define history definitely or accurately is pre-posterous proposition" তবে বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি একত্রে করে বলা যায় যে প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় সংগৃহীত তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবদ্ধ মানুষের বাস্তবভিত্তিক প্রগতির লিখিত বিবরণ উপস্থাপনই হল ইতিহাস। সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস। ইতিহাস রাজা বাদশার গল্প নয়, সাধারণ মানুষের কাহিনি। ইতিহাস হল মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস। মানুষকে বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না। সামাজিক মানুষের জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস। জনজীবনের বিশ্লেষণ। সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সংস্কৃতির জীবন হল ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। ইতিহাসের চালিকাশক্তি হল জনতা বা সাধারণ মানুষ ও তাদের বেঁচে থাকার লড়াই। সুখ-দুঃখের কাহিনি। তাই **কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন**—"There is only one history–The History of Man." ইতিহাস হল সময়সীমার মধ্যে একটি আন্দোলন (It is a movement in time) যা অতীত থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। এই আন্দোলন থেমে নেই, নিয়ত প্রবহমান ও গতিশীল। আর এই ধারাবাহিকতা ও গতিশীলতা হল ইতিহাসের প্রাণ।

★ ইতিহাসের প্রকৃতি : ইতিহাস বিজ্ঞান না কলা? (Nature–is History, Science or Arts?) :

ভূমিকা : ইতিহাসের জনক **হেরোডোটাস** ও **থুকি ডাইসিসের** সময় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইতিহাস ছিল অতীত ঘটনার বিবরণ এবং ঐতিহাসিকের কাজ হল এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। এই সময় ইতিহাস ছিল নীতিজ্ঞানে পরিপূর্ণ একশ্রেণির মার্জিত সাহিত্য। এছাড়া ইতিহাসের আর কোনো পরিচয় ছিল না এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং ইতিহাসকে বিজ্ঞানধর্মী বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস শুরু হয়। বস্তুতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দী একদিকে

Scanned with CamScanner

যেমন বিজ্ঞানের শতাব্দী, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাসের শতাব্দী। এই সময় জ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, অনুশীলন ও উদ্যোগ আরম্ভ হল। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। শুরু হল ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক চর্চার অনুসরণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাসের বিচার। উনিশ শতকে ইতিহাস সম্পর্কে যে ধ্যান ধারণার ও নতুন ভাবধারার সূচনা হয় তার ফলে ইতিহাসে বিজ্ঞানের পর্যায়ে আনার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস যে বিজ্ঞান তা সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন ভলতেয়ার, জার্মান ঐতিহাসিক নেইবুরকে ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনকে বলা যায়। **হেরোডোটাস** ও **থুকিডিমিস** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক **গার্ডিনার মেইটল্যান্ড, স্টাবস্, টাউট** প্রমুখরা বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনার বিশেষ অবদান রেখেছেন এবং ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। আধুনিককালের ঐতিহাসিকরাও ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে দাবী করেছেন।

উনিশ শতকে ইউরোপে দৃষ্টিবাদী (Positivest) ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেন। **কোঁত, বার্কলে** প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে তার থেকে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বের করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জার্মান ঐতিহাসিক **র‍্যাঙ্কে** ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক আঙ্গিকের অনুপ্রবেশ ঘটান। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক **বিউরি** বলেন, "History is a Science nothing more and nothing less." কেউ কেউ বলেন, 'History is Social Physics' অর্থাৎ বিজ্ঞান যেমন কতকগুলি সূত্র অনুযায়ী চলে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র দিয়ে যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায়। তেমনি ইতিহাসেরও সূত্র বা নিয়মাবলি রয়েছে। ইতিহাসের এই নিয়মাবলি বা সূত্রের সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করা যায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে চালিত করা যায়।

বিজ্ঞানের ধারণা : ইতিহাসকে বিজ্ঞান শ্রেণিভুক্ত করা যায় কিনা তা নিরূপণ করতে গেলে আগে বিজ্ঞান কাকে বলে তা আলোচনা প্রয়োজন। বিজ্ঞান কথার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Science' কথাটি ল্যাতিন Scientia থেকে এসেছে। যার অর্থ হল জ্ঞান। ইংরেজি ভাষায় 'Science' কথার অর্থ হল 'Systematic and Fundamental Knowledge', বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান। ইউনেস্কোর (১৯৫০) মতে বিজ্ঞান হল— "The sum of co-ordinated knowledge relative to a determined subject." অর্থাৎ বিজ্ঞান বলতে কোনো বিষয় সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে বোঝায়। পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এই জ্ঞান সংগৃহীত হয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ করে যখন যথার্থ একটি সত্যে উপনীত হওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় বিজ্ঞান। **অ্যারিস্টটলের** মতে—"বিজ্ঞান হল সাধারণ সত্যের অভিব্যক্তি।"

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে **Galbraith** বলেন, "By science we mean a body of knowledge that seeks to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth." অর্থাৎ বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা আমরা এমন সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে বুঝি শুধু সত্যের অভিব্যক্তি ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক **হ্যাম্ব্লিলির** মত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, "By science, I understand all knowledge that rests upon evidence and reasoning." বিজ্ঞানের ধর্ম হল যথার্থতা, নির্ভুলতা, তথ্য নির্ভরতা ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতা। এই কারণে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিজ্ঞানীকে কতকগুলি বিষয়ে নজর রাখতে হয়— পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণ। যে বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সেই বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। পর্যবেক্ষিত বিষয়কে পরীক্ষা করতে হয়, পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটি সাধারণ সূত্র বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বিজ্ঞান চর্চার মানুষ একটি সাধারণ সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত বা সূত্রে পৌঁছাতে পারে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণযোগ্য ও নির্ভুল। বিজ্ঞানে আবেগ, উচ্ছ্বাস, ন্যায়, অন্যায় ভালো-মন্দ ও সংস্কারের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞানে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য গুরুত্বপূর্ণ।

★ বিজ্ঞানের সাধারণ নীতি :

(i) বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা মানুষ একটি সাধারণ সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত সূত্রে পৌঁছাতে পারে।
(ii) বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বা সূত্রগুলি প্রমাণযোগ্য ও নির্ভুল।
(iii) বিজ্ঞানের সত্য সফল ভবিষ্যৎবাণী করতে সাহায্য করে এবং-এর দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
(iv) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য গুরুত্বপূর্ণ।
(v) বিজ্ঞানে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সংস্কারের কোনো স্থান নেই।
(vi) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক।
(vii) অ্যারিস্টটলের মতে বিজ্ঞান হল সাধারণ সত্যের অভিব্যক্তি।

★ ইতিহাস বিজ্ঞান : স্বপক্ষে যুক্তি :

(1) পদ্ধতিগত দিক থেকে ইতিহাসকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলে অভিহিত করা যায়। তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিশ্লেষণ, গ্রহণ, বর্জন, তথ্য সমূহের তুলনা, সংযোজন ও সংগঠনের পথেই বৈজ্ঞানিক তাঁর সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ঐতিহাসিকও একই পদ্ধতিতে তথ্যচয়ন, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তের পথে অগ্রসর হন।

(2) বৈজ্ঞানিক অনুমানের সাহায্যে নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং নতুন তথ্যের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে পুরাতন সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন। ঐতিহাসিকও অনুমানের সাহায্য নেন এবং নতুন তথ্যের আলোকে তাঁর পুরাতন সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন। পদ্ধতিগত দিক

Scanned with CamScanner

থেকে ইতিহাসের মধ্যে বিজ্ঞানধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞান পদবাচ্য। ঐতিহাসিক গবেষণায় বিজ্ঞানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

তবে ইতিহাস পুরোপুরি বিজ্ঞান নয়। কারণ পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রকে যে অর্থে বিজ্ঞান বলি, ইতিহাস সেই অর্থে বিজ্ঞান নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণের বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার ন্যায় পরীক্ষণভিত্তিক বিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত করা যায় না। বলা বাহুল্য পদার্থ বিজ্ঞানের তথ্য ও ইতিহাসের তথ্য এক বস্তু নয়। অতএব ইতিহাস বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হলেও পুরোপুরি বিজ্ঞান নয়। তার নিজস্ব বা স্বধর্ম নিয়ে সে এক স্বতন্ত্র বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান। আসলে ইতিহাস হল সমালোচনা ভিত্তিক বিজ্ঞান। কারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনটি অপরিহার্য স্তর বিদ্যমান— বিষয় বা ঘটনার অনুকূল তথ্যানুসন্ধান; তথ্যগুলির মৌলিকত্ব, সত্য, মিথ্যা বিচার এবং তথ্যের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। নৈর্ব্যক্তিকতার ভিত্তিতে এই পদ্ধতিত্রয়কে গ্রহণ করার জন্য ইতিহাসকে বিশেষ শ্রেণির সমালোচনা ভিত্তিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

ইতিহাস বিজ্ঞান নয় : ইতিহাসের তথ্য ও বিজ্ঞানের তথ্য একরকম নয়।

(১) বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্য সর্বদা দৃষ্টিগ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষাযোগ্য। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক তথ্যাদি দৃষ্টিগ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ নয়। তাই এগুলিকে গবেষণাগারে পরীক্ষা করা যায় না।

(২) ইতিহাসের তথ্য তুলনামূলকভাবে বিজ্ঞানের তথ্যের মতো অতটা বাস্তব নয়। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বাস্তব বিষয় নিয়ে কাজ করলেও দুজনের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইতিহাসের বাস্তবতা অদৃশ্য (Vanished)। বৈজ্ঞানিকের বাস্তবতা অদৃশ্য হলেও (Unseen) ফলশ্রুতি সর্বদা বর্তমান এবং এই ফলশ্রুতিকে বারবার পরীক্ষা করা সম্ভব।

(৩) ইতিহাস কোনো না কোনো ভাবে অতীতকে আশ্রয় করে এবং সেই অতীত থেকে তথ্য সঞ্চয় করে। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করে। তাই ঐতিহাসিকের তথ্য সমস্তটাই অতীতের। বর্তমানে সে তথ্য নাড়া চাড়া করা, সেই তথ্য নিয়ে পরীক্ষা করার কোনো উপায় নেই। বিজ্ঞানের তথ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য ও পরীক্ষাযোগ্য হওয়ায় এই তথ্য পরীক্ষাগারে বারবার পরীক্ষা করা যায় এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি (Replica) বা বারবার ঘটানো যায়। এবং একই ফললাভ হয়।

অপরদিকে ইতিহাসের তথ্য বহুলাংশে দৃষ্টিগ্রাহ্য না হওয়ায় এটি সম্ভব নয়। যে ঘটনা ঘটে গেছে (যেমন—ফরাসি বিপ্লব) তাকে পুনরায় সংঘটিত করা সম্ভব নয়। পরীক্ষাগারে ঐতিহাসিক আর একটি ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত করতে পারেন না।

(৪) বৈজ্ঞানিক হলেন ভবিষ্যৎ বক্তা। ঐতিহাসিক নন। গবেষণারত বৈজ্ঞানিক তাঁর কার্যাবলির ফলশ্রুতি সম্পর্কে পূর্বসংকেত করতে পারেন, কিন্তু গবেষণারত ঐতিহাসিক বিশেষ বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন করেন মাত্র। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেন না।

(৫) বিজ্ঞান ব্যক্তি নিরপেক্ষ। বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত আবেগ, উচ্ছ্বাস, রুচি অভিরুচির স্থান নেই। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগ, রুচি অভিরুচির প্রভাব বিদ্যমান। দুজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয় না, একই থাকে।

(৬) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন—H_2O থেকে 'H' (Hydrozen) ও 'O' (Oxyzen) আলাদা করে উভয়ের প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের তথ্যাদি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এদের বিচ্ছিন্ন করলে তথ্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নষ্ট হয়।

(৭) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ (Generalization) সহজসাধ্য এবং এই সত্য সর্বজনস্বীকৃত। ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মতো সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা স্বতন্ত্র (Unique)। ইতিহাসের দুটি ঘটনা সম্পূর্ণ এক হতে পারে না। যেমন— দুটি সাম্রাজ্যর উত্থান ও পতনের কাহিনি এক হতে পারে না। ইতিহাসের তথ্যে যে খাদ আছে এই কথা আজ স্বীকৃত। তথ্যের সংখ্যাও সামান্য। সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে অপ্রতুল। আবার এই তথ্যের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের সাধারণ সম্মতি থাকে না। বিশেষ বিশেষ তথ্য নিয়ে মতানৈক্য ঘটে। তাছাড়া সাধারণ নিয়ম তৈরি করতে গেলে যত তথ্য লাগে তার সামান্য অংশও ঐতিহাসিকের ভাগ্যে জোটে না। এ বাদে অন্য একটা সমস্যা আছে। ইতিহাস মানুষের কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে ঐতিহাসিকের পক্ষে সর্বজনীন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা কঠিন ব্যাপার।

এতদসত্ত্বেও আদর্শবাদী (Idealist Group) ও প্রত্যক্ষবাদী (Positivist Group) গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসকে বিজ্ঞান পদবাচ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করেন। আদর্শবাদী গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক **কলিং উড** (Colling Wood) বলেন—নিয়ম মাফিক পাঠচর্চার ফলে ঐতিহাসিক জ্ঞানলাভ করা যায়। সুতরাং ইতিহাস হল বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান। একে মানুষের অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত এক স্থূল বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। অপরদিকে প্রত্যক্ষবাদীরা মনে করেন ঐ ঐতিহাসিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নেই এবং এটা অবিকল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অনুরূপ। **র‍্যান্ড** এবং তাঁর অনুগামীরা ইতিহাসকে বিজ্ঞান স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা

Scanned with CamScanner

করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে **Edword P. Cheney** ঘোষণা করলেন যে তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাসে ছটি বিধি বা সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। এই ছটি বিধি হল—নিরবিচ্ছিন্নতা (Law of Continuity), পরিবর্তনশীলতা (Law of Change), পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Law of interdependence), গণতন্ত্র (Law of Democracy), স্বেচ্ছায় সম্মতিদান (law of consent) ও নৈতিক অগ্রগতি (Law of moral progress)। সুতরাং ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার : ইতিহাস রচনার মধ্যে কতকগুলি পর্যায় থাকে, যেমন—তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বাছাই, তথ্যের সমন্বয় ও উপস্থাপন। তথ্য আবিষ্কার ও তথ্য বাছাই করেই ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। তথ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক তথ্যের যথাযথ উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন ইতিহাস রচনাশৈলী (The art of writing history) বা Historiography নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার দুটি দিক থাকে—একটি যুক্তির দিক অন্যটা কল্পনার। দৃঢ় যুক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক যখন নির্বাচিত তথ্যগুলিকে সাজান তখন তিনি সেজাজে বৈজ্ঞানিক। কিন্তু যেহেতু তাঁর তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য কাজ সেইজন্য নিজস্ব সহানুভূতিতে কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে থাকেন। সেখানে তিনি সাহিত্যিক, কল্পনাশ্রয়ী। ইতিহাস তখন সাহিত্যের অংশ। **আর. বজ্রেশ্বরীর মতে** (R. Vajreswari. 1966), "The historians business is not only to assess evidence but to narrate the events in a creative manner. He must be an artist using the literary qualities of imagination and sympathy and recreate the past for our benefit." সুতরাং ঐতিহাসিক একাধারে সন্ধানী, বৈজ্ঞানিক ও কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যিক এবং ইতিহাস যুগপৎ বিজ্ঞান ও কলা (Both Science and Arts)। পরিশেষে বলা যায় যে, as an inquiry after truth, it is a science or it is scientific, as a narrative account of the past, it is an art or pice of literature. সুতরাং ইতিহাস যুগপৎ বিজ্ঞান ও কলা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া হিসেবে (তথ্যসংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও বাছাই এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ) ইতিহাস বিজ্ঞান (Science) এবং অনুসন্ধান দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের উপস্থাপন বা রচনাশৈলীর (Historiography) দিক থেকে ইতিহাস কলা (Arts).

✪ ১.১ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Social Science Teaching) :

❑ ১.১.১ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Teaching History at Secondary Stage) :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ইতিহাস একটি অন্যতম পাঠ্য বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে বহুবিধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করা যায়। ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য

ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষাবিদগণ নানা মত প্রকাশ করেন। কোনো একটা বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরার পর, শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার মধ্যে কতখানি কী পরিবর্তন আমরা প্রত্যাশা করি এটা সর্বদাই পূর্ব নির্ধারিত থাকে। আর এই প্রত্যাশাগুলিই হল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি হল—

(1) **সত্যানুসন্ধানে অনুপ্রেরণা লাভ :** ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সত্যানুসন্ধানে অনুপ্রাণিত হয়। সত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়, জ্ঞানে নিষ্ঠা, মিথ্যা প্রচার ও অতিরঞ্জনের প্রতি অনাগ্রহ ও বিরোধিতা সৃষ্টি করাও ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য। ইতিহাসের আরম্ভটি হল তথ্যের উপর নির্ভর করে সত্যের প্রতিষ্ঠা।

(2) **দেশপ্রেম লাভ :** দেশপ্রেম গঠনে ইতিহাসের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস পাঠের ফলে শিক্ষার্থীদের স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়, দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ করে তোলে, অন্তরে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়।

(3) **জীবনযাপনের প্রস্তুতি :** ইতিহাস শিক্ষার্থীদের নাগরিক জীবন, নাগরিক সাজ্ঞ, নাগরিকদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

(4) **মানুষ ও তার সমাজের অগ্রগতির পরিচয় :** ইতিহাস সমগ্র সমাজের প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের মধ্যেই একমাত্র সমাজের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রতিফলিত হয়। সমাজের পটভূমিকায় মানুষের হয় পূর্ণ বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ও তার সমাজের অগ্রগতিই হল ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইতিহাস শিক্ষার্থীগণকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে।

(5) **মানবতাবোধ সৃষ্টি :** মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি হল এক আন্তর্জাতিক সম্পদ। এই সম্পদ লাভ করতে হলে যে সর্বাত্মক মানবতাবোধ সৃষ্টি করা দরকার তা কেবল ইতিহাসের মধ্যেই সম্ভব। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সহনশীল মনোভাব ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। মানবতাবোধই হল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

(6) **বর্তমানকে জানা :** ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য হল বর্তমানকে জানা, বর্তমানকে বিচার বিশ্লেষণ করা। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্যাগুলিকে সমাধানরূপে অনুধাবন করা।

(7) **মানসিক শক্তি ও বৃত্তিসমূহ বিকাশে সহায়তা :** ইতিহাস পাঠের ফলে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্মৃতিশক্তি, বিচার-বিবেক শক্তি, তর্ক করা প্রভৃতি মানসিক গুণগুলির বিকাশ ঘটে। এই বিচারবুদ্ধির চর্চা শিক্ষার্থীর জীবনে নানা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

(8) **সময় চেতনা জাগ্রত করা :** ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সবসময়েই স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে থাকে। কাজেই নানা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মধ্যে কার্য-কারণ সূত্র অনুধাবন করার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সময়ানুক্রমিকতা ও ভৌগোলিক অবস্থান

Scanned with CamScanner

ebook.dascoaching.in

বিষয়ক জ্ঞান থাকাটা জরুরি, ইতিহাস অধিক সময় চেতনা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

(৯) **জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মনোভাব সৃষ্টি :** ভারত একটি ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ। বহু জাতি, বহু ভাষাভাষি, বহু বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, বহু ধর্মাবলম্বীর এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ভূমি এই ভারতবর্ষ। স্বাভাবিকভাবে অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, অন্য ধর্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন, অন্যদের আচার-আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুকরণ ইত্যাদি মানসিকতা গড়ে তোলা এবং অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করতে শেখায় ইতিহাস।

(10) **সাংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন :** দেশের জাতীয় সংগীত, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি আমাদের পবিত্র সংবিধান ও তার অপরিহার্য মূল্যের কথা ভেবে তার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে শেখানোও ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য।

(11) **বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা গঠন :** বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের হতে হয় অতীতের নিরপেক্ষ অনুসন্ধানী, দর্শক ও গবেষক। ফলে ইতিহাসের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বিজ্ঞানসম্মত নীতির উপর। তাই বর্তমানের ইতিহাসে শিক্ষার্থীদের যেমন বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা গঠিত হয় তেমনি তারা প্রকৃত তথ্যের সত্যাসত্য বিচার বিশ্লেষণে বদ্ধপরিকর হয়।

(12) **জাতীয়তা সংহতির সৃষ্টি :** জাতীয় জীবনের একটা বড়ো প্রয়োজন হল সংহতিবিধান। জাতীয়তাবাদের মূল মন্ত্রই হল জাতীয় সংহতি সাধন। এজন্য প্রয়োজন স্বদেশের ইতিহাস চর্চা। এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থী খুঁজে পাবে তার চিরন্তন স্বদেশকে। ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই শিক্ষার্থী জাতীয় সংহতির সঠিক সন্ধান লাভ করে।

(13) **আন্তর্জাতিক চেতনার জাগরণ :** শুধু জাতীয়তা নয় আন্তর্জাতিকতাই ইতিহাসের মূল সত্য। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারবে নিজের দেশের বাইরে আছে এক বৃহত্তর দেশ, অর্থাৎ তারা বুঝবে যে, ইতিহাস কোনো সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। ইতিহাস পাঠের ফলে শিক্ষার্থীর সামনে মানবজাতির সঠিক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। মানবজাতির অগ্রগতির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবগত হয়, ফলে শিক্ষার্থী নিজেও যে এই সভ্যতার অগ্রগতির একজন শরিক—এই ভাবনাতে সে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে ইতিহাস জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(14) **সুন্দরতর পৃথিবী গড়া :** ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহাবস্থান ও সহযোগিতার মূল্য ছাত্রদের কাছে তুলে ধরার ফলে শান্তি ও সহযোগিতার এক অখণ্ড জগৎ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। ফলে গড়ে এক সুন্দরতর পৃথিবী।

❑ ১.১.২ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য (Aims of Teaching History at Higher Secondary Level) :

- যে-কোনো বিষয় পঠনপাঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল বিষয়ের প্রতি আগ্রহ (Interest) সৃষ্টি করা। প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাকে আরও গভীর ও দৃঢ় করা এই স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য।
- স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের কার্যাবলির বিশ্লেষণ হল ইতিহাস। স্থান ও কাল চেতনা গড়ে ওঠে সেটিকে শক্তিশালী ও দৃঢ় (Strengthened and Consolidated) করা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- যুক্তি দেওয়া তর্কবিতর্ক করা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে সমালোচনামূলক ও বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব (Critical and Scientific attitude) গড়ে তোলা।
- অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানকে দেখা ও ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গি (Forward looking) সম্পন্ন বা দূরদৃষ্টি করে গড়ে তোলা। এর পাশাপাশি অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্পর্ক সচেতনতা সৃষ্টি করা এই স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য।
- বিশ্ব সংস্কৃতি হল বিশ্ববাসীর দান। বিশ্বের প্রতিটি দেশ সাংস্কৃতিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার। এই বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা ইতিহাস পঠনপাঠনের অন্যতম লক্ষ্য।
- কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না। প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে এক বা একাধিক কারণ রয়েছে, এই কার্যকারণ বিধির (Law of Cause and Effect) সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো এই স্তরে ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য।
- শিক্ষার্থীদের বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এই সমস্যাগুলি সমাধানের সম্ভাব্য সমাধানের দক্ষতা গড়ে তোলা ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের চেতনা সঞ্চার করাই ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য।
- সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের ক্রম বিবর্তনের ধারা হল ইতিহাস। তাই মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া ও সচেতনতা সৃষ্টি ইতিহাস পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

✪ ১.২ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) পাঠক্রম এবং সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Social Science Curriculum, Values of Social Science Teaching) :

❑ ১.২.১ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের মূল্য (Values of Social Science Teaching) :

ভূমিকা : ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হল এই যে, প্রতিটি বিষয়ের যেমন অন্ধকার ও উজ্জ্বল উভয় দিক থাকে, তেমনি ইতিহাসেও বর্তমান আছে। ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের মনে যদি নেতিবাচক ধারণা থাকে, তাহলে তা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও আছে। সাধারণ মানুষ প্রায় জানেন না সময়ের সঙ্গে ইতিহাস তার রাজনৈতিক আর সামরিক পোশাকের আকৃতি বা রং কীভাবে বদলেছে। সুতরাং বর্তমানে মানুষের কাছে এখন ইতিহাসের ক্রমিক তারিখ আর শাসকবর্গের বংশধারার বিবরণ, যুদ্ধ বিবরণ, টেলিফোন ডাইরেক্টরির মতোই গ্রহণযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস গোটা মানব সভ্যতার জ্ঞান সঞ্চয় ভাণ্ডার, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ত্রিবেণী সঙ্গম। ইতিহাসকে বাদ দিলে তাই মানুষের জ্ঞান ও শিক্ষা থাকে অসম্পূর্ণ, জীবনবোধ হয় পঙ্গু। সুতরাং সামগ্রিক শিক্ষা ও জীবন বিকাশের দিক থেকে শিক্ষার্থীর কাছে ইতিহাস পাঠের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইতিহাসবিদ্ **K.D. Ghosh**-এর ভাষায়— It is no exaggeration to say that from long being the cindrella of the curriculum, she bids fair to be its queen। সুতরাং ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায়—

(১) **মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বোধের বিকাশ ঘটায় :** ইতিহাসের একটি বড়ো আলোচনার ক্ষেত্র হল মহাপুরুষদের জীবনী, জীবনাদর্শ, তাদের কৃতিত্ব, বীরত্ব, ত্যাগ ও জীবনবৃত্তান্তের পর্যালোচনা। ইতিহাসে এই সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনীপাঠ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করে, মানসিক উৎকর্ষতা অর্জন, চরিত্র গঠনে, ন্যায়-অন্যায়, ভালোবাসাবোধ জাগ্রত করে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ **Rawlin charles** বলেছেন যে, "History describes vice, it unmarks false virtue, it exposes errors and prejudices, it dissipates the enchantment of riches and of all that vain pomp which dazzles men, it shows by a thousand examples more persuasive than all arguments that there is nothing great and laudable except honour and uprightness."

(২) **অনুসন্ধিৎসু ও কল্পনাপ্রবণ করে তোলে :** ইতিহাস হল মানব সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির কাহিনি। এই সব কাহিনি শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু ও কল্পনাপ্রবণ করে তোলে।

(৩) **বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে :** ইতিহাসে বহু বিতর্কিত বিষয় থাকে। আর সেই বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি যথাযথ বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে

শিক্ষার্থীকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হয়। যা শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানধর্মী ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে ও বিচার শক্তির বিকাশ, স্মৃতিশক্তির বিকাশ এবং কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

(৪) **লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে :** ইতিহাস আরও কোনো কোনো বিষয়কে যোগ্য বিষয় করে তোলে। লোকগীতি, লোকসঙ্গীত, গাথা, স্থানীয় হস্তশিল্প, এই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করে ইতিহাস। তার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক লোকজীবনের স্বাতন্ত্র্য ও মূল্যবিচার করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় যারা জঙ্গলে কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো এলাকায় বাস করেন, শ্রুতি পরম্পরার মধ্য দিয়ে বাহিত ইতিহাসের সাহায্যে আমরা তাঁদের বিভিন্ন প্রজন্মের পরিচয় পাই। ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উৎসই হল মন্দির, নগর, মানুষ ও রাজা জমিদারদের বংশানুক্রমিক রূপকথা ও কাহিনি। সুতরাং এর মধ্যে দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের রীতি-নীতি, জীবনধারা, আদর্শ ও সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারি।

(৫) **নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ :** ইতিহাস হল Past Politics। সুতরাং ইতিহাসের পাঠের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ লাভ করা যায়। ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে বিশ্বজনীনতাবোধ সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক চেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

★ **জ্ঞানের বিকাশ :** ইতিহাস হল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার (Store house of knowledge)। জ্ঞানের জগতের প্রায় সর্বদিক নিয়ে আলোচনা করে ইতিহাস। মানবসমাজের বিবর্তন, রাজবংশের উত্থান পতন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতি, বিপ্লব-বিদ্রোহ, আন্দোলন, মহাপুরুষদের মহৎ ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে। এগুলি পাঠ করে আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

★ **বর্তমানযুগের ভিত্তি :** ইতিহাস হল অতীতের সাক্ষী, অতীতের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মানুষ বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছে। বর্তমান মানব সভ্যতার মূল শিকড় নিহিত রয়েছে সুদূর অতীতের মধ্যে। অতীতের ভিতের উপর বর্তমান দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাস হল বর্তমানযুগের ভিত্তি। তাই বর্তমানকে ভালো করে জানতে এবং বুঝতে গেলে অতীত ইতিহাসকে ভালো করে জানা এবং বোঝা দরকার। একমাত্র ইতিহাসই বর্তমানকে ভালো করে জানার সেই সুযোগ করে দেয়।

★ **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন :** ইতিহাস থেকে অতীতের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। বিভিন্ন শাসকদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। শাসকদের রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনিক সংস্কারের ভালো দিকগুলি গ্রহণ করে বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে

Scanned with CamScanner

উন্নয়ন করা যায়। এর পাশাপাশি শাসকদের ভ্রান্ত ও অদূরদর্শী নীতির মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

★ **সাংস্কৃতিক অগ্রগতি :** ইতিহাসের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের সংস্কৃতি জীবন। ইতিহাসের মাধ্যমে মানব সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা তুলে ধরা হয়। ইতিহাস বিভিন্ন যুগে মানব সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করে। ইতিহাসের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি ও অতীত সংস্কৃতির ধারাবাহিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের ফল।

★ **জাতীয়তাবোধের বিকাশে সহায়তা করে :** দেশপ্রেম হল নিজের প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধ। জাতীয়তাবাদ হল দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। ইতিহাস থেকে আমরা অতীতের কোনো দেশ বা জাতির অতীত সম্পর্কে জানতে পারি। ইতিহাস দেশ ও দেশবাসীকে তার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য ও মহত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। জাতীয়বোধে উদ্বুদ্ধ দেশবাসী তার জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা দেশবাসীকে বহিরাক্রমণ, বহিরাগত শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা ইতিহাস থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি এবং এই জ্ঞান আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণে প্রেরণা দেয়। যে-কোনো ধরনের শোষণ, অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি লাভ করি ইতিহাস থেকে।

★ **ধর্মসহিষ্ণুতার শিক্ষা লাভ :** মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ধর্ম। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামী বা রক্ষণশীলতা বা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। এর পাশাপাশি ধর্মীয় উদারতা। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি। এর পাশাপাশি ধর্মীয় উদারতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি—সম্রাট অশোক কিম্বা আকবরের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি, জাতি ও রাষ্ট্রকে কতটা শক্তিশালী করেছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। এর ফলে জাতীয় অগ্রগতির ধারাকে ত্বরান্বিত করে। ইতিহাস থেকে জানতে পারি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। একটি স্থিতিশীল ও স্থায়ী সরকার এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কতটা সহায়ক। সুতরাং ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সুফলগুলি উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

★ **আন্তর্জাতিকতা বোধ সহায়তা করে :** ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হল পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা। এই আলোচনা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি বা বৈদেশিক নীতি এবং এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে জানতে পারি। কোন্ ধরনের বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির সহায়ক ও কোন্ ধরনের পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করে ও ভুল

বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে তা ইতিহাস পড়ে জানা যায়। এই জ্ঞান বা বোধ আধুনিক প্রজন্মকে বর্তমানকালের জন্য যথাযথ বিদেশনীতি নির্ধারণে সহায়তা করে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায় ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ইতিহাসের শিক্ষামূলক ও সামাজিক ভূমিকাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে স্বদেশিকতা, জাতীয় সংহতিবোধ, আর্ন্তজাতিকতা, নৈতিকতাবোধ, মূল্যবোধ, পরিমিতিবোধ, সংযমের শিক্ষা দান করা যায়। তাই **ফ্রান্সিস** যেমন মন্তব্য করেন—"History is a discipline which makes a man wise." **Arthwe Marwiek**-এর মতে, অতীতের ঘটনা আমাদের বর্তমান জীবনের উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং ভবিষ্যতের ঘটনাও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। বস্তুত পক্ষে সময়ের গতি সম্মুখবর্তী। তাই সুদূর অতীতের সময়কে আমরা কখনও দেখতে বা ফিরে পেতে পারি না। তাই ঐতিহাসিক **মর্স স্টিফেন্স** মন্তব্য করেন যে—যে সময়ে কোনো একজন পাঠক জন্ম গ্রহণ করেননি, তার কাছে সেই সময়ের একটি চিত্র তুলে ধরার কাজটি কঠিন; খুবই কঠিন—একাজ প্রায় অসম্ভব। আর ইতিহাস এই হারানো অতীতকে প্রাণান্ত (Living) করে তোলে এবং ইতিহাসের মূল্য এখানেই।

❑ ১.২.২ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) পাঠক্রম (Social Science Teaching) :

◆ বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রমে ইতিহাসের স্থান (Place of History in Curriculam at School Level) :

তুলনামূলক বিচারে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা অপেক্ষা ইতিহাসের মূল্য কম হলেও বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিহাস বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য হিসেবে সমাদৃত। বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল ইতিহাস। অধ্যাপক **কে. ডি. ঘোষের মতে,** "ইতিহাস আজ শুধু কেবল পাঠ্যতালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে তা নয়—ভূগোল, সাহিত্য, কলা, সংগীত প্রভৃতি বিষয়গুলিও ইতিহাসের সেবায় নিয়োজিত" ("History has not only a fundamental place in the curriculum today but has her needs ministered to by such subjects as geography, literature, handwork, arts and music."—K. D. Ghosh)। ইতিহাসের এই স্বীকৃতির পিছনে রয়েছে বিশ্বের বহু ঐতিহাসিক, দার্শনিক, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকের অবদান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **ক্যাড ওয়েলকুক** (Cald Well Cook), **হেলেন পার্কহার্স্ট** (Helen Parkhurst), **হ্যাপহোল্ড** (Haphold), **কাসিনেট** (Cousinet), **কমেনিয়াস, লক্, পেস্তালসি, ফ্রয়েবল, মার্টিন লুথার, টমাস আর্নল্ড** (Thomas Arnold), **বাইভস** (Vives), **র‍্যাঙ্কে** (Ranke), **কার্ল আগস্ট মূলার** (Karl August Muller) প্রমুখ।

Scanned with CamScanner

১ বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রমে ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির কারণ—

- শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল দেশ, জাতি ও বিজ্ঞানমনস্ক ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো। এক্ষেত্রে ইতিহাসের মূল্য অনস্বীকার্য। ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে মানব সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মানুষের বিভিন্ন জ্ঞান ক্ষেত্র বিচার করার ফলে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার লক্ষ্য হল সুনাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষা হল নাগরিক জীবনের প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ। এক্ষেত্রে ইতিহাস পঠনপাঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে নাগরিক জীবন, নাগরিক সমস্যা, নাগরিক অধিকার, নাগরিক-কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে ও নাগরিক চেতনার বিকাশ ঘটে।
- সমাজিক সক্ষতা সম্পন্ন মানুষ গড়াই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তবে এই লক্ষ্য পূরণে ইতিহাস পাঠই অন্যতম সহায়ক। ইতিহাস মানব সমাজ ও সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনের ধারা। সমাজ বিবর্তন এবং এই বিবর্তনের কার্যকারণ সম্পর্কের সূত্রেই বর্তমান সমাজকে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে, চিনতে পারে এবং নিজেকে সমাজ উপযোগী করে গড়ে তোলে।
- চরিত্র গঠন শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এক্ষেত্রে ইতিহাস পড়ার বিশেষ ভূমিকা আছে। ইতিহাসের শিক্ষাই চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান। মহান পুরুষদের জীবনী, আদর্শ, মানব কল্যাণে আত্মত্যাগ প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জানতে পারে যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- শিক্ষার একটি বড়ো কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতি জাগ্রত করা এবং সুস্থ স্বাদেশিকতা সৃষ্টিতে ইতিহাসের যত মূল্য আর কোনো বিষয়ের তত মূল্য নেই।
- শিক্ষার একটা বড়ো কাজ হল জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিকতা তথা বিশ্বমানবতা বোধের বিকাশ ঘটানো। এক্ষেত্রে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।
- বর্তমান যুগ হল বিশেষীকরণের যুগ। আধুনিক শিক্ষার প্রবণতা হল বিশেষীকরণের দিকে। বিশেষীকরণ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হল সাধারণ শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে বিশেষীকরণ শিক্ষার ইমারত। নিঃসন্দেহে এই প্রস্তুতিপর্বে ইতিহাস একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। একথা অস্বীকার করা যায় না যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস পাঠের অনুকূল শক্তি অর্জন করতে গেলে বিদ্যালয় স্তরে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন। সুতরাং ইতিহাসকে বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ যুক্তিসম্মত।

- শিক্ষার একটি বড়ো কাজ হল শিক্ষার্থীর মনে উদার ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। ইতিহাস শিক্ষার্থীর মনের সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, আচার আচরণ, ইতিহাসের ইত্যাদি পঠনপাঠনের ফলে শিক্ষার্থীর মনে উদারনৈতিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। আসলে ইতিহাসের পাঠ হল এক ধরনের 'Mental Training'। এটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বুদ্ধি, বিশ্লেষণী শক্তি, নিরপেক্ষ বিচার বোধ, সৃজনাত্মক মনোভাব, গঠনমূলক চিন্তাশক্তি (Creative Training) প্রভৃতির বিকাশ ঘটায় যা পরোক্ষে শিক্ষার্থীর মধ্যে মুক্ত মন, বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদার মনোভাব গড়ে তোলে।

২ বিদ্যালয় পাঠক্রমে ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

অতীতে এক সময় ছিল যেখানে ইতিহাস বিদ্যালয়ে স্থান পায় নি। বিদ্যালয়ের বাইরে আনন্দ দানের জন্য ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমশ বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির একটি শাখা রূপে ইতিহাস শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ইতিহাসকে পাঠ্য হিসেবে গ্রহণের একটি ইতিহাস আছে। এটি নীচে আলোচিত হল—

পাঠ্য বিষয় হিসেবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। উনিশ শতকের আগে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি তেমন গুরুত্ব পায় নি। মধ্যযুগে ইউরোপীয় খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা নীতি ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ইতিহাস পঠনপাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মান পণ্ডিত **জ্যাকব উইম্ফেলিং** (Jacob Wimpheling)-এর প্রচেষ্টায় ইতিহাস পড়ানোর ক্ষেত্রে নব প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। তিনি রোমানদের তুলনায় জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জার্মান ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথার (১৫২৪) মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে ইতিহাস পাঠের সপক্ষে মত দেন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় পণ্ডিত লুই বাইভ্স (Juan Luis Vives)-এর মতে, ইতিহাসই সর্বোত্তম পাঠ্যবিষয়। ইতিহাসের মাধ্যমে শিশুরা বয়স্কদের অভিজ্ঞতা লাভ করে। আর ইতিহাসের অভাবে বয়স্করা অভিজ্ঞতাহীন শিশুতে পরিণত হয়। তাঁর মতে, ইতিহাস হল কেন্দ্রীয় পাঠ্যবিষয় এবং এই অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলি এই কেন্দ্রীয় বিষয় থেকে উদ্ভূত, পুষ্ট ও বিকশিত হবে। ইতিহাস পঠন-পাঠনের মার্টিন লুথার ও বাইভ্স এর বক্তব্য ইউরোপ ভূখণ্ডের বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে (১৫৮০) ইংল্যান্ডে বিদ্যালয় স্তরে আবশ্যিক পাঠ্যরূপে ইতিহাসকে গ্রহণের দাবি ওঠে।

বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য হিসেবে ইতিহাসের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীতে কমেনিয়াস (Johan Amos Comenious) মাতৃক্রোড় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তী জীবনেও ইতিহাসকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। এই সময় ফ্রান্সে

Scanned with CamScanner

'Oratorian' নামক ধর্মীয় সংস্থা (১৬৩৪ খ্রি:) ও খ্রিস্টিয়ান উইজি (১৬৪২-১৭০৮) বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেন।

অষ্টাদশ শতকে বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোর প্রকৃত উৎসাহ সৃষ্টি হয়। ভলতেয়ার, গিবন প্রমুখদের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হল। ফলে বিদ্যালয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠনে নতুন উদ্দীপনা জেগে উঠল। চার্লস রোলিন (Charles Rollin) ঘোষণা করেন নীতি শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অসীম। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রুশো মানুষকে জানা ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার বিশ্লেষণের জন্য ইতিহাস পড়ার কথা বলেন। ইউরোপের প্রজাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসক ফ্রেডারিক দি গ্রেট ইতিহাসকে (১৭৬৩ ও ১৭৬৫) স্কুলে আবশ্যিক পাঠ্যরূপে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের যুগে জাতীয় কনভেনশন ফ্রান্সে ডিগ্রি জারি করে তিনটি পর্যায়ে ইতিহাস পড়ার কথা ঘোষণা করেন। মোটামুটিভাবে লক্ষ করা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে সর্বত্রই পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

উনিশ শতকে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ার বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। ইউরোপের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নির্ধারিত সময় তালিকায় ইতিহাসকে ও ভূগোলকে একসঙ্গে একই সময় শ্রেণিতে পড়ানো হত। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে **টমাস আর্নোল্ড** মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রথম ইতিহাসকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসকে পরীক্ষার বিষয় হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইংল্যান্ডে মাধ্যমিক স্তরে এই সময় থেকে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫০-এর পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে সাধারণ বিদ্যালয়ে (Common School) ইতিহাস প্রবেশাধিকার পায় এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর আবশ্যিক পাঠ্যরূপে স্বীকৃতি পায়।

স্বাধীনতা লাভের পর (১৭৭৬) থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস পঠন-পাঠন বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। আমেরিকায় প্রকৃত ইতিহাস পড়ার সূচনা কাল হল ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় থেকে অ্যাকাডেমিগুলিতে ইতিহাস পড়ানো শুরু হয়। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে 'মেসাচুসেটস' এ ইতিহাসকে আবশ্যিক পাঠ্য করা হয়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানো আরম্ভ হয়। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মিচিগান ও হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ইতিহাসকে আবশ্যিক করা হয়।

সর্ব আধুনিক ধারণায় ইতিহাস বলতে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতবর্ষে তা ছিল অবহেলিত। তবে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিহাস পড়ার রেওয়াজ ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনে ইতিহাস পাঠ্য হিসেবে সমাদর লাভ করে। আধুনিক ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস পড়ার সূচনা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতিহাস আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের

আবশ্যিক বিষয় রূপে মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন দেশে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এবং আবশ্যিক বিষয় রূপে পঠন-পাঠনের রীতি প্রচলিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সমাজ ও দেশকে জানতে পারে। স্বদেশপ্রেম অনুভব করে, নাগরিকতার শিক্ষা পায়, গণতন্ত্র, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা মানব কল্যাণ ও শান্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারে। ইতিহাস শিক্ষার্থীর মনের সংকীর্ণতা দূর করে দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। বিজ্ঞানসম্মত মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং শিক্ষায় এই সবের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। সুতরাং শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হিসেবে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক।

○ জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ ও ইতিহাস (National Curriculam Frame work, 2005 and History) :

ভূমিকা : স্বাধীনতা লাভের পর (১৯৪৭) ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন কমিটি, কমিশন ও সংস্থা গঠিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এইরূপ একটি জাতীয় স্তরের সংস্থা যা বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রম পরিমার্জনের জন্য ১৯৭৫, ১৯৮৮, ২০০০ এবং ২০০৫ সালে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ বিগত কুড়ি বছরের প্রচলিত পাঠক্রমগুলির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে—একুশ শতকের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক রূপরেখা তৈরি করেছে। অধ্যাপক **যশপালের** নেতৃত্বে রচিত হয়েছে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF-2005)। ভারতবর্ষের বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যালোচনাটি যথার্থ ইতিবাচক রূপে সারস্বত সমাজের কাছে গৃহীত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখায় সমাজ বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে ইতিহাস পঠনপাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

○ জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা এবং সমাজ বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য :

⇨ একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ স্থাপনের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য।

⇨ একটি ক্রম প্রসারিত পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে মানানসই হয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশ্লেষণ দক্ষতা অর্জন সমাজ বিজ্ঞানই প্রসারিত করে।

⇨ দ্রুত প্রসারণশীল পরিষেবার ক্ষেত্রে এবং বিশ্লেষণাত্মক ও সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশের বিভিন্নকাজে সমাজবিজ্ঞানী মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

⇨ সমাজ বিজ্ঞান প্রধানত স্বাধীনতা, আস্থা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বৈচিত্র্যের প্র
সম্ভ্রম—এই সব মানবিক মূল্যবোধের প্রগাঢ় অনুভব গড়ে তোলার সাধারণ দায়িত্ব ব
করে। তাই সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীর মনে একটি যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিক ও মানবি
শক্তি জাগানো, যাতে শিক্ষার্থী সতর্ক হবে সমস্ত অবক্ষয়ী ও মূল্যবোধঘাতী শক্তি থেকে

সমাজের বিভিন্ন ও বৈচিত্রপূর্ণ বিষয় সমাজ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। ইতিহাস, ভূগো
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সামাজিক বিজ্ঞান গঠি
পাঠক্রমে এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সেখানে সমাজ বিজ্ঞানে
আওতাভুক্ত ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়, এব
সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে। একটি নীতিনিষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য সামাজি
বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় সামাজিক বিজ্ঞানা
কম গুরুত্ব দেওয়া হলেও একটি ক্রম প্রসারিত পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে মানানসই হ
উঠতে প্রয়োজনীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশ্লেষণ দক্ষতা অর্জনের পথ সামাজি
বিজ্ঞানই প্রসারিত করে, তাই এর মূল্য গভীর।

○ জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) ও ইতিহাসের গুরুত্ব :

সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ইতিহাস অন্যতম। সমাজ বিজ্ঞানের অংশ হিসে
ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫-এ বলা হয়, "Histo
will take into account developments in different parts of India, with se
tions on events or developments in others parts of the world (NCF, 2005,
53)। বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি চালু ধারণা হল কেবল তথ্য মুখ
করা ও যথাসম্ভব বড়ো বড়ো উত্তর লেখা। বলা বাহুল্য এই দুটি ধারণাই ভুল এবং তা ছাত্রছাত্রীদে
ইতিহাস বিষয়ের প্রতি অনুরাগের বদলে বিকর্ষণ তৈরি করার সহায়ক। এ বিষয়ে জাতী
পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে—"It is believed that the social sc
ences merely transmit information and are text centred. Therefore, the co
tent needs to be laid on developing concepts and the ability to analyse soci
political realities rather than on the mere retention of information witho
comprehension." (NCF, 2005, P. 50)। **পদ্ধতিসংক্রান্ত ব্যাপারে জাতীয় পাঠক্রমে
রূপরেখায় বলা হয়**—"The teaching of the social science must adopt method
that promote creativity, aesthetics and critical perspectives, and enable chi
dren to draw relationships between past and present, ..." (NCF, 2005, P. 53
54). শিক্ষণে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বা শিখন সম্পদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়—"Teachin
(social science) should utilise greater resources of audiovisual materials
including photographs, charts, maps and replicas of archaeological an
material cultures" (NCF, 2005, P. 54)।

জাতীয় পাঠক্রমের (২০০৫) মতে, শিশুর নিজের জগৎ আরও সমৃদ্ধ করানো, বৈচিত্র্যের করানো এবং জাতীয় সাহচর্যে তাদের পরিচয় ঘটানো—এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলবার সদিচ্ছায় ইতিহাস পাঠ দিতে হবে। সমসাময়িক ভারতের উপরই মূল দৃষ্টিনিবদ্ধ থাকবে এবং বর্তমান রাষ্ট্র যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তার গভীরতা অনুধাবনে ইতিহাস পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ইতিহাস পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মানবিক অধিকারও সার্বিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে হবে এবং পাঠক্রম রচনায় এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। জাতীয় পাঠক্রমের বক্তব্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে ইতিহাস পঠনপাঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

NCF-2005 এর সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হবে। বিশ্বের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেশের ইতিহাস পাঠদানের সুপারিশ করে (NCF-2005) এবং বিশ্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি যথাযথভাবে বিভিন্ন শ্রেণির ইতিহাস পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আধুনিক ইতিহাসের অন্যান্য দিকগুলিই থাকবে। সমসাময়িক ভারতের উপরই মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। ইতিহাস পঠনপাঠনের বড়ো উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা। তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের জন্য সমস্ত অঞ্চলের উপর সমান গুরুত্ব স্থাপন প্রয়োজন। NCF-2005 এর বক্তব্য অনুযায়ী ভারতের ইতিহাস কখনও বিচ্ছিন্নভাবে পড়ানো ঠিক নয়। পারস্পরিক সংযোগ সাধনের মাধ্যমে পড়ানো উচিত এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কোথায় কী উন্নতি ঘটছে সেই বিষয়ও উল্লেখ থাকা আবশ্যিক। শিশুর নিজের জগতের ধারাবাহিকতা, পরিবর্তন প্রক্রিয়া, নানান আবিষ্কার, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন এবং তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র ইতিহাসে প্রসারিত হবে। বর্তমানে সামাজিক বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্যে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সমসাময়িক বিষয় আলোচনার অখণ্ড অংশ হিসেবে নারী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে, লিঙ্গ প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাস শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তাই NCF-2005 রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাসের সঙ্গে পড়ানোর সুপারিশ করে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রচলিত বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে ইতিহাস একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমের কথা ভাবা যায় না। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম রচনায় মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩) এবং কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুদালিয়র কমিশনের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি স্তরে বিভাজিত—নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-অষ্টম) এবং

Scanned with CamScanner

উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর (নবম থেকে একাদশ)। মুদালিয়র কমিশন নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসকে পৃথক বা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে না শিখিয়ে সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর সুপারিশ করে। মাধ্যমিক কমিশনের মতে, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরশাস্ত্রকে পৃথক না শিখিয়ে সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে শেখানো বিষয়বস্তুর ভার লাঘব হবে। কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমকে দুটি ভাগে বিভাজিত করে—কেন্দ্রীয় বিষয় (Core subjects) এবং ঐচ্ছিক বিষয় (Optional Subjects)। ঐচ্ছিক বিভাগে সাতটি প্রবাহের (Seven streams) মধ্যে একটি প্রবাহ হল মানববিদ্যা (Humanities) এবং মানববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত আটটি বিষয়ের মধ্যে একটি হল ইতিহাস। কমিশন সুপারিশ করে যে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে স্থান পায়।

কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চারটি স্তরে ভাগ করে—প্রাথমিক (প্রথম-চতুর্থ), উচ্চ-প্রাথমিক (পঞ্চম-সপ্তম শ্রেণি) নিম্ন-মাধ্যমিক (অষ্টম-দশম), উচ্চতর মধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)। কমিশনের মতে, উচ্চ প্রাথমিক স্তরে যোগ্য শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা থাকলে সমাজ বিজ্ঞান এই স্তরে রাখা যেতে পারে। না হলে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি পড়ানো হবে। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়রূপে আবশ্যিকভাবে পড়ানো হবে। কমিশন উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে ইতিহাস পাঠের সুপারিশ করে।

স্বাধীন ভারতে **মুদালিয়র কমিশন**-এর সুপারিশ কার্যকর করে অভীষ্ট ফল লাভ না হওয়াতে কোঠারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই প্রবর্তিত হয়েছে নতুন মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা (১০+২ বা ১০+২ স্তর)। ১৯৭৪ সালে কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের (একাদশ-দ্বাদশ) শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল-এর পাঠক্রম রচনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রারম্ভিক (ষষ্ঠ-অষ্টম) ও মাধ্যমিক স্তরে (নবম-দশম) স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আবশ্যিকভাবে ইতিহাস পড়ানো হয়। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে স্থান পায়।

★ ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতি (Principles of Framing curriculum of History) :

● জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণপর্ষদ ও পাঠক্রম রচনা :

ভূমিকা : পাঠক্রম হল শিক্ষার প্রাণ। পাঠক্রমের গুণগত মানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থার মান। সাধারণভাবে পাঠক্রম কতকগুলি নীতির (principles) উপর

ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিষয় হিসেবে ইতিহাসের কতকগুলি বিশেষত্ব বর্তমান। তাই ইতিহাসের পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি নীতি অনুসরণ করতে হয়।

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ (NCERT) ইতিহাসের পাঠক্রম রচনার কতকগুলি নীতির কথা উল্লেখ করেছে। এই নীতিগুলি হল —

- সমগ্র পাঠক্রমের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য ও মুখ্য ভাবনা (Central Units and Central Theme) থাকবে।
- পাঠক্রম হবে সুসংবদ্ধ ও সামগ্রিক
- পাঠক্রমে বিষয়বস্তু এমনভাবে বিন্যস্ত থাকবে অতীত ও বর্তমানের সংযোগ রেখাটি সুস্পষ্ট হয়।
- উগ্র জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে মুক্ত থাকবে পাঠক্রম।
- পাঠক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থে মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে ধারণা উপস্থাপিত হবে।
- বর্তমান জীবন, দেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা লাভের উপযোগী তথ্য পাঠক্রমে থাকবে।
- শ্রেণি ও বয়স অনুযায়ী তথ্য পাঠক্রমে স্থান পাবে।
- সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল পাঠক্রমে প্রতিফলিত হবে।

● জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ ও পাঠ্যক্রম রচনার নীতি :

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখায় সমাজ বিজ্ঞানের অংশ রূপে ইতিহাস পঠন পাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বলা হয় যে—"History will takes into account developments in different parts of India with sections on events or developments in other parts of the World." (NCF-2005, P-35). পাঠক্রমে এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেখানে সমাজ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত ইতিহাস ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে। জাতীয় পাঠক্রম ২০০৫ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাসের সঙ্গে পড়ানোর সুপারিশ করে। বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেশের ইতিহাস পাঠদানের সুপারিশ করে এবং বিশ্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি যথাযথভাবে বিভিন্ন পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে মানবিক অধিকার ও সার্বিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ হয় এবং ইতিহাস পাঠক্রম রচনায় তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বর্তমানে সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন তথ্যে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য রয়েছে। এক্ষেত্রে যে-কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সমসাময়িক বিষয় আলোচনার অখণ্ড অংশ হিসেবে নারী দৃষ্টিভঙ্গির নিরীক্ষে লিঙ্গ প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

★ **ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতি :**

(১) **অনুবন্ধের নীতি (Principles of Co-relation)** : সমাজ বিজ্ঞানের এ
অন্যতম শাখা হল ইতিহাস। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এ বলা হয়
পাঠক্রমে এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেখানে স
বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে আর্ন্তঃসম্প
স্থাপিত হয় এবং একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে। জাতীয় পাঠ্যক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ইতিহাসের সঙ্গে পড়ানোর সুপারিশ করে। বস্তুতপক্ষে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনার সময়
সমস্ত বিষয় (Discipline) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

(২) **সামগ্রীকতার নীতি (Principles of Holistic Approach)** : স্থানকা
পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সার্বিক প্রগতির কাহিনি হল ইতিহা
ইতিহাস হল সর্বাত্মক (Comprehensive) সুতরাং ইতিহাসের পাঠ্যক্রম হবে ব্যা
ও সর্বাত্মক (wide and comprehensive) ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে মানব জীব
তথা মানব সভ্যতার পূর্ণাঙ্গরূপ প্রতিফলিত হবে। ইতিহাসের পাঠক্রমের মধ্য দি
মানব জীবনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সমগ্র মা
সভ্যতার একটি ধারণা লাভ করতে পারে। মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক
সমস্ত বিষয় অর্থাৎ সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, অর্থনৈতি
জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া না
ইতিহাস, কুটনৈতিক ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস, মতাদর্শের ইতিহাস, প্রশাসনি
ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস প্রভৃতি ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। স্থানী
ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাস এই বিষয়ের পাঠক্র
অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) **গতিশীলতার নীতি (Curriculam should be Dynamic)** : ইতিহাসে
ধারা সদা পরিবর্তনশীল। গতিশীলতাই ইতিহাসের প্রাণ। এই গতিশীলতার প
ধরে মানব সভ্যতা বর্বর যুগ থেকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি যুগে এসে পৌঁছেছে
ইতিহাস পঠন পাঠনের এক অন্যতম শর্ত হল এর গতিশীলতার সঙ্গে পরিচি
থাকা। ইতিহাসের নিত্য নতুন গবেষণা ও নতুন ব্যাখ্যা ইতিহাসকে গতিশী
রাখে। গবেষণার ফলে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। পুরনো ধারণা ও ধ্যানধার
পরিত্যক্ত হচ্ছে। নতুন ধারণা ও ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা গৃহীত হচ্ছে। এভা
ইতিহাস হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও গতিশীল। সুতরাং ইতিহাস পরিবর্তনশীল এ
ইতিহাসের পাঠক্রমে এই পরিবর্তনশীলতার প্রতিফলন যাতে ঘটে সেদিকে দৃ

দিতে হবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে পূর্বে সিন্ধু সভ্যতাকে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত যে মেহেরগড় সভ্যতা হল ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা।

(৪) **নৈর্ব্যক্তিকতার নীতি (Principle of Objectivity)** : নৈর্ব্যক্তিকতা ইতিহাস চর্চার বিশেষ দিক। ইতিহাস পঠনপাঠন একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এই কারণে ইতিহাসকে উপস্থাপনের দায়দায়িত্ব অনেক। ইতিহাস হবে পক্ষপাতমুক্ত। পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস আতঙ্কের বিষয়। তাই ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনার সময় বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইতিহাসের পাঠক্রমে এমন বিষয় স্থান পাবে না যা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ব্যক্তিগত (Personal Prejudices), সম্প্রদায়গত (Group Prejudices), ধর্মীয় (Religious Beliefs), জাতি ও জাতীয়তা সংক্রান্ত (Racial and National differences), প্রাদেশিক (Provincial), সম্প্রদায়গত (Communal) যে- কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক বিষয়বস্তু পাঠক্রমের অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত নয়। সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠক্রম রচনা করতে হবে।

(৫) **ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of Continuity)** : ইতিহাসের অপরিহার্য ধর্ম হল নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। ইতিহাসের গতি প্রবহমান নদীর স্রোত ধারার মতো। পাঠক্রম রচনাকালে সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই ধারাবাহিকতা কোনোমতেই বিঘ্নিত না হয়। প্রাচীন, মধ্য আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস— এই ক্রম অনুসারে ইতিহাসের বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করতে হবে যাতে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতার নীতি বজায় থাকবে। পাঠক্রম এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানকালের মানুষের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। ধারাবাহিকতার নীতির দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কালচেতনা গড়ে তোলা যায়। শিক্ষার্থীরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্পর্ক বুঝতে পারে।

(৬) **ইতিহাস পঠনপাঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক (Based on aims and objectives of Teaching History)** : ইতিহাস পঠনপাঠনের কতকগুলি মৌলিক লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট আছে। পাঠক্রম হল লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। তাই পাঠক্রম রচনাকালে বিষয়বস্তু এমনভাবে সন্নিবেশিত হবে যেন তা এইসব লক্ষ্য পূরণের সহায়ক হয়। শিক্ষার স্তরভেদে শিক্ষার লক্ষ্যের তারতম্য ঘটে এবং সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাসের পাঠক্রম রচনা করতে হবে। পাঠক্রমে এমন অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা ইতিহাস পঠনপাঠনের লক্ষ্যের বাস্তবায়নের সহায়ক।

Scanned with CamScanner

ebook.dascoaching.in

(৭) **মনোবৈজ্ঞানিক নীতি (Principle of Psychology) :** শিক্ষা হল এক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার একটি অন্যতম ভিত্তি। ব্যক্তি বৈষম্যে নীতি (Individual Differences) অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, সামর্থ্য, ধার ও গ্রহণ ক্ষমতা প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে পাঠ্য রচনা করতে হবে। এছাড়া জানা অজানা, সরল থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূ সমগ্র থেকে অংশ, বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক নীতি অনুক করে পাঠক্রম রচিত হবে।

(৮) **জাতীয় ঐক্য, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও বিশ্ব শান্তির উপর গুরুত্ব আরোপ (Principle of National Unity, International Understanding and Peace) :** ইতিহাসের পাঠক্রম রচনার সময় জাতীয় চাহিদার পাশাপাশি আন্তর্জাতি চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে। ইতিহাসের পাঠক্রম জাতীয়তাবোধের উন্মে জাতীয় সংহতি স্থাপন, আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ ও বিশ্ব শান্তি স্থাপনে উপর গুরুত্ব আরোপ করে রচিত হবে। পাঠক্রমে এমন বিষয়বস্তু ও কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ এ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে।

(৯) **সামাজিক চাহিদার নীতি (Principle Social Relevance) :** ব্যক্তির চাহিদ পাশাপাশি সামাজিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে সমাজবদ্ধ মানুষের ক্রমবিবর্তনের কাহিনি হল ইতিহাস। পাঠক্রমে এমন অভিজ্ঞ থাকবে যা সমাজ ও জাতীয় জীবনের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। সমাজ সচেতন সৃষ্টি, সুনাগরিক গুণাবলির বিকাশ, মূল্যবোধের বিকাশ, জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, জাতীয় সংহতি স্থাপন, আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ প্রভৃতি হল ইতিহা শিক্ষণের উদ্দেশ্য। ইতিহাসের পাঠক্রমে এই সমস্ত সামাজিক বিষয়গুলির উপ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

(১০) **সুসংবদ্ধতার নীতি (Principles of Functional Relationship) :** পাঠক্র হবে অবিভাজ্য ও অবিচ্ছিন্ন। পাঠক্রম হল সামগ্রিক ব্যাপার (Organic Whole) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) ইতিহাস পাঠ্যক্রমের মধ্যে সুসমন্বয় থাকবে। বিভিন্ন স্তরে ইতিহাসে পাঠ্যক্রমে যে বিষয় বা অভিজ্ঞতাগুলি সংযোজিত হবে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক (functional relationship) থাকবে বিভিন্ন শ্রেণির ইতিহাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি সুসংবদ্ধতা বজায় থাকবে সমগ্র বিদ্যালয় স্তরকে একটি একক ধরে ধাপে ধাপে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রেণির

কথা বিবেচনা করে পাঠক্রম রচিত হবে বা পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে। প্রতিটি স্তরের পাঠক্রম রচিত হবে পূর্ববর্তী স্তরের বা শ্রেণির পাঠক্রমকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। সমস্ত পাঠক্রম হবে 'Well connected and co-ordinated', কোনো বিচ্ছিন্নতা নয়। পূর্ববর্তী সমগ্র পাঠক্রমের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয়ভাব বা কেন্দ্রীয় ঐক্য থাকবে।

(১১) **তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হবেনা (Curriculum should not be free from overloading) :** পাঠক্রম অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক, ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জাতীয় ও বিশ্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি পাঠক্রমে স্থানভাবে পুনরাবৃত্তি (Repetation) যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা ভালো। কারণ এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেঁয়েমি ও বিরক্তি সৃষ্টি করে। জাতীয় ও বিশ্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (Import Landmarks) পাঠক্রমে স্থান পাবে।

(১২) **কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি (Principle of Activity Centredness) :** শিক্ষার মূলনীতি হল 'learning by doing'। শিশুর শিখন তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে হাতেনাতে সত্যতা যাচাই করে দেখে। তাই ইতিহাসের পাঠক্রম রচনার সময় এমনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যেন কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় হয়।

(১৩) **সৃজনশীলতার নীতি (Principle of Creativity) :** পাঠক্রম এমনভাবে রচনা করা উচিত যেন তা শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তি, মৌলিক ক্ষমতা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশকে সহায়ক হয়।

(১৪) **বৈচিত্র্যের নীতি (Principle of Diversity) :** শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual differences) চাহিতা ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে এমনভাবে পাঠক্রম করা উচিত যাতে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু ও কার্যাবলির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে পাঠক্রম রচনার সময় তাকাতে হবে পিছনের দিকে। পূর্বসূরীদের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের দিকে। তাকাতে হবে বর্তমানের দিকে। চলতি জীবনের প্রয়োজনীয়তার দিকে। তাকাতে হবে সামনের দিকে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার দিকে।

★ পাঠ্যসূচি রচনার মূল নীতি (Criteria of Content for of selecting the History syllabus at secondary and Higher Secondary Level) :

ভূমিকা : পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সমার্থক নয়। মূলত: পাঠ্যসূচি পাঠক্রমের অংশ বিশেষ। পাঠক্রমের আলোচনার পরিসর পাঠ্যসূচি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। পাঠক্রম হল একাধিক বিষয়ের সমষ্টি (বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি)।

Scanned with CamScanner

অপরদিকে পাঠ্যসূচি হল কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের (Particular Subject) সুনির্বাচিত বিষয়বস্তু সমূহ অর্থাৎ ইতিহাসের নির্বাচিত বিষয়বস্তু নিয়ে গড়ে ওঠে ইতিহাসের পাঠ্যসূচি, ভূগোলের নির্বাচিত বিষয়বস্তু নিয়ে গড়ে ওঠে ভূগোলের পাঠ্যসূচি। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান, গণিত, বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি বিষয়ের নির্বাচিত অংশ নিয়ে ওই সমস্ত বিষয়ের (Subject) পাঠ্যসূচি রচিত হয়। পাঠ্যসূচি শিক্ষার চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহায়ক। পাঠ্যসূচি সংখ্যক পাঠ এককের (Unit Lesson) সমষ্টি, এই সমন্বয় এমনভাবে করা হয় যাতে প্রতিটি পাঠ এককের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ দিকের বিকাশ সাধন ঘটায়। পাঠ্যক্রম রচনার ন্যায় পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু নির্বাচনী কিংবা বিষয়বস্তু সংগঠনের কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা হয়। এই নীতিগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

- ইতিহাস পড়ার কতকগুলি মৌলিক লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যসূচি রচিত হবে। পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু অবশ্যই ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হবে।
- ইতিহাস হল ক্রম উন্নতিমূলক (General Development) বিবর্তনের কাহিনি, পাঠ্যসূচি এই ধারাবাহিক প্রগতির চেতনা সৃষ্টির সহায়ক হবে।
- বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীর ধারণা গ্রহণ ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে পাঠ্যসূচি রচিত হবে।
- ইতিহাস হল সমাজ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং পাঠ্যসূচিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পাবে যা সমাজ চেতনা, সামাজিক অগ্রগতি, সামাজিক সমস্যা, মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও ধারণা লাভ করতে সাহায্য করে।
- পাঠ্যসূচি ইতিহাস চেতনা সৃষ্টির সহায়ক হবে। একটি কেন্দ্রীয় ভাবনা সামনে রেখে অন্যান্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে, পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু এমন ভাবে নির্ধারিত হবে যাতে সমগ্র পৃথিবীর মানব সভ্যতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ কবতে পারে। ইতিহাসের পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা একই সঙ্গে অতীতকে জানবে, বর্তমানকে বুঝতে পারবে ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবে।
- পাঠ্যসূচি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের যোগ্য হওয়া উচিত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে যাতে সহজভাবে পাঠ্যসূচি অনুসরণ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে পাঠ্যসূচি রচনা করা উচিত।
- পাঠ্যসূচি অবশ্যই কার্য দিবসের (Working Day) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। শিক্ষাবর্ষের (Academic Year) নির্দিষ্ট সংখ্যক কার্যদিবসের মধ্যে যাতে পাঠ্যসূচি শেষ করা যায় সেটি বিবেচনা করে পাঠ্যসূচি রচনা করা উচিত।
- সামগ্রিকতার নীতি অনুসরণ করে পাঠ্যসূচি রচিত হবে। ইতিহাস হল সর্বাত্মক (Comprehensive)। ইতিহাস হল মানুষের জীবনের কাহিনি। মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ ইতিহাসে স্থান পাবে— মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে স্থান পাবে।
- ইতিহাস হল সর্বজনীন। পৃথিবীর সমগ্র সম্প্রদায়ের কথা, মানবসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে প্রতিফলিত হবে। পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে মানব সভ্যতার ইতিহাস পাঠ্যসূচির অর্ন্তভুক্ত হবে।
- দেশের ইতিহাস বিশ্বের ইতিহাসের পটভূমিতে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে পারস্পারিক সম্পর্ক ও প্রভাব সুস্পষ্ট হয়। তাই জাতীয় ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ্যসূচিতে থাকবে না।
- অনেক সময় একই বিষয় বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে স্থান পায়। এক্ষেত্রে পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর না হয়। এছাড়া পাঠ্যসূচি অতিরিক্ত তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত না হয় সেদিকে মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যসূচি রচনা করতে হবে।

★ পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা (Evaluation of Existing History Syllabus at Secondary & Higher Secondary Level in West Bengal) :

ভূমিকা : যশপাল কমিটির প্রতিবেদন (১৯৮৯), জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫, শিক্ষা অধিকার আইন (২০০৯) ও নির্মিতিবাদ তত্ত্ব হল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বা ভিত্তি। যশপাল কমিটির প্রতিবেদনে ভারমুক্ত শিখন (Learning without Burden) ও আনন্দময় শিখন (Joyful Learning)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয় যে শিক্ষা হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এবং শিক্ষা পদ্ধতি হবে নির্মিতিবাদ। শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নতুন শিখন সমস্যা বা নতুন শিখন (New Learning Situation) পরিস্থিতির সঙ্গে মিশিয়ে নতুন জ্ঞান নির্মাণ করবে (Create New Knowledge), শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী চারটি সামর্থ্য অর্জন করবে— জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতা। শিখনের চারটি পর্যায়ের জানার শিক্ষা (Learning to know), করার শিক্ষা (Learning to do), একসঙ্গে বসবাস করার শিক্ষা (Learning to live together) ও হয়ে ওঠার শিক্ষা (Learning to be)-এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবে এবং সমাজের একজন হয়ে উঠবে। উপরিউক্ত চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বিদ্যালয় স্তরে (ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি) ইতিহাস বিষয়ের নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করে। ২০০৭ সাল থেকে ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্তরে নতুন পাঠক্রম প্রণীত হয়। ২০০৭ সালে মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়। ২০১১ সালে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসের

Scanned with CamScanner

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নবীকৃত হয়। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির (উ
মাধ্যমিক স্তর) পাঠক্রম সংশোধিত ও নতুন পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়। অতি সম্প্রতি নবম
দশম শ্রেণির পাঠক্রম বিভাজন করে কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠক্রমের ভিত্তিতে মাধ্যমি
পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

○ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য (Aims of Studying History i Secondary Level) :

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ২০০৭ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরের জন্য ইতিহাসের নতু
পাঠক্রম চালু করে। পর্ষদ নির্ধারিত এই নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের ইতিহা
পাঠের লক্ষ্যগুলি হল —

- মানব সভ্যতার সার্বিক অগ্রগতির (Past development of human civilizatio বা বিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ।
- অতীতের বিভিন্ন ঘটনাবলির কার্য-কারণ সম্পর্কের (Casual Relationship) আলো বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনাবলির কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রকৃতি উপলব্ধি (Understanding) করা।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে সাধারণ (Acqui General Knowledge) জ্ঞান লাভ।
- মানবসভ্যতার রূপান্তর বা বিবর্তনে (Process of transformation of civilizatio মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক—ঘাত ও প্রতিঘাত (Struggles and Encounter সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- পৃথিবীর নানা দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্থান-পতন ও বিবর্তনের (Rise- Fall an Transformation) স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- সম্পদ সৃষ্টি তথা উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of production system fo creating wealth in human society) ও উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা সমাজে শ্রমজীবী মানুষের (Position of labouring community) স্থান সম্পর্কে সাধারণ ধারণ লাভ।
- সমাজ পরিবর্তনে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং মনীষীদের (Thinkers) ভূমিক সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- যে সমস্ত ঘটনা সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে, সেইসব ঘটনাবলি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা ও শিক্ষার্থীদের সত্যানুসন্ধানে আগ্রহী করে তোলা।
- ইতিহাস দেশকালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়—এই বিশ্বজনীনবোধ জাগ্রত করা।

○ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠ্যসূচি (Syllabus of History at Secondary Level in West Bengal) :

মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠক্রম বিভাজিত— নবম শ্রেণির ও দশম শ্রেণির। নীচে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠসূচি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল—

★ নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচি :

◆ **প্রথম অধ্যায় : ভারতীয় ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব**

(১) দেশের নামকরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা—সিন্ধুনদের সঙ্গে 'ইন্ডিয়া'/'হিন্দুস্থান' নামের সম্পর্ক—দেশের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী নামের উৎপত্তি—কোনো বিশেষ জাতি/ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় (সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হিসেবে উল্লিখিত হবে)—ভৌগোলিক উপাদানসমূহ : ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতির (নদনদী, পর্বতমালা, সমুদ্র) বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভাজন সমূহের উল্লেখ—প্রভাব। (২) ভারতবর্ষের আদিম জনগোষ্ঠীসমূহ ("নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর") ও তাদের বিবর্তন (অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখ) বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের ধারণা (সংক্ষিপ্ত) (৩) ভারত ইতিহাসের উপাদান (প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব)।

◆ **দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তন**

(ক) (১) ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব—প্রাগৈতিহাস যুগের সভ্যতার নিদর্শন— মেহেরগড় সভ্যতার নিদর্শন (কেবলমাত্র অবস্থান ও ব্যাপ্তি উল্লেখ)—হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ (সংক্ষিপ্ত)—ধ্বংসের কারণ— বিশ্বের সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক।
(২) বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ—আর্যদের পরিচয়—তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আগমনের কাল, বসতি বিস্তার (একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ)—আর্যদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনধারার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা—বৈদিক সাহিত্য (সংক্ষিপ্ত রূপরেখা)—হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার বৈসাদৃশ্যসমূহ (৩) (ক) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অর্থনৈতিক, সামাজিক বিবর্তন : বাণিজ্যের প্রসার—নগরের উত্থান—বৈদিক যুগের শেষে বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতি বিন্যাস—নগর, বাণিজ্য, বণিক শ্রেণি। (খ) প্রতিবাদী আন্দোলন— আন্দোলনের আদর্শ—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা ও প্রভাব।

◆ **তৃতীয় অধ্যায় :**

(ক) রাজশক্তির উত্থান (বৈদিক যুগের শেষদিকে উপজাতি গোষ্ঠীসমূহের সংঘাত)—যুদ্ধ বিগ্রহ রাজশক্তির উত্থান—ষোড়শ মহাজনপদ—মগধের উত্থান—উত্থানের কারণসমূহ। (খ) মৌর্য সাম্রাজ্য—উৎপত্তি-চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য—গ্রিকদের সঙ্গে সংঘাত—সাম্রাজ্যের বিস্তার—মৌর্য শাসনব্যবস্থা (সংক্ষিপ্ত ধারণা)—অশোক—ধম্মবিজয়—

Scanned with CamScanner

মৌর্যশক্তির পতন। (গ) মৌর্যোত্তর যুগে বিভিন্ন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা : (কুষাণ ও সাতবাহন)
(ঘ) গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা—প্রসার।

◆ **চতুর্থ অধ্যায় :**
গুপ্ত রাজশক্তির অবক্ষয়— উত্তর ও দক্ষিণ আঞ্চলিক সামন্ত রাজ্যসমূহের উদ্ভব— রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

◆ **পঞ্চম অধ্যায় :**
(ক) প্রাচীন ভারতে সামাজিক রূপান্তর—অর্থনৈতিক জীবন—কৃষির প্রাধান্য—সামন্ত প্রথা (ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ)—জাতিপ্রথা—নারীর অবস্থান-ভারতের বহির্বাণিজ্য
(খ) ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিত্রকলা (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ—১২০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) (কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত নয়, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকতে হবে)।

◆ **ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলাম ও ভারতবর্ষ :**
(ক) দিল্লির সুলতানির রাজনৈতিক ইতিহাস (অহেতুক বংশানুক্রমিক ইতিহাসের দীর্ঘ বিবরণ অনাবশ্যক)—আরবদের সিন্ধুবিজয় (ভূমিকা হিসেবে প্রসঙ্গ উল্লেখমাত্র)—গজনির সুলতান মামুদ—মহম্মদ ঘোরী—দিল্লির সুলতানি প্রতিষ্ঠা—কুতবুদ্দিন আইবক—ইলতুতমিস ও রাজিয়া—গিয়াসুদ্দিন বলবন—খলজি শাসন— তুঘলক বংশ—মহম্মদ বিন তুঘলক—ফিরোজ তুঘলক—সৈয়দ ও লোদি বংশ (সংক্ষিপ্ত)
(খ) মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—বাবর— মোগল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা (সামগ্রিকভাবে)— শেরশাহের শাসনব্যবস্থা—মোগল সাম্রাজ্যের প্রসার (আকবর—ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত সামগ্রিক রূপরেখা) মুঘল রাজশক্তির কেন্দ্রীভূত শাসন ও সংহতি—মনসবদারি প্রথা—জায়গিরদারি সংকট—আঞ্চলিক বিদ্রোহ-(বিদ্রোহগুলির উল্লেখ যথেষ্ট, কোনো একটি বিদ্রোহের বিশদ বিবরণ প্রয়োজন নেই।)—সাম্রাজ্যের অবক্ষয়।

◆ **সপ্তম অধ্যায় : সুলতানি ও মোগল যুগে ভারতের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি**
(১) সুফি ও ভক্তি আন্দোলন (সংজ্ঞা এবং সন্তদের নামোল্লেখই যথেষ্ট। বিস্তারিত জীবনী প্রয়োজন নেই। সমন্বয়বাদী সাংস্কৃতিক চেতনার বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রয়োজন।) (২) চিত্রকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য (সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির প্রতিফলন গুরুত্ব পাবে)।

◆ **অষ্টম অধ্যায় :**
(১) মোগল ভারতে বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পের বিকাশ— (মোগল যুগে বাণিজ্য সম্পর্কে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে যেন ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব অনুল্লিখিত না থাকে) (২) ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক (৩) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক।

◆ **নবম অধ্যায় :**
ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম অধ্যায়— বাংলা ও দক্ষিণ ভারত— ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা— ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। (ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির যে যোগসূত্র ছিল তার স্পষ্ট কথায় উল্লেখ প্রয়োজন।

★ **দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি :**

◆ **প্রথম অধ্যায় :**
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার এবং ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর প্রতিষ্ঠা (১৭৬৫-১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

◆ **দ্বিতীয় অধ্যায় :**
ব্রিটিশরাজের আমলে ভারতীয় অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব

◆ **তৃতীয় অধ্যায় :**
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ

◆ **চতুর্থ অধ্যায় :**
উনিশ শতকের ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ

◆ **পঞ্চম অধ্যায় :**
ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগ, কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিভাজন, সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা

◆ **ষষ্ঠ অধ্যায় :**
সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি, বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও ভারত, মহাত্মা গান্ধি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপান্তর

◆ **সপ্তম অধ্যায় :**
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ও বিস্তার

◆ **অষ্টম অধ্যায় :**
১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

◆ **নবম অধ্যায় :**
স্বাধীন ভারতের সংবিধান, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ

◆ **দশম অধ্যায় :**
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতি

Scanned with CamScanner

○ মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা (Critical Revie of History curriculam and Syllabus of Secondary Level) :

মাধ্যমিক স্তরে প্রচলিত ইতিহাস পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ন প্রবর্তিত পাঠ্যসূচির কিছু ভালো দিক ও কিছু মন্দ দিক আছে। এইগুলি নীচে উল্লেখ করা হল—

★ সুবিধা - (Merit) নতুন পাঠ্যসূচির ইতিবাচক দিকগুলি হল—

➤ নতুন পাঠক্রমে শুধু ভারতবন্দনা নয়, বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতী ইতিহাস উপস্থাপিত হয় যা জাতীয় সংহতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকা ও বিশ্ব শান্তি প্রচারের সহায়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে জাতীয় পাঠক্রমে রূপরেখা-২০০৫-এ বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেশের ইতিহাস পাঠদান এবং বি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি বিভিন্ন শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সুপারিশ করে।

➤ নতুন পাঠ্যসূচির রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম, ধর্মী জীবন, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

➤ মানব সমাজ সংস্কৃতির ও বিবর্তনের ধারা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর কার সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা যায়।

➤ সমগ্র পাঠক্রমে চলমানতা বা ধারাবাহিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাসে ধারা প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানে এসে মিশেছে। পাঠক্রমে সাম্প্রতিক ইতিহাস গুরুত্বলাভ করেছে।

➤ বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা শিক্ষার্থীর নাগরিক অধিকার, দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একজন নাগরিকের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হবে। জাতীয় পরিক্রমা-২০০৫ এর অন্যতম সুপারিশ ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাসের সঙ্গে পড়ানো হোক। স্বাধীন ভারতের সংবিধান, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

➤ বহু নতুন বিষয় এই পাঠ্যসূচি বা পাঠক্রমে সংযোজিত হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হরপ্পা-পূর্ববর্তী যুগের বেশ কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বেলুচিস্তানের মেহেরগড় সভ্যতা উল্লেখযোগ্য। ফলে মেহেরগড়ের সভ্যতা পাঠ্যভুক্ত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিহাসের আধুনিক গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

➤ ইতিপূর্বে মাধ্যমিক স্তরে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস পড়ানো হত। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর প্রতিষ্ঠা, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ, স্বাধীন ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ ছিল না। বর্তমান পাঠ্যসূচিতে স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতি (জাতিসংঘ, ঠান্ডা লড়াই, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি, স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।

➤ ইতিহাসের পাঠক্রম পর্যালোচনার অন্যতম মাপকাঠি হল যে এই পাঠক্রম ইতিহাস পাঠের লক্ষ্যের সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এই পাঠক্রম ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য পূরণে কতটা সহায়ক? ইতিহাসের পাঠের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীকে নিজের দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্ব সংস্কৃতির মেলবন্ধন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো ও সচেতনতা সৃষ্টি। বর্তমান ইতিহাসের পাঠক্রম ইতিহাস পাঠের এই লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক।

➤ ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনার অন্যতম নীতি হল গতিশীলতা বা পরিবর্তনশীলতার নীতি। এই পরিবর্তনশীলতা দুরকমের হতে পারে— নতুন ঘটনার অন্তর্ভুক্তি ও পুরনো ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা। বর্তমান ইতিহাসের পাঠক্রমে এই দুধরনের গতিশীলতার নীতি প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মেহেরগড় সভ্যতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতি, স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি, ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ প্রভৃতি নতুন বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদিন মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কেবলমাত্র সামরিক ও রাজনৈতিক কারণকে দায়ী করা হত। সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

➤ পাঠক্রম রচনার অন্যতম নীতি হল অনুবন্ধের নীতি। বর্তমান পাঠক্রমে এই নীতিটি অনুসরণ করা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা হল ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় গ্রহণ করে বর্তমান মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমটি রচিত হয়েছে।

➤ প্রচলিত পাঠক্রমে বাস্তবতার নীতি অনুসৃত হয়েছে। পাঠক্রম বর্তমান দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা গঠনের সহায়ক তথ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে।

➤ দেশ ও বিশ্ব চাহিদার কথা বিবেচনা করে রচিত হওয়া উচিত। বর্তমান পাঠক্রম এই চাহিদা পূরণে অনেকাংশে সফল হয়েছে। জাতীয় রাজনীতি, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ,

Scanned with CamScanner

জাতীয়তাবাদ বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় ব্যক্তিত্ব, সংবিধান, জা
অর্থনীতি, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী
প্রভৃতি বিষয়ের উপর বর্তমান পাঠক্রমে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা জাতীয়তাবো
ও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার সহায়ক। শুধুমাত্র ভারতবন্দনা নয়, বর্তমান পাঠক্রমে বি
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জাতীয় ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে যা স্বাদেশিকতাবোধ
জাতীয় সংহতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্ব শান্তি প্রসারে
সহায়ক।

★ **সীমাবদ্ধতা** (De-merit) :

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত সংশোধিত মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসে
পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচিতে জাতীয় ইতিহাসের উপর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব আরো
করা হয়েছে। আঞ্চলিক ও বিশ্ব ইতিহাসের উপর কম আলোকপাত করা হয়েছে।
- সমস্ত অঞ্চলের ইতিহাস সমানভাবে গুরুত্ব পায়নি। বিশেষ করে সুলতানী যুগে বাংলার
ইলিয়াসশাহী-হুসেনশাহী বংশের ইতিহাস, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর ও বাহমণি রাজ
প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পাঠ্যসূচিতে স্থান পায়নি।
- সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে দশম শ্রেণি
পাঠ্যসূচিতে। সমকালীন ভারতের বিশেষ করে (১৮৫৮-১৯৪৭) ঊনবিংশ শতকে
দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গুরু
দেওয়া হয়নি।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিম্নবর্গের (Subaltern) আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম
ভারতের নিম্নবর্গের মানুষ বিশেষত কৃষক, আদিবাসী সম্প্রদায় গোড়া থেকেই ইংরেজ
শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই
যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে (১৮৫৮-১৯৪৭) স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যে
সমস্ত কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন নীলবিদ্রোহ (১৮৫৮), দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা (১৮৭৬),
মোপালা বিদ্রোহ (১৯২১), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) সংগঠিত হয়েছে সেগুলি
এই পাঠ্যসূচিতে স্থান পায়নি। অর্থাৎ নিম্নবর্গের আন্দোলনে এখানে গুরুত্ব কম দেওয়া
হয়েছে।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা অসামান্য। সিপাহী বিদ্রোহ, বাংলার সশস্ত্র
বৈপ্লবিক আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, গান্ধিজি পরিচালিত অসহযোগ, আইন অমান্য
ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা লক্ষ করা যায়। জাতীয় পাঠক্রম-২০০৫ নারীর ভূমিকাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার

উপর জোর দেয়। সুতরাং নারীর ইতিহাস পৃথকভাবে আলোচনার প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা বিশেষভাবে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া দরকার।

- নবম ও দশম শ্রেণির পাঠক্রমের বিভাজন যথাযথ নয়। বিষয়বস্তু বণ্টনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার অভাব লক্ষ করা যায়। তুলনামূলকভাবে দশম শ্রেণির পাঠক্রমের বোঝা অতিরিক্ত হয়েছে (১৭৬৫ থেকে স্বাধীন ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ পর্যন্ত)
- পাঠ্যক্রম রচনার অন্যতম নীতি হল মনোবৈজ্ঞানিক নীতির অনুসরণ। কিন্তু প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে এই নীতির প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত— মনস্তত্ত্বের এই নির্দেশ মেনে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ঘটেনি। তবে বিষয়বস্তুর গভীরতা নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, ধারণ ও গ্রহণ ক্ষমতা অনেকাংশে বিবেচনা করা হয়েছে।

❍ **পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা :**

ভূমিকা : ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের নতুন পাঠক্রম প্রবর্তন করে। এই পাঠক্রম বিভাজিত— একাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম (ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস) ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম (সভ্যতা ও স্বদেশ)। শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করে উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হবে বলে সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষাকে তিনটি স্তরে বিভাজিত করা হয়। এই তিনটি স্তর হল প্রারম্ভিক স্তর (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি), মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণি) ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ শ্রেণি)। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটিকে +২ স্তর নামে অভিহিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইতিহাস পাঠ আবশ্যিক। মাধ্যমিক স্তরের পর +২ স্তরে ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হল বিশেষীকরণের স্তর। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (১৬-১৭) বিশেষীকরণের সূচনা ঘটে। এই স্তরে ইতিহাস পাঠ মূলত ঐচ্ছিক। ধরে নেওয়া হয় এই স্তরে যারা ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করে তাদের একটা বিরাট অংশ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করবে। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ১৬-১৭। এটি বৌদ্ধিক বিকাশের চূড়ান্ত স্তর। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা আরোহী চিন্তন (Inductive Thinking), অবরোহী চিন্তন (Deductive Thinking), বিমূর্ত চিন্তন (Abstract Thinking), সম্ভাব্য সমস্যা সমাধান করা (Problem Solving Ability), Reflecting thinking প্রভৃতির অধিকারী হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত পরিণত হয়। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

★ **উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** (Aims and objectives of Teaching History at Higher Secondary Level) :

➤ যে-কোনো বিষয় পঠনপাঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল বিষয়ের প্রতি আগ্রহ (Interest) সৃষ্টি করা। প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাকে আরো গভীর ও দৃঢ় করা এই স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য।

➤ স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের কার্যাবলির বিশ্লেষণ হল ইতিহাস। স্থান ও কাল হল ইতিহাসের প্রধান দুটি চোখ, প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরে যে স্থান ও কাল চেতনা গড়ে ওঠে সেটিকে শক্তিশালী ও দৃঢ় (Strengthened and Consolidated) করা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।

➤ যুক্তি দেওয়া, তর্ক-বিতর্ক করা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য।

➤ শিক্ষার্থীর মধ্যে সমালোচনামূলক ও বিজ্ঞানসম্মত (Critical and Scientific attitude) গড়ে তোলা।

➤ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানকে দেখা ও ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গি (Forward Looking) সম্পন্ন বা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করে গড়ে তোলা। এর পাশাপাশি অতিতের সঙ্গে বর্তমান ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্পর্ক সচেতনতা সৃষ্টি করা। এই স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য।

➤ বিশ্ব সংস্কৃতি হল বিশ্ববাসীর দান। বিশ্বের প্রতিটি দেশ সংস্কৃতিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার। এই বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা ইতিহাস পঠনপাঠনের অন্যতম লক্ষ্য।

➤ কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না। প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে এক বা একাধিক কারণ রয়েছে। এই কার্যকারণ বিধির (Lay of Cause and Effect) সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো এই স্তরে ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য।

➤ শিক্ষার্থীদের বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, অতীত অভিজ্ঞতার সম্পর্কে এই সমস্যাগুলির সমাধানের সম্ভাব্য সমাধানের দক্ষতা গড়ে তোলা ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের চেতনা সঞ্চার করাই ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য।

➤ সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের ক্রম বিবর্তনের ধারা হল ইতিহাস। তাই মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া ও সচেতনতা সৃষ্টি ইতিহাস পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

★ **একাদশ শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচি** (Syllabus of History at standard XI) :

✍ প্রথম অধ্যায় ইতিহাস বোধ :

- প্রাক্-ইতিহাস, প্রায়-ইতিহাস, ইতিহাস; প্রথম দিকার উপাদান ও তার প্রকৃতি; লিখিবদ্ধ ইতিহাস ঘটনাবলি এবং সেগুলির ব্যাখ্যা; পুরাণ, ঐতিহ্য; মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস রচনায় ইন্দো-ফারসি ঐতিহ্য; ইতিহাসে সময়ের ধারণা— বৈধিক এবং বৃত্তকার ইতিহাসের যুগবিভাগ এবং সময়ানুক্রম; গতানুগতিক ত্রিধারা যুগবিভাগ, যুগ বিভাগের বর্তমান প্রবণতা; একাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির সময়, কাঠামো ও অভিমুখ : প্রধান নির্দেশক ও রূপান্তরের ওপর আলোকপাত।

✍ দ্বিতীয় অধ্যায় - আদিম মানবসমাজ থেকে প্রাথমিক সভ্যতার উন্মেষ :

- কালপর্ব— প্রত্নসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা — প্লেসটোসিন, প্রাচীন প্রস্তর, নব্য প্রস্তর ও তাম্র-ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি — আদি আফ্রিকা ও আদি মানব — খাদ্য সংগ্রহকারী এবং তাদের সংস্কৃতি — জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি স্থানত্যাগ — প্রথম পশুপালক ও কৃষিজীবী: নদীমাতৃক সভ্যতা — মেহের গড়, হরপ্পা, মিশর ও সুমের।

✍ তৃতীয় অধ্যায় - রাজনীতির বিবর্তন : শাসন এবং প্রতিষ্ঠানের ধারণা

- গ্রিসের নগর রাষ্ট্র; রাজতন্ত্র — জনপদ থেকে মহাজনপদের উদ্ভব; সাম্রাজ্যের সংজ্ঞা — সাম্রাজ্য ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য; কয়েকটি সাম্রাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা — মৌর্য সাম্রাজ্য ও মেসিডোনিয়ান সাম্রাজ্য, রোম সাম্রাজ্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য, মোগল সাম্রাজ্য ও অটোমান সাম্রাজ্য।

✍ চতুর্থ অধ্যায় - আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও তার প্রশাসন

- রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয় কৌটিল্য, বারনি, সিসেরো ও টমাস ক্রমওয়েল; শাসনযন্ত্র — পারস্যের ক্ষত্রপ, চিনে ম্যান্ডারিন, দিল্লি সুলতানির ইক্তাদার, মোগল মনসবদার।

✍ পঞ্চম অধ্যায় - অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

- দাস অর্থনীতি ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দাসত্ব — রোম, মিশর ও ভারতে দাস অর্থনীতির স্বরূপ। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি — পশ্চিম ইওরোপের ধ্রুপদী মডেল, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, গুপ্ত সাম্রাজ্য ও দিল্লি; বাণিজ্যে ও নগরায়ণের সংকোচন ও প্রসারণ, ইউরোপ ও ভারতের তুলনা।

✍ ষষ্ঠ অধ্যায় - সামাজিক গতিশীলতা

- দাস অর্থনীতি ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাসত্ব — রোম, মিশর ও ভারতে দাস অর্থনীতি স্বরূপ। সমন্ত অর্থনীতি — পশ্চিম ইওরোপের ধ্রুপদি মডেল, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র , গুপ্ত সাম্রাজ্য ও দিল্লি সুলতানি। বাণিজ্যে ও নগরায়ণের সংকোচন ও প্রসারণ ইউরোপ ও ভারতের তুলনা।

Scanned with CamScanner

✍ সপ্তম অধ্যায় - ধর্ম

- ধর্ম ও রাষ্ট্র— অশোকের ধর্ম, আলাউদ্দিন খলজি — শরীয়ত ও উলেমা — আকবর দীন-ই-ইলাহী ও সুল-ই-কু। পশ্চিম ইউরোপ — পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং পোপ ক্রুসেড। আরব দুনিয়া — নিখিল খলিফাতন্ত্র। ধর্ম ও সমাজ — বৈদিক ধর্ম, ইওরোপে বহু দেবদেবী উপাসনা — নতুন ধর্মান্দোলন (বৌদ্ধ ও জৈন) — ইওরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন।

✍ অষ্টম অধ্যায় - দিগন্ত প্রসারণ

- আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব — অপরসায়ন থেকে রসায়ন, জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সৌরকেন্দ্রিক বিশ্ব; প্রযুক্তি, উন্নয়ন, কৃষি, সামরিক উৎপাদন প্রযুক্তি, জাহাজ নির্মাণ; পশ্চিম ইউরোপে মুদ্রণ বিপ্লব; ভৌগোলিক আবিষ্কার; নতুন পৃথিবীর অভিমুখ।

✍ নবম অধ্যায় - সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য

- এই অধ্যায়ে প্রকল্পমূলক কাজের জন্য নির্দিষ্ট। ইউরোপীয় প্রেক্ষিত — রেনেসাঁ, দ্বাদশ শতকের রেনেসাঁ, ইটালির রেনেসাঁ — জ্ঞান ও সাহিত্যে ভারতীয় প্রেক্ষিত, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়, দররারি সাহিত্য, সঙ্গম, সংস্কৃত ফারসি — আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য, চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদসাহিত্য। স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প : চিত্রশিল্প - গুহাচিত্র, ভীমবেটকা, অজন্তা — ভাস্কর্য - বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব — মধ্যযুগে ভারতের সমাধিক্ষেত্র।

★ **দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচি** (Syllabus of History at standard XII) :

◆ **প্রথম অধ্যায় : অতীত স্মরণ**

অতীত কল্পনা : পৌরাণিক কাহিনি, কিংবদন্তি, লোককথা, স্মৃতিকথা এবং মৌখিক ঐতিহ্য — পৌরাণিক কাহিনি— কিংবদন্তি— লোককথা— স্মৃতিকথা— মৌখিক ঐতিহ্য— অতীতের উত্তরাধিকার— ঔপনিবেশিক ইতিহাস নির্মাণ— দেশীয় ইতিহাসচর্চা— ইতিহাসের গুরুত্ব এবং 'আধুনিক' ইতিহাস লিখন পদ্ধতি— পেশাদারি শাখা হিসেবে ইতিহাসের গুরুত্ব— 'আধুনিক' ইতিহাস লিখন পদ্ধতি— অতীত সংগঠিত করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাদুঘর— জাদুঘরের বিকাশ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা ও জাদুঘরের প্রকারভেদ, ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

◆ **দ্বিতীয় অধ্যায় : উনবিংশ ও বিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার**

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা— ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা— উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে উপনিবেশ দখলে কাড়াকাড়ি— এশিয়া মহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসার— সপ্তদশ ও

অষ্টাদশ শতকে নতুন বিশ্বে ঔপনিবেশিকতাবাদ— সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক গতি— মার্কেন্টাইল মূলধন—শিল্প ও পুঁজিবাদী মূলধন— ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হবসন-লেনিন থিসিস— ঔপনিবেশিকতাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি— অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ভূখণ্ডের ওপর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা— ঔপনিবেশিক সমাজে জাতি-প্রশ্ন এবং এর প্রভাব— জাতিগত প্রশ্ন— জাতি-প্রশ্নের প্রভাব।

◆ **তৃতীয় অধ্যায় : উপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি : নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্য**

সমীক্ষা-১ : ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত— রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা— নিয়ন্ত্রণযন্ত্র বা শাসনযন্ত্র— ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অর্থনীতি— রেলযাত্রার সূচনা— বিলম্বিত এবং নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের বিকাশ— ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৌদ্ধিক বিচার— সমীক্ষা-২ : চিন - সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া চিনের অর্থনৈতিক বিকাশ— অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা— ভারত ও চিনের অভিজ্ঞতার একটি তুলনামূলক আলোচনা।

◆ **চতুর্থ অধ্যায় : সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া**

মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব এবং সমাজসংস্কার আন্দোলন— মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব— প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি : সমাজসংস্কার আন্দোলন— সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে সমাজে পরিবর্তন ও রূপান্তর— গ্রামীণ এলিট সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ— পতিদার— সাউকার— অর্থ লগ্নিকারী ও মধ্যস্বত্বভোগী— অর্থনৈতিক কারণে গ্রামীণ শ্রেণির ভাঙন— শিল্পে শ্রমশক্তির আত্মপ্রকাশ— নিম্নবর্গ : আদিবাসী ও দলিত— আদিবাসী সম্প্রদায়— দলিত সম্প্রদায়— পাশ্চাত্য ভাবধারা এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়া— মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা— আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া : বাংলায় নবজাগরণ— 'সময়', 'স্বাস্থ্য' এবং 'মজুরির জন্য শ্রম' সম্পর্কে পশ্চিমী ধারণার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ ও [illegible]ীয় মানসিকতায় পরিবর্তন— চিনে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব— [illegible]নে পাশ্চাত্য শিক্ষা—পণ্ডিতশ্রেণির প্রতিক্রিয়া— ৪ মে-র আন্দোলন— ভারত ও চিনের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির অভিপ্রয়াণ— বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিক— বিদেশে নিযুক্ত চিনা শ্রমিক— বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ও চিনা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অবস্থা।

◆ **পঞ্চম অধ্যায় : উপনিবেশিক ভারতের শাসন**

ভারত শাসন আইন— মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার, ১৯০৯ খ্রি.— মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার, ১৯১৯ খ্রি.— ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ খ্রি.— সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা— মন্দিরে প্রবেশ সংক্রান্ত ঘটনা— দেশীয় রাজা ও ব্রিটিশ সরকার—

Scanned with CamScanner

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি— স্বত্ববিলোপ নীতি— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক— যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ও দেশীয় রাজ্যসমূহ— ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থনৈতিক নীতি— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সীমিত শিল্পায়ন— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ— দুর্ভিক্ষের সময় উচ্চহারে কর আদায়— বাংলার মন্বন্তর।

◆ **ষষ্ঠ অধ্যায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উপনিবেশসমূহ**

ভারত (১৯৪০-৪৬ খ্রি.)— লিনলিথগো প্রস্তাব বা আগস্ট প্রস্তাব— ক্রিপস মিশন— ভারত ছাড়ো বা আগস্ট আন্দোলন— সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ— নৌবিদ্রোহ, ১৯৪৬ খ্রি.— ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি : ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা— মন্ত্রী মিশন— গণপরিষদ— মাউন্টব্যাটেনের আলোচনা : মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা— ক্ষমতা হস্তান্তর : ভারতীয় প্রতিক্রিয়া— জাপান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ— 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া'— জাপান ও চিন— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রসরতা— জাপানের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের যোগসূত্র— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় উপনিবেশের পরিবর্তিত অবস্থা—ইন্দোচিন— ইন্দোনেশিয়া।

◆ **সপ্তম অধ্যায় : ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগ**

ঠান্ডা লড়াই— ঠান্ডা লড়াই : তাত্ত্বিক ভিত্তি— ঠান্ডা লড়াইয়ের সূচনার প্রেক্ষাপট— ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঠান্ডা লড়াইয়ের অগ্রগতি— ট্রুম্যান নীতি— মার্শাল পরিকল্পনা— সামরিক জোট— ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাব— বার্লিন সংকট— রাশিয়ার অধীনে পূর্ব ইউরোপ— সুয়েজ সংকট— কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সংকট— কোরীয় সংকট— ভিয়েতনাম সংকট— পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং শান্তি প্রক্রিয়া— পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা— শান্তি প্রক্রিয়া— জোটনিরপেক্ষ নীতি— জোটনিরপেক্ষ নীতি, ভূমিকা— জোটনিরপেক্ষ নীতির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট— জোটনিরপেক্ষতার নীতিসমূহ— জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন— আরব দুনিয়া : ইজরায়েল বনাম আরব দুনিয়া-তেলসম্পদ নিয়ে কূটনীতি— ইজরায়েল বনাম আরব দুনিয়া— তেল কূটনীতি— গণপ্রজাতন্ত্রী চিন : উত্থান এবং বিশ্বরাজনীতিতে অবস্থান— গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের উত্থান— বিশ্বরাজনীতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের স্থান।

◆ **অষ্টম অধ্যায় : অব-উপনিবেশীকরণ**

অব-উপনিবেশীকরণের ধারণা ও অগ্রগতি— অব-উপনিবেশীকরণ— অব-উপনিবেশীকরণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য— অব-উপনিবেশীকরণের প্রকাশ— বিকাশ কর্মসূচি এবং জাতি সংগঠন— আফ্রিকা : সমীক্ষা-আলজেরিয়া— আলজেরিয়ায় ঔপনিবেশিক শোষণ— আন্দোলনের প্রসার ও

স্বাধীনতা লাভ— আলজেরিয়ার বিকাশ কর্মসূচি এবং জাতি সংগঠন— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া : সমীক্ষা-ইন্দোনেশিয়া—ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ— আন্দোলনের প্রসার ও স্বাধীনতা লাভ— ইন্দোনেশিয়ার বিকাশ কর্মসূচি ও জাতি সংগঠন— দক্ষিণ এশিয়ায় জাতি সংগঠন— দক্ষিণ এশিয়ায় তুলনামূলক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা— ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠন— আঞ্চলিক সহযোগিতা-সার্ক।

★ নব প্রবর্তিত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাস পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা :

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ প্রবর্তিত ইতিহাসের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। পাঠক্রমে যেমন নতুন বিষয় স্থান পেয়েছে তেমনি পাঠ্যক্রমের বিন্যাসটিও হয়েছে নতুন ধরনের। এই পাঠ্যক্রমের ইতিবাচক (Merit) ও নেতিবাচক দিকগুলি নীচে উল্লেখ করা হল—

● **ইতিবাচক দিক** (Merit) :

➤ নতুন পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বিশ্ব সভ্যতার বিবর্তনের সামগ্রিক রূপ পাঠক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

➤ এই পাঠক্রমে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত ও সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করার সুযোগ পাবে।

➤ এই পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিক অভিনব। বিশেষকরে এই পাঠক্রমে তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তুলনামূলকভাবে দুটি করে সাম্রাজ্য পাশাপাশি রেখে সাম্রাজ্যের চরিত্র বা প্রকৃতিগত তুলনা করা হয়েছে। সমজাতীয় সমকালীন বিষয়ের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও রূপান্তরের পথে সভ্যতা এগিয়ে চলার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে।

➤ ইতিহাস হল মানবজাতি তথা মানব সংস্কৃতির উদ্ভব ও ক্রম বিবর্তনের কাহিনী। দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আদিম মানব থেকে আধুনিক মানুষের সৃষ্টির কাহিনী এই পাঠ্যসূচির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আদিম শিকারী মানুষ কীভাবে বুদ্ধির ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে নাগরিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

➤ সভ্যতার ক্রম বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হল একটি দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা উৎপাদন ব্যবস্থা। সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর ও সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ দাস ব্যবস্থা। সামন্ত সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

- এই নতুন পাঠ্যসূচিতে একদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানা অভিমুখ তুলে ধরা হয়েছে এবং তারই পাশাপাশি নানা দেশের মানুষ কীভাবে নিজ নিজ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চায় তার অর্থবহ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
- ইতিহাস হল তথ্য নির্ভর। বিভিন্ন উৎস (লিখিত ও অলিখিত উপাদান) বা সূত্র থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। ইতিহাসের সূত্র বা উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সতর্কতা ও যুক্তিবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এই পাঠ্যসূচিতে সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

• **নেতিবাচক দিক** (Demerit) :

বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠক্রমের নেতিবাচক দিকগুলি উল্লেখ করা হল—

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠক্রমের মধ্যে সংগতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যমিকের তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠক্রম যথেষ্ট কঠিন ও অতিরিক্ত বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত।
- সমগ্র পাঠক্রমের মধ্যে কেন্দ্রীয় ঐক্য বা সুসংবদ্ধতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়বস্তুর বিন্যাসের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতা বা বিক্ষিপ্ত ভাব বর্তমান। বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা লক্ষ করা যায়।
- দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রমে আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস উপেক্ষিত থেকে গেছে। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬), আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, জার্মানি ও ইতালির ঐক্য আন্দোলন (১৮৭০) প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি যা ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল ও সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিশ্ব ইতিহাসের এই ঘটনাগুলি মানুষের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, শোষণ, অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো মূল্যবোধ সম্পর্কে ও মানবাধিকার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ এগুলি সম্পর্কে পাঠক্রমে কোনো আলোচনা নেই।
- ইতিহাসচর্চার ইতিহাস (Historiographs)ও ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিভঙ্গি একাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে এটি আরও বিশদে রয়েছে। নতুন হলেও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি উপযুক্ত নয়। এই স্তরের জন্য এটি বেশ কঠিন। এই বিষয়টি স্নাতক (অনার্স) স্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়।
- সামগ্রিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম (ইতিহাসের) বেশ কঠিন।

১.৩ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter relationship of various branches of Social Science) :

ভূমিকা : বর্তমানে জ্ঞানের কোনো শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আর এই পারস্পরিক সংযোগের ফলে জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাই পরিপুষ্ট হয়। জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসেবে ইতিহাস ও অন্যান্য জ্ঞানের শাখাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে এটা সুস্পষ্ট যে জটিল সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পৃথকভাবে আলোচনার দ্বারা সমাজ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করা যাবে না। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—২০০৫-এ বলা হয় যে সমাজ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলার জন্য সমাজ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বস্তুতপক্ষে ইতিহাস হল সমাজ বিজ্ঞানের অংশ বিশেষ যা সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের সার্বিক (Total) প্রগতির কাহিনি বিবৃত করে। স্বাভাবিকভাবে ইতিহাসের সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। **Raymont**-এর মতে, "No subject is ever well understood and no art is intelligently practiced if the light which the others studies are able to throw upon in is deliberately shut out."

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে ইতিহাস একক এবং বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। বর্তমান শিক্ষাজগতের প্রতিটি বিষয়, যেমন—সাহিত্য বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা তত্ত্ব, অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তি বিদ্যা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি আরও নানা বিষয় ইতিহাসের অন্তর্গত। ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোনো বিষয়ই ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। সমস্ত শিক্ষামূলক বিষয়ই জন্মলগ্ন থেকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। পাঠ্য সকল বিষয়েরই জননী স্বরূপা হচ্ছে ইতিহাস।

১.৩.১ ইতিহাস ও ভূগোল (History and Geography) :

ভূমিকা : ইতিহাস ও ভূগোল হল সমাজ বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং এদের সম্পর্ক অতিনিবিড়। প্রাবন্ধিক **প্রমথ চৌধুরীর** মতে, ইতিহাসের ছবি আঁকতে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনো একটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ করতে পারলে সে কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিয়োগ্রাফি নেই। অনন্তকালেরও হিস্ট্রি নেই। "The historical record is inextricaly linked to the geographic setting in which it developed" (National Standard for History)। বস্তুতপক্ষে ভূগোলের পটভূমিতে ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা যথার্থ। ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষ করে সামরিক ও কূটনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য কাল চেতনার পাশাপাশি স্থান চেতনা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের

Scanned with CamScanner

জনক **হেরোডোটাস** সর্ব প্রথম ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের নিবিড় সংযোগের কথা জো
দিয়ে বলেন। বিখ্যাত ফরাসি ঐতিহাসিক **মিশেলের** মতে, ইতিহাসের বিশ্লেষণ মুখ্য
ভৌগোলিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে ভৌগোলিক ভিত্তি ছাড়া ইতিহাসের মানুষে
ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা নিরর্থক। এতে বাস্তবতার কোনো স্পর্শ থাকে না। সুতরাং সময় নিরপেক্ষ
ইতিহাস যেমন সম্ভব নয়, স্থান নিরপেক্ষ ইতিহাসও তেমনি অসম্ভব।

ভূগোল ও ইতিহাসের সম্পর্ক : কোনোদেশের ইতিহাসের উপর সেই দেশের ভৌগোলিক
পরিবেশের প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। সব ইতিহাসেরই আছে দুটি চোখ কাল ও স্থান (Time
and Space) বা ভূগোল। অর্থাৎ ইতিহাসের দুটি চোখের একটি হল ভূগোল। তাই ঐতিহাসিক
রিচার্ড হাকলিয়ৎ মন্তব্য করেন—"Gegography and Chronology are ..., the right
eye and the left eye of all history." প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশ বা জাতির চরিত্র তার
ইতিহাস নির্ভর করে ওই দেশের জলহাওয়া আর ভৌগোলিক পরিবেশের উপর। পৃথিবীর
বিভিন্ন দেশের কিংবা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাসের মূলগত পার্থক্যের জন্য দায়ী
ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর এটা সব দেশে, সবজাতির ইতিহাসের
ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য। ইতিহাস ও ভূগোলের সম্পর্ক নির্ধারণে দার্শনিক **ইমানুয়েল
কান্টের** বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, "The description according to
time is history, that according to space in geography... History differs
from geography only in consideration of time and area. The former is a
report of phenomena which follow are another and has reference to time.
The taller is a report of phenomen a beside each other in space. History
is narrative, geography is descriptive. Geography and history fillup the
entire circumference of our perceptions, geogrophy that of space, history
that time." অর্থাৎ মানব সভ্যতার কালানুক্রমিক বিবরণ হল ইতিহাস, স্থানানুক্রমিক বর্ণনা
হল ভূগোল। কাল ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস ও ভূগোলের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
প্রথমটি হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও অবস্থার কাহিনি এবং কালক্রমের সঙ্গে এ বিবরণ সংযুক্ত।
পরবর্তীটি একই বিষয়ের স্থানভিত্তিক বিবরণ। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস হল কাহিনি প্রধান
(Narrative, আর ভূগোল হল বর্ণনামূলক (Descriptive)। ভূগোল ও ইতিহাস স্থান ও
কাল নির্দেশ করে আমাদের উপলব্ধিকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তিনি (Immanuel Kant)
আরও বলেন যে ইতিহাস মানুষের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। আলোচ্য
দুটি বিষয়ের একটি সাধারণ ক্ষেত্র বিদ্যমান। কোনো জাতি বা দেশের ইতিহাস স্থান
নিরপেক্ষ হতে পারে না। তেমনি সময় নিরপেক্ষভাবে কোনো ভৌগোলিক বিবরণ পরিবেশন
করা যায় না। সুতরাং ইতিহাস ও ভূগোল মানুষ ও প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাল ও স্থান
সাপেক্ষ বিবরণ মাত্র।

ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব : যে-কোনো দেশ বা জাতির জাতীয় ইতিহাস
রচনায় ভূগোল বা ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য। কোনো দেশের ভৌগোলিক
অবস্থান সেই দেশের জাতীয় ইতিহাস ও দেশবাসীর জাতীয় চরিত্র গঠনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব
ফেলে। পর্বত, নদী, মালভূমি, সাগর বা মহাসাগর, দ্বীপ, মরুভূমি, প্রাকৃতিক ও খনিজ
সম্পদ, জলবায়ু প্রভৃতি ভৌগোলিক উপাদান মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম বিকাশে গভীর
প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসি পণ্ডিত **বোডিন** (Bodin)-এর মতে, "মানুষের জাতীয় চরিত্র
গঠনে কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী"। **কে. এস. পানিক্করের** (K. S.
Panikkar)-এর মতে, ভৌগোলিক পরিবেশ যে-কোনো সমাজ বা সভ্যতাকে বিশিষ্টতা বা
স্বাতন্ত্র্যতা দান করে। ভারতীয় ইতিহাসে উত্তর পর্বতমালার প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন—"It
is not only the political life of the people of Hindustan, but the religion,
mythology, art and literature of the Hindus that bear the imprint of the
great mountain barrier." (K. M. Panikkar, 1959)। আসলে কোনো বিশেষ মানব
গোষ্ঠী। বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে বসেই ইতিহাস সৃষ্টি করে। আর এই মানব গোষ্ঠীর
জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব জীবনযাত্রা, ক্রিয়াকলাপ, মানসিকতা ও শ্রমনস্কতায়
বিশেষত্ব এনে দেয়। তাই কোনো দেশের ইতিহাসকে সুষ্ঠুরূপে জানতে হলে ওই দেশে
ভৌগোলিক পটভূমি সম্পর্কে প্রথমেই পরিচিত থাকা দরকার।

ভূগোল ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত ও ইতিহাসের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।
পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাসই বিভিন্ন ভৌগোলিক কারণ বা ভৌগোলিক উপাদান
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ পৃথিবীতে বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন যার মূলে রয়েছে ভৌগোলিক
উপাদানের প্রভাব। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম হল মিশরের নীলনদের সভ্যতা।
ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে ওঠা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, ইয়াং
সিকিয়াং নদীর তীরে গড়ে ওঠা চিনা সভ্যতা, ভারতবর্ষে সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠা সিন্ধু
সভ্যতা ইত্যাদি এই নদীমাতৃক সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল কোনো না কোনো নদীকে কেন্দ্র
করে। অনুরূপভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে মগধের উত্থান ঘটেছিল মূলত ভৌগোলিক কারণজনিত
অনুকূল পরিবেশের জন্য। দ্বীপময় অবস্থানের জন্য ব্রিটেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে
শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে পেরেছিল। যা তাকে ঔপনিবেশ দখলের লড়াই অভাবনীয়
সাফল্য এনে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের পৃথিবীব্যাপী সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ
দখলের লড়াইয়ে অভাবনীয় সাফল্যের মূলে ছিল তার ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব।
বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থার অনুকূল জলবায়ু, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য
ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল।

পর্বতসংকুল পরিবেশের জন্য প্রাচীন গ্রিসে প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং গ্রিস
দেশ সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় তার অধিবাসীরা সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারে তৎপর হয়।

Scanned with CamScanner

অনেক সময় দেখা যায় যে ভূগোলের জ্ঞান ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। সুদীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেও ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি। এর মূলে ছিল দাক্ষিণাত্যের পর্বতময় মালভূমির ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু। সাম্রাজ্যের উত্থানের ন্যায় পতনকে ও ভৌগোলিক উপাদান প্রভাবিত করে। রাশিয়ায় মস্কো অভিযান এবং সেখানে নেপোলিয়নের শোচনীয় পরাজয় তাঁর পতনের অন্যতম কারণ। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের মূল কারণ জারের সৈন্যদল নয়, সেখানকার অত্যাধিক শীতের প্রকোপ ফরাসি সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত করেছিল।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ক্রমবিকাশে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অপরিসীম। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে ভারতকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল। মধ্য ভারতের মালভূমি ও সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিমালয়ের অবদান অপরিসীম। হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে বর্হিজগৎকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের সভ্যতা সংস্কৃতিতে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল করে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে, হিমালয় ভারতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। হিমালয় ভারতকে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহ থেকে রক্ষা করেছে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয়ের বুকে ঠান্ডা খোয়াই ভারতকে "সুজলা-সুফলা-জলয়জশীতলা" করে তুলেছে। হিমালয়ের গিরিপথগুলি বর্হিবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। আর্য, শক, হুন, পাঠান, মোঘল প্রভৃতি জাতি খাইবার, বোলান, গোসাল গিরিপথগুলি দিয়েই ভারতে প্রবেশ করেছে। আবার এই পথ ধরেই ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং ভারতের সঙ্গে এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ভারতবাসীর ধর্মীয় জীবনেও হিমালয়ের অবদান প্রচুর। তাই ঐতিহাসিক **পানিক্কর** মন্তব্য করেছেন—"There are no mountain range any where in the world which have contributed so much to shape the life of a country as the Himalaya have in respect of Indian." (K. M. Panikkar, 1959)।

হিমালয়ের ন্যায় বিন্ধ পর্বতের প্রভাব ভারতীয় ইতিহাসে অপরীসীম। ভারতের মধ্যভাগে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত বিন্ধ পর্বতমালা ভারতকে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য নামে দুই ভাগে ভাগ করেছে। প্রাচীনকালে দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সুগম না হওয়ায় দাক্ষিণাত্যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই প্রাকৃতিক বাধার জন্য উত্তরে আর্যসভ্যতা ও দক্ষিণে দ্রাবিড় সভ্যতা নিজস্ব ধারায় বিকশিত হয়। কালক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হলেও উভয় অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা আজও বর্তমান। বিন্ধ পর্বতের জন্য উত্তরের সাম্রাজ্যগুলি দক্ষিণ ভারতে স্থায়ীভাবে রাজ্য বিস্তার করতে পারেনি।

ebook.dascoaching.in

ভারতীয় ইতিহাসে নদনদীর প্রভাব অপরিসীম। মিশরের নীলনদ বা মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মতো ভারতের সিন্ধু, গঙ্গা, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী প্রভৃতি নদী এদেশের সভ্যতা, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর প্রভাব রেখেছে। সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠেছে হরপ্পাসংস্কৃতি, শতদ্রু, বিপাশা ও গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে আর্য সভ্যতা। দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গাভদ্রা, কৃষ্ণা, কাবেরী ও গোদাবরীর উপত্যকা জুড়ে দ্রাবিড় সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের নদীগুলিই ছিল বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। নদী তীরেই গড়ে উঠেছিল হরিদ্বার, পাটলিপুত্র, প্রয়াগ, কনৌজ, এলাহাবাদ, হস্তিনাপুর, বারাণসী, দিল্লি, আগ্রা, মথুরা, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম-এর ন্যায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি। ভারতের নদনদী ভারতকে একটি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল দেশে পরিণত করেছে। আর ভারতের এই প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে বিদেশিরা বারবার হানা দিয়েছে ভারতবর্ষে। সম্পদের প্রাচুর্য যেমন সমৃদ্ধি দিয়েছে তেমনি অনুকূল পরিবেশও দীর্ঘকালীন অবসরে ভারতকে জ্ঞানবিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে ও দর্শনের লীলাভূমিতে পরিণত করেছে।

ভারতীয় সভ্যতার উপর সমুদ্রের গভীর প্রভাব বর্তমান। ভারতবর্ষের তিন দিক সমুদ্র বেষ্টিত থাকায় একদিকে জলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা কমেছে। অন্যদিকে সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবাসীর পক্ষে সিংহল, চিন, কম্বোজ, সুমাত্রা, জাভা, বর্নিও প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার এই জলপথেই পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসি ও ইংরেজরা ভারতে এসে ঔপনিবেশ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছে। এছাড়া সমুদ্র সান্নিধ্যের ফলে ভারতবর্ষ (চোল) নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল।

ভূগোলের উপরই ইতিহাসের প্রভাব: ইতিহাসের বর্ণনা ও নানা ঘটনা থেকে ভূতত্ত্ববিদরা সংশ্লিষ্ট দেশ ও এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা যেমন জানতে পারেন তেমনি তা নিয়ে তাদের চিন্তাধারা পুনর্গঠনের সুযোগ পান। তাই ইতিহাস ও ভূগোল পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিহাস হল মানব সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনের কাহিনি। আর এই সমাজ সভ্যতার বিকাশ ঘটে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে। ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের (স্থান ও কাল) একটি হল স্থান (Space)। কাজেই স্থান বা ভৌগোলিক পরিবেশ বা ভূগোলের সহচর্য ছাড়া ইতিহাস সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই ইতিহাস পাঠদানকালে বারে বারে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে ভূগোলের প্রসঙ্গ চলে আসে। এ প্রসঙ্গে Bradley commission on History in School-এর মতে "Geography is by nature the constant Companion of historical studies, it is hardly possible to grasp the one without the Other". সুতরাং ইতিহাস ও ভূগোল একে অপরের পরিপূরক, উভয়ে উভয়ের কাছে ঋণী। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ ও অচল।

Scanned with CamScanner

❑ ১.৩.২ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (History and Political Science) :

ভূমিকা : ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। এই দুটি বিষয় হল সমাজ বিজ্ঞানের দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী শাখা। উভয় শাস্ত্রই মানবজীবন এবং তার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রচেতনারও বিবর্তন ঘটেছে। আবার রাষ্ট্র চেতনার বিবর্তন ইতিহাসের গতিকেও প্রভাবিত করেছে। তাই এ প্রসঙ্গে **জন সিলি** (John Seeley) মন্তব্য করেছেন— "History without political science has no fruit, political science without History has no root." অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাস নিষ্ফল, ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্র বিজ্ঞান ভিত্তিহীন। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। কারণ রাষ্ট্রীয় জীবন ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করে এবং নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং মানব সমাজের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনাকে বাদ দিয়ে কোনো দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না।

◆ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস দুটি স্বতন্ত্র্য বিষয় হলেও উভয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কারণ ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাই **Freeman** (ফ্রিম্যান) বলেছেন যে, ইতিহাস হল অতীতের রাজনীতি, আর রাজনীতি হল বর্তমানের ইতিহাস (History is past politics, politics is present History)। তেমনি আবার **Garner** (গার্নার) বলেছেন—"সঠিকভাবে ইতিহাস আলোচনা করতে হলে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা দরকার। আর সঠিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করতে হলে ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় আলোচনা করা বিধেয়। সুতরাং রাষ্ট্রনীতির প্রভাব ছাড়া ইতিহাস নিরস। তাই ইতিহাস রাজনীতির এবং রাজনীতি ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

◆ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর ইতিহাসের প্রভাব :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমানের একটি সুন্দর কল্যাণকর ও সুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। একাজ করতে গিয়ে তাকে প্রায়শই ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়।

(1) ইতিহাস হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাণ্ডার বা গুদামঘর। ইতিহাস থেকেই তথ্য, উপাত্ত নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ধনী হয়। ইতিহাসের উপাদানগুলির সাহায্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনৈতিক ঘটনা বা অবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ করে। তাই ফ্রিম্যান বলেন—"ইতিহাস হল অতীত রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি হল বর্তমান ইতিহাস।"

(2) অতীতদিনের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ঠিকমতো ধারণা থাকলে বর্তমানের রাজনৈতিক মতবাদ কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব হয়ে যেতে বাধ্য। কেননা ইতিহাসের তথ্যাশ্রয়ী ঘটনাগুলিই বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শগুলিকে পরীক্ষিত সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে বাস্তবসম্মত, বিশ্বাসযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলে।

(3) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র ও সরকারের বিবর্তনের কথা জানতেও ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রের স্বরূপ, সরকারের প্রকৃতি, প্রাচীন শাসকদের রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ইতিহাসই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দিতে পারবে।

(4) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, গণতান্ত্রিক মতবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক তত্ত্ব ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(5) ইতিহাসই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র ঘটাতে, তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে সঠিক বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যবহৃত তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি ইতিহাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের বহু মহান মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাদের আদর্শ, চরিত্র, কার্যাবলি, সেবামূলক মনোভাব, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ (নেতাজি, গান্ধিজি, শিবাজি, রণাপ্রতাপ) ভাবী কালের নেতা-নেতৃদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে।

◆ ইতিহাসের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাব :

ইতিহাস যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানও ইতিহাসের আলোচনাকে পরিপূর্ণতা দান করে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত ইতিহাসের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইতিহাস নানাভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে ঋণী।

(1) রাজনৈতিক সমস্যাদি ও আন্দোলনগুলি যদি ইতিহাস কর্তৃক যথাযথভাবে বিবেচিত বা অনুধাবিত না হয়, তাহলে ইতিহাস চর্চা নিরর্থক হয়ে পড়বে। যেমন— ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ এই দুটি রাষ্ট্রতত্ত্বকে সঠিকভবে না জানলে মুসোলিনি ও হিটলারের প্রকৃত রাজত্বকালের প্রকৃত ইতিহাস রচনা কঠিন হয়ে পড়ে।

(2) বর্তমানে ইতিহাস চর্চার গতিপথ বহুলাংশে রাষ্ট্রনীতির দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। তাই ইতিহাসের অনুশীলন রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর হতে দেখা যায়। এর ফলে কোনো একটি দেশের ইতিহাস চিন্তা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

(3) আধুনিক ইতিহাস চর্চায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ-পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনেকক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। আধুনিককালে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির গবেষণার অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে ঐতিহাসিকগণও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতোই সমাজের বিশেষ শ্রেণি বা ঘটনাকে প্রধান্য দিচ্ছেন। এখানেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো নির্বাচন, পছন্দ প্রভৃতির প্রাধান্য বাড়ছে।

Scanned with CamScanner

(4) ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো উদ্দেশ্যমুখী। ইতিহাসেরও উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজজীবন প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্যেই ইতিহাসে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাসমূহ স্থান পায়। বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতনের আলোচনা হয়ে ওঠে ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু।

১.৩.৩ অর্থনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক (Relation between Economics and History) :

ইতিহাস ও অর্থনীতি সমাজ বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রম বিবর্তনের কাহিনি হল ইতিহাস। অর্থনীতি হল সমাজ বিজ্ঞান যা "Nature and patterns of economic activity at various stages of economic development" নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনৈতিক ইতিহাস হল ইতিহাস ও অর্থনীতির আলোচনার সাধারণ ক্ষেত্র (Common Domain)। **অধ্যাপক রবিনস্** (Prof. Robbins) এর মতে, "Economic is concerned with the form and economic history with the substance"। জার্মান ঐতিহাসিক গোষ্ঠী (German Historical school) ও কার্লমার্কস ইতিহাস ও অর্থনীতির সম্পর্ককে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থনীতিবিদ Schumpter অর্থনীতি ও ইতিহাসের বিশেষ করে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। **Sombort**-এর মতে, "No theory-no history." অর্থাৎ 'History by economic theory; and economic theory by history. সুতরাং ইতিহাস ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কোনো দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক তথ্য, তত্ত্ব ও সূত্র আলোচনার সময় সেই দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি যেমন জানা দরকার, সেই রকম মানব সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তথা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

◆ **ইতিহাসের উপর অর্থনীতির প্রভাব** (Impact of Economics on History) :

অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক অবস্থা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। কার্লমার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেন। **মার্কস ও এঙ্গেলস**-এর মতে (1848), "History of all human societies, past and present, has been the history of class struggle." অর্থাৎ মানব সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস এবং এর মূল নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে। মানব সমাজ-এর জন্ম তথা মানব ইতিহাসের মূল নিয়ন্ত্রক হল অর্থনীতি। ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি হল অর্থনীতি। তাই মানব সমাজকে বুঝতে হলে, মানব সমাজের ইতিহাসকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।

⇒ বহু ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে যার সঙ্গে অর্থনৈতিক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইংলান্ডের শিল্প বিপ্লব, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, মন্বন্তরের উত্থান, পলাশীর যুদ্ধ, ১৯৩০-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, সন্ন্যাসী ফকিরের হাঙ্গামা, বর্গী আক্রমণ ইত্যাদি। এই ঘটনাগুলির মূল কারণ হল অর্থনীতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বহু বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেছিল যার মূল কারণ হল অর্থনৈতিক। এই ঘটনাগুলির যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য অর্থনীতির জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য।

⇒ ইতিহাস হল মানুষের কথাকাহিনি। সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের ক্রম বিবর্তনের কাহিনি হল ইতিহাস। অর্থাৎ ইতিহাসের একটি অপরিহার্য অংশ হল অর্থনীতি। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা ব্যতীত ইতিহাস অসম্পূর্ণ। আর অতীত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার কাজে ঐতিহাসিককে সাহায্য করেন অর্থনীতিবিদ। সুতরাং ইতিহাস অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল।

⇒ ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হল অর্থনৈতিক ইতিহাস। অর্থনৈতিক ইতিহাস অতীতের বিভিন্ন প্রজন্মে (From generation to generation), বিভিন্ন যুগে (From Epoch to Epoch), বিভিন্ন দেশে (From country to country) অর্থনৈতিক জীবনযাপন কীভাবে সংগঠিত হত তা আলোচনা করে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য অর্থনীতির জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। অতীত মানুষ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত? কীভাবে বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে? উপনিবেশ কীভাবে গড়ে ওঠে? প্রধান প্রধান কৃষিজ পণ্য কী ছিল? প্রকৃতি বিষয় অর্থনীতিতে আলোচিত হয়।

⇒ যে-কোনো দেশের জাতীয় ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে অর্থনৈতিক অবস্থা, অর্থনীতি ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো দেশ নির্দিষ্ট কোনো যুগে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করে, তার মূলে কাজ করে সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা (যেমন গুপ্ত যুগ, আকবরের সমরকাল ইত্যাদি)। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করে তুলেছে সমাজ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতিকে। সুতরাং ইতিহাসে অর্থনৈতিক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

◆ **Impact of History on Economics :**

ইতিহাস অর্থনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অর্থনীতিবিদ Schumpter-এর মতে, "history", "statistics", and "theory" go to make economic analysis. তিনি আরও বলেন : "of these fundamental fields, economic history is by for the most important." সুতরাং অর্থনীতিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে ইতিহাস বিশেষত অর্থনৈতিক ইতিহাস ভালো করে জানা দরকার।

Scanned with CamScanner

⇒ ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হল অর্থনৈতিক ইতিহাস। অর্থনৈতিক ইতিহাসের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অতীতের সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। অর্থনীতির বিভিন্ন দিক যথা উৎপাদন ব্যবস্থা (কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য), মানুষের জীবিকা, বাজার ব্যবস্থা, ভূমি রাজস্ব বা কর ব্যবস্থা, বিনিময় মাধ্যম বা মুদ্রা ব্যবস্থা। গিল্ড ব্যবস্থা, সম্পদের ভোগ বণ্টন প্রভৃতি সম্পর্কে অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায়। এছাড়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা ইতিহাস পাঠ করে জানা যায়।

⇒ ইতিহাস বর্তমানকে বুঝতে ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে, ইতিহাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্থকভাবে সংগঠন করা যায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করার সময় কোন্ ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কী ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী তা জানতে হলে ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া বর্তমানের অর্থনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করা হয় অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে। বর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কতটা অগ্রগতি ঘটেছে তা জানা যায় অতীতের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে। বর্তমানের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে যথার্থভাবে বোঝার জন্য ইতিহাসের সাহায্য প্রয়োজন।

⇒ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল ইতিহাস। অর্থনীতির অনেক তাৎপর্যপূর্ণ নীতির মূল উৎস হল ইতিহাস। এই সমস্ত নীতি (principles) উদ্ভবের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটটি সঠিকভাবে না জানলে ঐ সমস্ত অর্থনৈতিক নীতির গুরুত্ব নির্ণয় করা যায় না। এর জন্য অর্থনীতিবিদকে ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়।

⇒ অর্থনীতির মূল কাজ হল মানব সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 'Nature and patterns' নিয়ে আলোচনা করা। মানব সমাজের বিভিন্ন বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিকাশের (Various stages of economic development) ধারা পর্যালোচনা বা অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন— তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ (Tool of comparative Methods). আর এর জন্য অর্থনীতিকে ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়।

⇒ অর্থনীতি মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। যেমন সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি সঠিকভবে বোঝার জন্য এগুলিকে অর্থনৈতিক বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে (Economic Historical Context) আলোচনা করা প্রয়োজন।

⇒ ইতিহাস অর্থনৈতিক তত্ত্বের সত্যতা যাচাই, সংশোধন ও প্রত্যাক্ষাণের (Verification Modification and Rajection) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া

কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Theory) শূন্যে গড়ে ওঠে না। এর উপর সমসাময়িককালের ঘটনাবলির প্রভাব পড়ে। একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব শূন্যের বর্তমানকে নিয়ে গড়ে ওঠেনা। এটা অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে সমানভাবে আগ্রহী।

⇒ অর্থনৈতিক তত্ত্বের (Economic Theory) প্রধান কাজ হল সমসাময়িক কালের অর্থনৈতিক ঘটনাবলির (Contemporary Economic Phenomena) ব্যাখ্যা দান ও সমাধানসূত্র আবিষ্কার। তাই অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় ইতিহাস দ্বারা নির্বাচিত সমস্যার প্রকৃতির উপর। ঐতিহাসিক কী ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করে দিচ্ছেন—তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক তত্ত্ব ঐ সমস্যার ব্যাখ্যা দিচ্ছে ও সমাধানসূত্র প্রদান করছে।

◆ **উপসংহার :** উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে ইতিহাস ও অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বর্তমান। কোনো দেশের অর্থনৈতিক আলোচনার তত্ত্ব ও নীতি আলোচনার সময় সেই দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি যেমন জানা দরকার, সেই রকম ইতিহাসের বহু ঘটনা বিশেষ করে অর্থনৈতিক ইতিহাসের বহু বিষয় আছে সেগুলির যথাযথ আলোচনা বা বিশ্লেষণের জন্য দেশের অর্থনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের শিক্ষকের যেমন অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তেমনি অর্থনীতির শিক্ষকেরও অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির চর্চা অসম্পূর্ণ। বস্তুত অর্থনৈতিক তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ যখন ইতিহাসের পটভূমিতে হয়, তখনই তা হবে বিজ্ঞানসম্মত। আর ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা যখন অর্থনৈতিক পটভূমিতে হবে তখনই তা হবে বাস্তবসম্মত। তাই বলা যায়—"Economics without history has no root, History without economics has no fruit" সুতরাং ইতিহাস ও অর্থনীতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও অর্থনীতি এই বিষয় দুটি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই আজ অর্থনীতির বহু বিষয় ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অনুরূপভাবে ইতিহাসের অনেক কিছু অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ ১.৩.৪ ইতিহাস ও সাহিত্য (History and Literature) :

ভূমিকা : ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ধারণের বিষয়টি বেশ জটিল। উনিশ শতকের পূর্বে ইতিহাস ছিল সাহিত্য আশ্রিত। ইতিহাসকে সাহিত্যের একটি শাখা রূপে বিবেচনা করা হত। সেই সময় ইতিহাসের পঠনপাঠন, আলোচনা এবং বিশ্লেষণ পৃথক বিষয় রূপে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ইতিহাসকে তখন সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে ভলতেয়ার, গিবন

Scanned with CamScanner

এবং রবিনসনের রচনাতে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উনবিংশ শতকে র‍্যাঙ্কের আম
থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে (As a separate Discipline) ইতিহাস আত্মপ্রকাশ করে এ
ইতিহাস চর্চার একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে শুরু করে। বস্তুত র‍্যাঙ্কে সর্বপ্রথম দেখ
যে ইতিহাস তথ্যনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্কতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) হল ইতিহাসে
প্রাণ। তথ্য ছাড়া ইতিহাসের কোনো গুরুত্ব নেই। ইতিহাস রচনার কাজে ভাষা ও রচনাশৈ
তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে সাহিত্যগুণবর্জিত নয়। আজও ভা
রচনাশৈলী এবং উপস্থাপনার উৎকর্ষতা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

◆ **ইতিহাসের উপর সাহিত্যের প্রভাব :**

সাহিত্য ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সাহিত্য হল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান
প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বানভট্টের **হর্ষচরিত,** কলহনের **রাজতরঙ্গিণী**
সন্ধাকর নন্দীর **রামচরিত,** সোমেশ্বরের **'রাসমালা,'** রাজশেখরের **'প্রবন্ধকোষ'** প্রভৃতি
ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান।

ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয়ে জীবনী সাহিত্য এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে
প্রাচীন ও মধ্য যুগে অনেক রাজা, সম্রাট, বাদশাহ, সুলতান বা নবাব স্ব স্ব জীবনচরিত লিখে
রেখে গেছেন। এগুলি থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয়
বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যায়।

ইতিহাস ও সাহিত্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল। উভয়ে উভয়ের দ্বার
প্রভাবিত হয়। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এই দুই ধরনের মানুষই ঘটনার দর্শক। ঐতিহাসিক
বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা দেন। আর সাহিত্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন
ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যের মতো ইতিহাসের
ঘটনাগুলিকেও গল্পের আকারে পরিবেশন করার প্রবণতা দেখা যায়। সাহিত্যের ন্যায় ইতিহাসেও
ঘটনা সমূহের সাধারণীকরণ (Generalization) এবং বিমূর্ততার পরিবর্তে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ
বিবরণ দেখা যায়। ইতিহাস তথ্যনির্ভর হলেও ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিককে
কিছুটা কল্পনা, অনুমান এবং তাঁর নিজ সৃজনীশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, সর্বোপরি
সাহিত্যিকের ন্যায় ঐতিহাসিককেও অতীতের ঘটনাও লিখে সহজ ও বোধগম্য ভাষায়
পরিবেশন করতে হয় যাতে পাঠকের মনে সেই ঘটনার ছবি সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত হয়। সুতরাং
একজন ঐতিহাসিককে কিছুটা সাহিত্যিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।

ঐতিহাসিক ট্রাভেলিয়ন (Travelyan) সাহিত্যভিত্তিক ইতিহাস রচনার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ
করেন। তাঁর মতে ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়া তিনটে পর্বে বিভাজিত—তথ্য সংগ্রহ (Collection
of Data), তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (Analysis and Interpretation of the Data)
ও প্রতিবেদন রচনা (Reporting) ও উপস্থাপন (Presentation) তাঁর মতে প্রথম পর্ব হল

বৈজ্ঞানিক (Scientific)। এই পর্যায়ে দৃঢ় যুক্তির দ্বারা ঐতিহাসিক নির্বাচিত তথ্যগুলিকে
সাজানো—এখানে ঐতিহাসিক নেজাজেই বৈজ্ঞানিক, কারণ তথ্যগুলিকে সাজানোর জন্য
প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক মননশীলতার। দ্বিতীয় পর্বকে তিনি কল্পনাকেন্দ্রিক বলে অভিহিত
করেছেন (Imaginative or Speculative), এই পর্যায়ে ঐতিহাসিক তথ্যগুলির বিশ্লেষণ
ছাড়াও কতকগুলি সাধারণ সূত্রে উপনীত হয়ে থাকেন (Generalization)। যেহেতু তার
তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যায় দুঃসাধ্য কাজ, সেইজন্য কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে
থাকেন।

তৃতীয় পর্বে প্রয়োজন হয় সাহিত্যিক গুণাগুণের। বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পর সেগুলি
লিপিবদ্ধ করার জন্য ভাষার উপর দক্ষতা এবং উপস্থাপনের প্রয়োজন। এখানে ঐতিহাসিক
হল সাহিত্যিক। লেখার দক্ষতা না থাকলে ইতিহাস রচনা অনেকক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থেকে
যায় এবং তা পাঠককেও আকৃষ্ট করে না। ঘটনার যোগসূত্রতা স্থাপনের জন্য একজন
ঐতিহাসিককে অনেকটা সাহিত্যিকের মতোই সাবলীলতার সঙ্গে ঘটনা সমূহের বিবরণ
দিতে হয়—"With their full emotional and intellectual value." ফলে অতীতের
ঘটনাগুলি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

R.G. Collingwood ইতিহাসের সাহিত্যিক দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি
তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (The Ideas of History) ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান মনস্কতার
চেয়ে ঐতিহাসিকের কল্পনাশক্তির গুরুত্ব বেশি বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিকের
মূল কাজ হল কল্পনাশক্তির সাহায্যে নিজেকে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত করা এবং সেই
মতো ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত ঘটকের চিন্তাভাবনাগুলির উন্মেষ ঘটানো। এই কাজ
ঐতিহাসিকের পক্ষে তখনই সম্ভব যখন তিনি নিজ কল্পনা শক্তির সাহায্যে অতীতের সেই
ঘটনাগুলির নিজের মনে পুনর্নির্মাণ করেন। অর্থাৎ সেই ঘটনার সময়ে উক্ত ব্যক্তির মনের
অবস্থা কেমন ছিল বা সেই সময়ে তিনি কোন্ ধরনের চিন্তাভাবনায় মগ্ন ছিলেন—এই
সমস্ত বিষয়গুলি কল্পনা করে নিয়ে একজন ঐতিহাসিক অতীতের ঘটনাগুলির অভিজ্ঞতা
পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। সুতরাং ঐতিহাসিকের এই পুনর্নির্মাণের (Re-enactment)
প্রক্রিয়ার সঙ্গে একজন সাহিত্যিকের কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়ের প্রচেষ্টার
সারবত্তা হল ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ এবং বিবৃতির মধ্য দিয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে
তোলা। তাই **C.B. Webster** বলেন, "Each tries to construct a picture
combining narrative description and analysis : both tries to make their
pictures coherent whole so that they make sense." ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের
সম্পর্ক নির্ধারণে **J.H. Hexter**-এর অভিমত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে একজন ঐতিহাসিকের
শুধুমাত্র তথ্যের প্রতি সৎ ও একনিষ্ঠ থাকলেই চলে না, পাশাপাশি পাঠকের কাছে তাঁর
ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার যথার্থতা প্রমাণ করার দায়ও থেকে যায়। তাছাড়াও ঐতিহাসিককে

Scanned with CamScanner

শুধুমাত্র ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করলেই চলে না, অতীত সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা sense তৈরি করার দিকেও সচেষ্ট থাকতে হয়। আর এই কাজ সম্পাদনের জন্যেও তাকে সাহিত্যিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।

সাহিত্যের উপর ইতিহাসের প্রভাব: সাহিত্য যেমন ইতিহাসকে প্রভাবিত করে তেমনি ইতিহাসও সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। ঐতিহাসিক জনসন (Johnson) বলেছেন—ইতিহাস হল সাহিত্যের উৎস। ইতিহাসের মধ্য থেকে সাহিত্য তাঁর অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বহু কাল্পনিক নাটক, সিনেমা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা, গদ্য সমূহ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। সাহিত্যিক যখন স্থির করেন যে তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করবেন তখন তাঁকে ইতিহাসের সাহায্য নিতে হয় এবং ইতিহাস বিশদভাবে পড়তে হয়। ঐতিহাসিক তথ্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ করে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। অধিকাংশ সময়ে সেই কাহিনি হয় অপ্রাকৃত, নয় আধুনিক। ইতিহাসের তথ্যগুলি অলঙ্কার রূপেই থাকে। সেই তথ্য ঠিক না ভুল সেই নিয়ে আলোচনা চললেও সাহিত্যিকের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয়না। এই ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের সার্থক কাহিনি বলেই স্বীকৃতি লাভ করে এবং অভিনন্দিত হয়। কারণ এইসব উপন্যাসে কাহিনিটিই পাঠককে ধরে রাখে। অতীতের তথ্যগুলি সম্পাদনা হিসেবে কাজ করে থাকে। এই ধরনের ইতিহাসধর্মী সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শক্তিপদ রাজগুরুর **'মনিবেগম'**, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম', 'সেই সময়' ও 'প্রথম আলো'; দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের **'শাহজাহান'** ও **'মেবারের পতন'**; দীনবন্ধু মিত্রের **'নীলদর্পন'**; টলস্টয়ের **'ওয়ারল্যান্ডপিস'**; ঋত্বিক ঘটকের **'সাগিনা মাহাতো'**; সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' ও **'কালপুরুষ'**; নবীনচন্দ্র সেনের **'পলাশীর যুদ্ধ'**; সতীনাথ ভাদুড়ীর **'জাগরী'** ও **'ঢোঁড়াই চরিত মানস'**; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **'ঘরেবাইরে'** ইত্যাদি। সুতরাং সাহিত্যেই ইতিহাস আছে। সাহিত্যে ইতিহাসের ধর্ম আছে। সাহিত্য ইতিহাসধর্মী।

◆ **ইতিহাস ও সাহিত্যের পার্থক্য :**

⇒ ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়েরই কাজ মানুষকে নিয়ে। সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস। একক মানুষ (Individual) কে নিয়ে ইতিহাস মাথা ঘামায় না। একক মানুষের বা ব্যক্তি মানুষের মূল্য থাকলেও ইতিহাস নেই। ইতিহাসের কারবার সমাজবদ্ধ মানুষকে নিয়ে, সেহেতু, মানুষ সামাজিক হলেই কেবল ইতিহাস তার কথা ভাবে। আবার সামাজিক মানুষ যখন জীবনে একেবারে নিঃসঙ্গ তখন সে ইতিহাসের বাইরে থাকে। ইতিহাস একলা মানুষের জন্য নয়। সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য। অপরদিকে এই একলা মানুষটির হয়ে কথা বলে সাহিত্যিক, একজন ঐতিহাসিক একজন মানুষের মানসপ্রতিমা তৈরি করতে পারে না। একজন সাহিত্যিক একজন ব্যক্তির মানস প্রতিমা নির্মাণ করতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়ে অতীতকে

অতিক্রম করে বর্তমান আর ভবিষ্যতের সঙ্গে সেঁতু তৈরি করতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিক এটি করতে পারে না।

⇒ ইতিহাস অতীত নিয়ে কারবার করলেও ইতিহাসের অতীত 'কী বস্তু' সম্পর্কে সদাসর্বদা ঐতিহাসিককে সতর্ক থাকতে হয়। সাহিত্যিক অতীতের যে-কোনো ঘটনাকে তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা লেখার বস্তু করতে পারেন। কিন্তু অতীত ও ইতিহাসের অতীত এক নয়। ইতিহাসের অতীত সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত।

⇒ সাহিত্যিক হলেন স্রষ্টা, সাহিত্যিকের একটা ক্ষমতা আছে। তিনি ঘটনার মধ্যে বা মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন এবং সৃজনী শক্তির সাহায্যে মানুষের সামাজিকতার পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন। অপরদিকে ঐতিহাসিক হলেন দর্শক মাত্র। মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার আর নেই। তাই তিনি মানুষের মন মানসিকতার পরিবর্তনকে শুধুমাত্র স্বীকার করতে পারেন। কিন্তু ঘটনার বর্ণনার মতো করে মানসিকতার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সময় সচেতনতা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস ইতিহাসে আনতে সক্ষম, ইতিহাসে জীবন অবান্তর। সাহিত্যে যে সত্যের প্রকাশ, ঐতিহাসিকের সে সত্য প্রকাশের ক্ষমতা বা অধিকার নেই, সাহিত্যিকের মতো অবাধ বিচরণ ঐতিহাসিকের নেই।

⇒ ঐতিহাসিক চিরকালের বাইরের লোক। তাই ইতিহাস সাধারণত বড়ো সময়ের চৌহদ্দিতেই থাকে। তবে সাহিত্য ও সাহিত্যিক ঐতিহাসিকের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন। যত্রতত্র তার অবাধ চলাফেরা। বড়ো সময়, বিশেষ মানুষের ছোটো সময় ছেড়েও সাহিত্যিক একজন মানুষের ব্যক্তিগত সময়ে নেমে আসতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তা পারেন না। এখানে ইতিহাস সাহিত্য থেকে পৃথক।

◆ **উপসংহার :** উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক অতি নিবিড়। ঐতিহাসিকদের কাজে যেমন সাহিত্যকে দরকার তেমনি সাহিত্যিকেও ঐতিহাসিক ঘটনার সংক্রান্ত তথ্য লাভের জন্য ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। ইদানীংকালের ইতিহাস চর্চায় সাহিত্য ও ইতিহাসের গভীর সম্পর্কের কথা স্বীকার করে। সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে ইতিহাস চর্চায় মানসিকতা (Mentality) ও মেজাজের বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মানুষের মন-মানসিকতা সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ঠিকমতো বোঝা যায়না। সুতরাং ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত যেমন সুবিদিত ও সমাদৃত, তেমনি ইতিহাস যে সাহিত্যও বটে এই বক্তব্যকেও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যত দিন যাচ্ছে ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক ততই নিবিড় হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

১.৪ সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি [Innovations in teaching Social Science (History)] :

১.৪.১ নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ (Constructivist Approach of Teaching) :

আধুনিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় নির্মিতিবাদ (Constrictivism) একটি নতুন মতবাদ। নতুন এই মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আজ ভারতসহ বিভিন্ন দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সাদরে গ্রহণ করেছে। ভারতে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই মতবাদটি স্থান পেয়েছে। National Curriculum Frame Work 2005 এবং National Curriculum Frame Work for Teacher Education 2009-তে নির্মিতিবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র শিখন প্রক্রিয়াতেই নয়, পাঠ্যক্রম নির্বাচন, শিক্ষণ পদ্ধতি, শ্রেণি কক্ষের পরিবেশ গঠনে নির্মিতিবাদের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে।

১.৪.১.১ নির্মিতিবাদের অর্থ (Meaning of Constructivism) :

নির্মিতিবাদের অর্থ উপলব্ধি করতে হলে তার মূল বক্তব্যকে উপলব্ধি করা দরকার প্রথম। নির্মিতিবাদের মূল বক্তব্য হল ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করে তার কোনো স্বাধীন অর্থ বা সত্তা নেই। শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে জ্ঞান নির্মাণ করে। ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যখন পরিবেশ থেকে জ্ঞান লাভের উপাদান হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করে তখন তার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব। অর্থাৎ ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের পর জ্ঞানের নির্মাণ করে। কিন্তু ব্যক্তি কখনোই তার পরিবেশ থেকে গৃহীত তথ্যকে হুবহু একই রকম বা প্রতিকৃতি হিসেবে গ্রহণ করে না। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে তাকে বলা হয় প্রজ্ঞা (Cognition)। প্রত্যক্ষণ, স্মরণ যুক্তিকরণ, বিক্ষণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়া এই প্রজ্ঞার অন্তর্গত। প্রতিটি ব্যক্তির তার নিজস্ব প্রজ্ঞা আছে। যে-কোনো পরিবেশে একজন ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যখন অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজটি করে তখন সে তার সম্পূর্ণ নিজের মতো করে অভিজ্ঞতাকে গঠন বা নির্মাণ করে নেয়। এখানে একদিকে যেমন ব্যক্তির পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা, তার বৌদ্ধিক ক্ষমতা, সৃজনীক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তেমনই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই একই পরিবেশে একই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের মতো করে অর্থ উপলব্ধি করে। জ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্মাণ বা গঠনের ক্ষেত্রে কোনো নৈর্ব্যক্তিক (Objective) শর্ত নেই, বরং আছে প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত (Subjective) প্রভাব। এই জগতের যে-কোনো দুজন শিক্ষার্থী হুবহু একইরকম প্রক্রিয়ায় জ্ঞান নির্মাণের কার্য করে না, অর্থাৎ জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। **Jonasson** (১৯৯১)-এর ভাষায়

নির্মিতিবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, "Learners construct their own reality or at least interpret it based upon their perceptions of experiences, so one's knowledge is a function of one's prior experiences, metal structures, and beliefs that are used to interpret objects and events."

১.৪.১.২ নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of constructivism) :

নির্মিতিবাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী নিজেই তার জ্ঞানের নির্মাণকর্তা। এই জ্ঞান সে নির্মাণ করে সম্পূর্ণ সক্রিয়ভাবে।

(২) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং মানসিক সামর্থ্যকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে বস্তু বা ঘটনার অর্থ উপলব্ধি করে।

(৩) শিক্ষার্থী তার জ্ঞানকে নিজের মতো করে সংগঠিত বা নির্মাণ করে। এই জ্ঞান নির্মিত হয় শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক ক্ষমতা, চাহিদা, সৃজনী ক্ষমতা, উদ্দীপ্ত ও সমান্তরাল চিন্তন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে।

(৪) শিক্ষার্থীর সংগঠিত বা নির্মিত জ্ঞান কখনোই নৈর্ব্যক্তিক (Objective) নয়, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective)। এই কারণে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

(৫) শিক্ষার্থীর শিখন পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভিত্তিক। তার অভিযোজন বা সমন্বিতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জ্ঞানের নির্মাণ ঘটে। শিক্ষার্থীর যা জানা আছে তার থেকে অন্যরকম কিছু বা অতিরিক্ত কিছু ঘটলে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে জানা এবং অজানা (অন্য রকম বা অতিরিক্ত) বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ঘটে। এই দ্বন্দ্বকে বলা হয় প্রস্তাব দ্বন্দ্ব (cognitive conflict)। এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ঘটে এবং নতুন অভিজ্ঞতার স্থান পায়। এই বিষয়টিই শিক্ষার্থীর নিকট অভিযোজন নামে পরিচিত।

(৬) শিক্ষার্থীর জ্ঞানের নির্মাণ ঘটে বাস্তব সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। **Malone** এবং **Taylor** (১৯৯৩)-এর মতানুসারে, "Human knowledge is a process of Personal cognitive construction, or invention undertaken by the individual who is trying to make sense of his social or natural environment."

১.৪.১.৩ নির্মিতিবাদের প্রকারভেদ (Type of constructivism) :

নির্মিতিবাদকে প্রধানত দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়– একটি হল প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ (cognitive constructivism) এবং অপরটি হল সামাজিক নির্মিতিবাদ (social constructivism)।

Scanned with CamScanner

(ক) **প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ** (cognitive constructivism) : এই মতবাদটির প্রব হলেন **জ্যা পিঁয়াজে** (Piaget)। পিয়াজের মতে মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার মৌলিক উপা হল **স্কিমা** (schema)। এই স্কিমা হল এমন এক ধরনের মানসিক সংগঠন যা দিয়ে পরি থেকে আগত তথ্য বা অভিজ্ঞতার উপাদান সঞ্চিত হয়। এই স্কিমার সাহায্যেই মানুষ পরিবেশের উদ্দীপক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ব্যক্তি যখন কোনো উদ্দী পরিস্থিতির নতুন তথ্যকে বর্তমানে তার মধ্যে বিদ্যমান স্কিমাতে অঙ্গীভূত বা অন্তর্ভুক্তিকর কাজটি করে তখন তাকে বলা হয় আত্তীকরণ (Assimilation)। কিন্তু ব্যক্তি যখন কো সম্পূর্ণ নতুন তথ্যকে বর্তমানে তার মধ্যে বিদ্যমান স্কিমা দিয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণ না করে ন স্কিমা গঠন করে অথবা পূর্ববর্তী স্কিমার রূপান্তর ঘটায় তখন তাকে বলা হয় সহযোজন। আত্তীকরণ এবং সহযোজনের ফলশ্রুতিতে যে অভিযোজন ঘটে তার দ্বারা ব্যক্তি পরিবে সঙ্গে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। এই অভিযোজনের ধরন প্রত্যেক ব্যক্তির তার নি ব্যাপার। এজন্য ব্যক্তি তার নিজের মতো করে পরিবেশ থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ ক জ্ঞানের নির্মাণ করে।

(খ) **সামাজিক নির্মিতিবাদ** (social constructivism) : সামাজিক নির্মিতিবাদের প্রব হলেন রুশ মনোবিজ্ঞানী **ভাইগটস্কি** (Vygotsky)। পিঁয়াজের মতো ভাইগটস্কিও মান শিশুর জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেছেন। ভাইগটস্কির নির্মিতিবাদের মূল বক্তব্য হ মানুষ তার জ্ঞানের নির্মাণ করে পরিবেশ থেকে জ্ঞানের উপকরণ বা সংশ্লিষ্ঠ তথ্য সংগ্র করে, কিন্তু সেই পরিবেশ হিসেবে তিনি সামাজিক পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এ ব্যাপারে তিনি মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভাইগটস্কির নির্মিতিবাদ শিশু এবং তার আরো উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতি বা কৃষ্টিমূলক মিথষ্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে মানবশিশুর জ্ঞানের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন সামাজিক নির্মিতিবাদ অনুসারে শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের সংগঠিতকরণ বা নির্মাণ করে তা বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তার সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যু ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে।

প্রতিটি ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তার সান্নিধ্যে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক সাংস্কৃতি মিথষ্ক্রিয়ায় যুক্ত থেকে যে সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় সেগুলির ভিত্তিতে সে তার নিজে মতো করে জ্ঞানের নির্মাণ করে থাকে। শিক্ষক এখানে তার পরিচালক ও সহায়কের ভূমিক পালন করলেও কখনোই সরাসরি জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করেন না।

❖ ১.৪.১.৪ নির্মিতিবাদী শিখনের নক্‌শা (Constructivist Learning Design) :

নির্মিতিবাদী শিখনের নক্‌শায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দিয়ে যেগুলি অনুসর করার দরকার হয়—

(১) **পরিস্থিতি গঠন** (Developing a situation) : শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের মতো করে শিখন প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করতে পারে সেই উপযোগী একটি অনুকূল পরিস্থিতি গঠন করতে হয় শিক্ষককে।

(২) **শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধকরণ** (Grouping the students) : প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার মতো করে জ্ঞানের নির্মাণ করে। সেই কারণে শিক্ষককে জোর দিতে হয় ব্যক্তি বৈষম্যের নীতিকে। সেই কথা মাথায় রেখে কখনোই তিনি বড়ো আকারে শ্রেণি বা দল গঠন না করে খুব ছোটো ছোটো দল তৈরি করে শেখার সুযোগ করে দেবেন। দলগুলি ভিন্নধর্মী (hetero genous group) হলে ভালো হয়।

(৩) **সংযোগ রক্ষা বা সেতু বন্ধন** (Bridging) : শিক্ষার্থীরা যা জানে এবং যা তারা জানবে, এই দুই-এর মধ্যে শিক্ষক সেতুবন্ধনের কাজ করবেন। এজন্য তিনি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে সেই অনুসারে শিখনে অগ্রসরতা ঘটাবেন।

(৪) **প্রশ্নকরণ** (Questioning) : শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান এবং যে জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাবেন সেই জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা বা সেতুবন্ধনের জন্য শিক্ষক প্রশ্নকরণের কৌশল অবলম্বন করবেন। সেজন্য তিনি শ্রেণিকক্ষে নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করে আনবেন। প্রশ্নকরণের দক্ষতাকে এই ব্যাপারে কাজে লাগাবেন।

(৫) **শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সঞ্চার** (Motivating) : শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, মিথষ্ক্রিয়াধর্মী শিখনে অংশগ্রহণ করে তার জন্য তাদের প্রেষণা সঞ্চার করতে হবে।

❖ ১.৪.১.৫ নির্মিতিবাদের পঞ্চ 'E' (Five Es of Constructivism) :

নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষণকার্য পরিচালিত করার জন্য একটি নির্দেশনামূলক মডেল (instructional model) প্রস্তুত করেন **Roger Bybee**। এই মডেলে পাঁচটি E-এর ধারণায় পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে নির্দেশনা দানের কথা বলা হয়েছে, এগুলিকে পঞ্চ E (Five Es)-এর ধাপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। **মূলত পাঁচটি ধাপকে পাঁচটি কথা দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, এই পাঁচটি কথা হল—**

(i) নিয়োজিত করা (Engage)
(ii) অনুসন্ধান করা (Explore)
(iii) ব্যাখ্যা করা (Explain)
(iv) বিশদ বর্ণনা দেওয়া (Elaborate)
(v) মূল্যায়ন করা (Evaluate)

উপরোক্ত পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যটি পরিচালিত হয় তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

(i) **নিয়োজিত করা** (Engage) :

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে পাঠের বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত করা এবং সেই অনুসারে শিখনের কার্যে অগ্রসর হওয়া শিক্ষার্থীর প্রাথমিক কার্য। শিক্ষার্থী যা জানে (পূর্বজ্ঞান) এবং যা সে জানবে (যে জ্ঞান সংগঠিত করবে) তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা বা সেতু বন্ধনের কার্যটি শিক্ষার্থী সঠিকভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। শিখনের এই প্রথম ধাপটিতে এই পূর্বজ্ঞান ও সংগঠিতব্য জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ সাধনের কার্যে নিয়োজিত করাই হল শিক্ষার্থীর মূল উদ্দেশ্য। এই ধরনের উদ্দেশ্য পূরণের ভিত্তি হল গঠনমূলক বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন। শিক্ষার্থীদের এই ধরনের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করতে যথেষ্ট উদ্দীপিত হওয়া দরকার। এ জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ, শিখন কার্যাবলিতে প্রেরণা সঞ্চার করার প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়— প্রশ্নকরণ, সমস্যার সৃষ্টিকরণ, সমস্যার ব্যাখ্যাকরণ, ঘটনায় আকস্মিকতা প্রদর্শন এবং সর্বোপরি একটি সমস্যাবহুল পরিস্থিতির উদ্ভবের দ্বারা।

(ii) **অনুসন্ধান করা** (Explore) :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী সরাসরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা ও বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করে নেয়। এইভাবে অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি হিসেবে ঘটনার প্রেক্ষিত অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা ভিত্তি রচনা করে। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অংশগ্রহণ, মত বিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষার ফলে শিক্ষার্থী দলের প্রতিটি সদস্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তি নির্মাণ করতে সমর্থ হয়। এই সমগ্র কার্য প্রক্রিয়াটিতে শিক্ষক তাঁর ভূমিকা পালন করেন একজন সহায়ক, পরিচালক, শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহকারক হিসেবে। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়াটি কার্যত নির্দেশনার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

(iii) **ব্যাখ্যা করা** (Explain) :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী ব্যাখ্যাকরণের কার্যটি চলে। শিক্ষার্থীরা যা উপলব্ধি করতে পেরেছে সেটি তারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীরা কখনো ব্যক্তিগত স্তরে কখনো দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অথবা একটি দলের মধ্যে ব্যাখ্যাদানের কার্যটি চালাতে পারে। শেষপর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই ব্যাখ্যা দিতে হয় তাদের শিক্ষক তথা সহায়কের নিকট। শিক্ষক তখন তাঁর মতো করে বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যাখ্যা করে আরো ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য 'ধারণা'গুলি বিশেষ বিশেষ 'শব্দ'-এর দ্বারা ব্যবহৃত হয় সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যাও তিনি দিয়ে দেন এবং বিষয়বস্তুকে আরো উন্নত স্তরে, আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেন।

(iv) **বিশদ বর্ণনা দেওয়া** (Elaborate) :

বিশদভাবে বর্ণনাদানের এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের জানা বিভিন্ন ধারণাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে তাদের চারপাশের জাগতিক পরিবেশের ঘটনা ও বস্তুসামগ্রীকে

উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। এ জন্য তারা ধারণাগুলিকে পূর্বে যতটুকু জেনেছে সেগুলিকে বিস্তৃতভাবে বোঝার চেষ্টা করে এবং বিশদে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করে। এই উপলব্ধি তাদের পরবর্তী অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন ধরনের উপলব্ধিতে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

(v) **মূল্যায়ন করা** (Evaluate) :

নির্দেশনামূলক যে উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে জ্ঞানসমূহ শিক্ষার্থীদের অর্জন করার কথা ছিল এবং যেগুলি তাদের উপলব্ধি করা দরকার সেগুলির যথাযথ অর্জন এবং উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে কি না এবং সেই সঙ্গে সেগুলির অর্জনের স্তর নির্ধারণের জন্য শিক্ষকের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষকের উপর। নির্দেশনার প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এই মূল্যায়নের কার্য সম্পাদনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে যন্ত্র বা কৌশল ব্যবহার করা হয়। পাঠ-পরিকল্পনার নক্‌শা, পর্যবেক্ষণ তালিকা, চেকলিস্ট, সাক্ষাৎকার প্রভৃতির মাধ্যমে তা করা যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রজেক্ট বা সমস্যাভিত্তিক কার্যাবলিও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মূল্যায়ন একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রভাবিত করে তেমনি শিক্ষককে পরবর্তী পাঠদানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সচেতন করে। পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনমতো সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুযোগও তৈরি হয় এই মূল্যায়নের ফলে। এইভাবে শিক্ষক ক্রমশ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চারের মাধ্যমে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন।

❖ ১.৪.১.৬ নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Constructivist classroom) :

নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ কার্য পরিচালিত করতে হলে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। **নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—**

(১) শ্রেণিকক্ষ হবে ভীষণভাবে মিথস্ক্রিয়া ভিত্তিক। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে, দুই দল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এই মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হবে শ্রেণিকক্ষের একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়।

(২) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার মধ্যে ভারসাম্য থাকা দরকার। এমন হওয়া ঠিক নয় যে, শিক্ষক খুব বেশি সক্রিয় কিন্তু শিক্ষার্থীরা তুলনায় নিষ্ক্রিয় অথবা শিক্ষার্থীরা খুব সক্রিয় কিন্তু শিক্ষক নিষ্ক্রিয়।

Scanned with CamScanner

(৩) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চরণ ঘটাবেন বরং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদানের দ্বারা এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান সংগঠিত বা নির্মাণ করার প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত বোধ করে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে এমন সব বস্তু উপস্থাপিত করা দরকার।

(৪) শ্রেণিকক্ষের সামগ্রিক পরিচালনা, আগ্রহের জন্য আকর্ষণীয় বস্তু প্রদর্শন ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক অংশ গ্রহণের দ্বারা সম্পন্ন হবে। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ উদ্দীপনা সঞ্চারকারী, জটীলতাপূর্ণ সেজন্য চিত্তাকর্ষক ও প্রাসঙ্গিক বই, জীবজন্তু, যন্ত্রসঙ্গীতের উপকরণ, উপস্থাপনের ব্যবস্থা থাকবে।

(৫) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা থাকবে নিয়ন্ত্রিত এবং ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত শিখনমূলক কার্যাবলির পরিকল্পনা তৈরির সময় শিক্ষক ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব দেবেন বেশি, শ্রেণিকক্ষে সমগ্র শিক্ষার্থীদের প্রতি গুরুত্ব দেবার দরকার নেই।

(৬) শ্রেণিকক্ষে এমন বাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের শিখনের সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা থাকে।

(৭) শিক্ষার্থীদের নতুন জ্ঞান পুনর্গঠন বা নির্মাণ এর জন্য আন্তরিক তাগিদ, প্রেরণা অবশ্যই থাকা দরকার। এ জন্য শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার মানসিকতা এবং সেই সঙ্গে উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টামূলক প্রবণতা থাকা উচিত। শিক্ষক-এর সঙ্গে মত বিনিময় অথবা সহপাঠীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে।

(৮) শ্রেণিকক্ষে শিখনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বাস্তব সমস্যা সমাধান করার জন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে শিখনে অগ্রসর হওয়া। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবিষ্কার ধর্মী শিখনে উৎসাহিত হওয়া দরকার

(৯) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী তার চিন্তনের যাচাই-এর জন্য অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া সম্পাদন করা ও আত্মমূল্যায়নের কৌশলকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(১০) সর্বোপরি শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থী বিশ্বের বহুমুখী দিককে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা লাভ করতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজের সুযোগ দেওয়া দরকার।

❖ ১.৪.১.৭ নির্মিতিবাদী শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in constructivist approach of Teaching) :

নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করা উচিত।

(১) নির্মিতিবাদী শিক্ষককে তাঁর নিজের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার। বিষয় জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রসারতা উভয়ই থাকা উচিত।

(২) শুধুমাত্র নিজের বিষয় জ্ঞানেই শিক্ষককে দক্ষ হলে চলবে না, নিজের বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানও তাঁর থাকা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষককে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন— দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির জ্ঞানও থাকা আবশ্যক।

(৩) অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে শিক্ষককে তাঁর নিজের বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে তা শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরতে হবে।

(৪) প্রকৃত বাস্তব পরিবেশ, প্রকৃতি এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষণের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা দরকার, যেগুলি শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরেও তার শিখনের পরিবেশ এইভাবে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে।

(৫) শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে যাচাই করে তার ভিত্তিতে শিক্ষক তাঁর নির্দেশনার ক্ষেত্রে পরিচালক এবং সহায়ক-এর ভূমিকা পালন করবেন।

(৬) নির্মিতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যাপ্তি জানার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই পূর্বজ্ঞান যাচাই-এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষককে সম্পন্ন করা উচিত। শিক্ষার্থীরা এই পূর্বজ্ঞানকে অবলম্বন করেই নতুন জ্ঞানের নির্মাণ করে। শিক্ষার্থীর চিন্তনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি বিশেষভাবে সহায়তা করে। সুতরাং শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করা, চিন্তন প্রক্রিয়াকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের ভুল ধারণাগুলির দূরীকরণে শিক্ষককে যথেষ্ট দক্ষ ও যত্নবান হতে হবে।

(৭) নির্মিতিবাদী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট তথ্য সরবরাহের শুধুমাত্র প্রাথমিক উৎস নয়, তাঁকে হতে হবে মুখ্য শিখন সম্পদ কেন্দ্র।

(৮) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এমনভাবে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তার মোকাবিলা করতে বর্তমানের জ্ঞানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। এতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভুল ধারণাগুলি উপলব্ধি করার সুযোগ পায়।

(৯) শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মনোযোগ দেবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কোনোরকম ইতস্তত: ছাড়াই প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের সুযোগ দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠের মধ্যে নিজেদের মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে।

(১০) শিক্ষার্থীরা এমনভাবে শিখনে অগ্রসর হবে যাতে সেই শিখন-এর ফলশ্রুতি হিসেবে তারা আরো উন্নত ও অগ্রবর্তী শিখনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে,

Scanned with CamScanner

খোলামনে প্রশ্ন করতে পারে, চিন্তাশীল হতে পারে— তার জন্য প্রয়োজনীয় উৎস
প্রদানের কাজটি শিক্ষককে দক্ষতার সঙ্গে করা উচিত।

❑ ১.৪.২ চিন্তায় আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা কৌশল (Brain Storming Strategy)

চিন্তার আলোড়ন শব্দ গুচ্ছটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Brain Storming', যার অ
মস্তিষ্কের আলোড়ন অন্যভাবে বলা যায় ব্যক্তির স্বাধীনভাবনার মন্থনা। চিন্তার-আলোড়
হল একটি শিক্ষণ কৌশল (teaching strategy)। এই শিক্ষণ কৌশলটির মাধ্যমে ব্যক্তি
চিন্তা ভাবনার একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি এবং অতি অল্প সময়ে তাৎক্ষণিক ভাবে অধি
ধারণা লাভ করাই হল মূল উদ্দেশ্য। মুক্তচিন্তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান অথবা নতু
কোনো ধারণা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর একটি উপায় হল এই 'চিন্তার আলোড়
বা 'Brain Storming'। শিক্ষণ কৌশল হিসেবে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন A.F
Osborn (1963) তাঁর লেখা 'Applied Imagination'-এর মাধ্যমে। তাঁর মতে কোনে
রকম বিচারকরণ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়াই কোনো পরিস্থিতির সমস্যা সমাধান করা
তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণার অনুসন্ধান করার জন্য এই শিক্ষণ কৌশলটিকে একজ
শিক্ষার্থীর উপর ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রতিভাবান বা উন্নত বৌদ্ধিক
ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশে কার্যকরী। কারণ এখানে শিক্ষার্থীদে
চিন্তার স্তরে শিখন সম্পন্ন হতে পারে, সৃজনধর্মী কল্পনার উদ্ভব হয় এবং সমস্যা সমাধানে
ঘটনা ঘটে। চিন্তার আলোড়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর Cognitive domain-কেই প্রভাবিত ক
না, তার Affective domain-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাগুলিকেও প্রভাবিত করে যথেষ্ট।

❖ ১.৪.২.১ মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝার অর্থ (Meaning of Brain Storming) :

চিন্তার আলোড়ন শব্দ গুচ্ছটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Brain Storming', যার অ
মস্তিষ্কের আলোড়ন অন্যভাবে বলা যায় ব্যক্তির স্বাধীনভাবনার মন্থনা। চিন্তার-আলোড়
হল একটি শিক্ষণ কৌশল (teaching strategy)। এই শিক্ষণ কৌশলটির মাধ্যমে ব্যক্তি
চিন্তা ভাবনার একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি এবং অতি অল্প সময়ে তাৎক্ষণিক ভাবে অধি
ধারণা লাভ করাই হল মূল উদ্দেশ্য। মুক্তচিন্তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান অথবা নতু
কোনো ধারণা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর একটি উপায় হল এই 'চিন্তার আলোড়
বা 'Brain Storming'। শিক্ষণ কৌশল হিসেবে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন A.F
Osborn (1963) তাঁর লেখা 'Applied Imagination'-এর মাধ্যমে। তাঁর মতে কোনে
রকম বিচারকরণ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়াই কোনো পরিস্থিতির সমস্যা সমাধান করা
তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণার অনুসন্ধান করার জন্য এই শিক্ষণ কৌশলটিকে একজ
শিক্ষার্থীর উপর ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রতিভাবান বা উন্নত বৌদ্ধিক
ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশে কার্যকরী। কারণ এখানে শিক্ষার্থীদে

চিন্তার স্তরে শিখন সম্পন্ন হতে পারে, সৃজনধর্মী কল্পনার উদ্ভব হয় এবং সমস্যা সমাধানের
ঘটনা ঘটে। চিন্তার আলোড়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর Cognitive domain-কেই প্রভাবিত করে
না, তার Affective domain-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাগুলিকেও প্রভাবিত করে যথেষ্ট।

❖ ১.৪.২.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা সংগঠিত করার পদ্ধতি (Brain Storming Method) :

শিক্ষণ কৌশল হিসেবে 'চিন্তার আলোড়ন' বা 'Brain Storming'-কে সংগঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার—

(১) শুরুতে শিক্ষার্থীদের ১০-১৫ জনকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয় এবং এই দলের নেতা হল স্বাভাবিকভাবে একজন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের সবসময় একটি কাজ বা সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিশেষ কোনো একটি সমস্যা তাদের সামনে তুলে ধরা, যেমন— 'ছাত্রবিক্ষোভ', 'পশ্চিমবঙ্গে কর্ণহীনতার বৃদ্ধি' অথবা 'বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি' ইত্যাদি।

(২) দলের নেতা হিসেবে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদলের সদস্যদের সামনে সমস্যাটি তুলে ধরে তার সমাধানের সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করার জন্য বলেন। শিক্ষার্থীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একে একে তাদের নিজেদের সমাধান সংক্রান্ত ধারণাগুলি দিতে থাকে। শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যাটিকে সবদিক থেকে চিন্তাভাবনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্ভাব্য সমস্ত সমাধানের পথগুলি ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত হয়। এজন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কতকগুলি নির্দেশ বা পরামর্শ দেন যেমন—

(i) শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমাধানের পথ বা উপায় নির্ধারণ করে।

(ii) সম্ভাব্য সমস্তরকম সমাধানের পথকে চিহ্নিত করার কথা বলা হয় এবং শিক্ষার্থীরা যেন সমালোচনাকে গুরুত্ব না দেয়। কোনোরকম ইতস্তত ভাব ছাড়াই শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরস্পরকে পরামর্শ দেয়।

(iii) অন্যের মতামতকে বা সমাধানের বিষয়টিকে সমালোচনা না করে যেন বিকল্প উপায় উল্লেখ করতে পারে উপায়কে পরিবর্তিত করতে পারে অথবা পরিমার্জিত করতে পারে।

(iv) শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের নিজেদের ধারণা দেওয়া কিংবা সমাধানের পথ নির্দেশ করার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করে, সে কথাও শিক্ষক উল্লেখ করে দেন।

(৩) এইভাবে তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যাটির সমাধানের পথ নির্দেশ করার ব্যাপারে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হয়। দলের সদস্যরা এবং দলের নেতা সম্ভাব্য সমস্ত সমাধানের পথগুলিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। সমাধান-সংক্রান্ত সমস্ত বিকল্প ধারণাগুলিকে উপযুক্তভাবে লিখে রাখা বা রেকর্ড করা হয়।

Scanned with CamScanner

(৪) চিন্তার আলোড়নের শেষ পর্যায়ে সমাধানগুলি স্বাধীন ও খোলামেলা গণতান্ত্রিক পরিবেশ আলোচিত হয় সবচেয়ে উপযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের পথটিকে গ্রহণ করা হয়।

এই প্রক্রিয়া পরিচালনার সময় প্রশিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নীতি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। প্রথম নীতিটি হল প্রশিক্ষক দলের সকলের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত প্রশিক্ষক সিদ্ধান্ত প্রদানে বিরত থাকবেন; দ্বিতীয় নীতিটি হল দল থেকে যত বেশি ধারণা বের করে আনা যাবে তত বেশি সঠিক এবং পূর্ণ কার্যক্রমের তালিকা ও ধারণা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

❖ ১.৪.২.৩ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা (Advantages of Brain Storming Strategy) :

চিন্তার আলোড়ন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করে, শাসন করে পরনির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিণত করেন না, পরিবর্তে শিক্ষার্থীকে সক্রিয়, স্বনির্ভরশীল, স্বাধীন চিন্তনের অনুসারী এবং আবিষ্কারকে দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে সাহায্য করেন। জ্ঞান সংগ্রহের পরিবর্তে বরং নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন অনুপ্রাণিত করেন।

(ii) এই শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করে। এই শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীরা চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী, বিশ্লেষক যেমন হতে পারে তেমনি জ্ঞানের আত্তীকরণের বিষয়গুলিকেও আয়ত্ত করতে পারে।

(iii) শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি, মৌলিক ধারণালাভের জন্য বহির্মুখী চিন্তন এবং সমস্যা সমাধান এর ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ কৌশল বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(iv) একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দলগত ভাবে সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গিকে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে শেখে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন একে অপরের সহযোগিতা করে তেমনি অন্যের মতামতকে সাদরে শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্যতা দিতে শেখে।

(v) শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ, তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে উৎসাহিত হয়।

❖ ১.৬.২.৪ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের অসুবিধা (Disadvantages of Brain Storming Strategy) :

চিন্তার আলোড়ন কৌশলের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। সেগুলি হল—

(i) সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দলের সমস্ত সদস্য সমানভাবে আগ্রহী নাও হতে পারে।

(ii) দলের সমস্ত সদস্যের প্রত্যেকের মানসিক ক্ষমতা, জ্ঞান ও দক্ষতা সমান নাও হতে পারে অর্থাৎ দলটি সমধর্মী (Homogenious) নাও হতে পারে।

(iii) দলের প্রতিটি সদস্য সমান উৎসাহী, আগ্রহী, বুদ্ধিমান, সৃজনশীল না হলে কৌশলটি অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।

(iv) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উপযুক্ত ফলাফল বা সমস্যাটির উপযুক্ত সমাধান নাও পাওয়া যেতে পারে।

(v) সমস্যা সমাধান ও আবিষ্কারের প্রেরণা নিয়ে শিক্ষার্থীরা অগ্রবর্তী হতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে।

(vi) উন্নতমানের শিক্ষক না হলে দলের নেতৃত্বে দেওয়া সহজ হয় না, সেক্ষেত্রে শিক্ষণ কৌশল ব্যর্থ হয়।

❑ ১.৪.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণ (Reflective Teaching) :

❖ ১.৪.৩.১ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and defination of Reflective Teaching) :

শিক্ষার্থী যখন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে মৌলিক চিন্তা করে এবং সমালোচনামূলক বিষয়ে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে চিন্তা করে তখন সেই স্তরই চিন্তনমূলক স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়। এই চিন্তনমূলক স্তরের শিক্ষণের মধ্যেও স্মৃতিমূলক এবং বোধমূলক শিক্ষণ অন্তর্গত। অর্থাৎ এই স্তরের শিক্ষণেও প্রথম দুটি শিক্ষণ স্তর—স্মৃতিমূলক ও বোধমূলক শিক্ষণ ব্যবহার করা যায়, তবে এই স্তরটি অন্য দুটির তুলনায় উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে। অত্যাবশ্যকীয় ভাবে চিন্তনমূলক শিক্ষণ বলতে বোঝায় 'সমস্যা কেন্দ্রিক' শিক্ষণ।

Reflection শব্দটির অর্থ হল প্রতিফলন-মূলক কার্য অর্থাৎ ফিরিয়ে দেওয়া, মনশ্চক্ষে দর্শন করা বা গভীরভাবে চিন্তা করা। ফলশ্রুতিতে, চিন্তনমূলক শিক্ষণে থাকতেই হবে প্রতিফলনের পদ্ধতি বা যে বর্তমান জ্ঞান বা ধারণা আছে তাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি।

Morris L. Bigge একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে, "as careful, critical examination of an idea or supposed article of knowledge in the light of the testable evidence which supports it and the further conclusions towards which it points."

উপরোক্ত সংজ্ঞাটির সযত্নে পরীক্ষা করলে চিন্তনমূলক শিক্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা দেয়।

Scanned with CamScanner

(১) এটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমান ঘটনা, ধারণা, অন্তর্দর্শন এবং সামান্যীকরণের অন্তরঙ্গ সযত্ন এবং সূক্ষ্ম পরীক্ষণের সুযোগ করে দেয়।

(২) প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে শিক্ষার্থীরা পূর্বোক্ত ঘটনা, ধারণা প্রভৃতি বিষয়গুলির পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে।

(৩) শিক্ষার্থীরা স্বাধীন প্রকল্পগুলিকে মুক্তভাবে বেছে নিতে পারে। সেগুলিকে পরীক্ষা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারে, যাতে নতুন কোনো ঘটনা শিখতে অথবা নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে।

উপরোক্ত প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলা যায় যে, চিন্তনমূলক শিক্ষণ কিছু উচ্চস্তরে সংগঠিত হওয়া উচিত, যাতে সেটি শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুযোগ দান করতে পারে।

এই সুযোগদান সর্বোচ্চ স্তরে হতে পারে যদি শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতি সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা যদি এ সমস্যাকে তাদের চিন্তন এবং স্বাধীন জ্ঞান সঞ্চারণের দ্বারা সমাধানের পথটি আবিষ্কার করতে পারে। সুতরাং প্রকৃত অর্থে চিন্তন মূলক স্তরে শিক্ষণ আর কিছুই না, এটি হল সমস্যা সমাধান অথবা আবিষ্কারের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

এই চিন্তনমূলক শিক্ষণ-এর মূল বা উৎস নিহিত আছে শিখনের Cognitive field theory-এর মধ্যে। অন্য দিকে এই তত্ত্বকে বলা হয় লক্ষ্য অভিমুখী অন্তর্দর্শন তত্ত্ব (goal insight theory)। প্রচলিত বা গতানুগতিক যান্ত্রিক মুখস্থ করার অর্থহীন বোধগম্যতার ঘটনার বিরোধিতা করে। এই ধরনের শিক্ষণ উদ্দেশ্যপূর্ণ লক্ষ্য অভিমুখী, অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জোর দেয়। এটি শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানমূলক আচরণের শিল্প এবং দক্ষতাকে প্রস্তুত করে। চিন্তনমূলক শিক্ষণে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের সামান্যীকরণে, ঘটনার আবিষ্কারে উপায় অনুসন্ধানে এবং সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জনে।

সুতরাং শিক্ষণ পদ্ধতি এখানে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আবিষ্কারকের পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ইত্যাদি। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে টেস্ট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে দক্ষতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়।

❖ ১.৪.৩.২ চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Reflective Teaching) :

(i) এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে স্মৃতিমূলক ও ধারণামূলক স্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, মুক্তচিন্তার অধিকারী হতে সমর্থ হয়।

(ii) চিন্তনমূলক শিক্ষণের একটি বিশেষ দিক হল সমস্যা সমাধানের বিষয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অন্তর্দৃষ্টিমূলক চিন্তন ক্ষমতার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

(iii) চিন্তনমূলক শিখনের ক্ষেত্রে বা উৎস যেহেতু বিভিন্নভাবে বিস্তৃত থাকে, তাই শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে এই শিক্ষণ ঘটে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই শিক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে না।

(iv) এই শিক্ষণ পদ্ধতি কোনো ভাবে শিক্ষক কেন্দ্রিক বা বিষয়কেন্দ্রিক নয়। কার্যত শিক্ষক এখানে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকে না। তিনি এখানে পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন মাত্র, তিনি হলেন শিক্ষার্থীদের সহায়ক।

(v) চিন্তনমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি যেহেতু শিক্ষার্থীর চিন্তাশীল স্তরের উপর নির্ভরশীল তাই শিক্ষণ পদ্ধতিসম্পূর্ণ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হয়।

(vi) সমস্যা সমাধান করা কিংবা আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজের চিন্তন প্রক্রিয়াকে অগ্রবর্তী করতে হয় বলে, শিক্ষার্থীর তাগিদ থাকে চিন্তার আশ্রয় নিতে, স্বাভাবিকভাবে তার প্রেষণাও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অর্থাৎ প্রেষণা শিক্ষার্থীর অন্তর্জাত সুতরাং তা যথেষ্ট আন্তরিক।

(vii) চিন্তার উন্নত স্তরে নিজেকে উন্নীত করে তুলতে হয় বলে শিক্ষার্থীর চিন্তনশীল প্রক্রিয়া সব সময় ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ শিক্ষার্থী এখানে সর্বদা সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থায় অবস্থান করে।

(viii) চিন্তনমূলক শিক্ষণে শ্রেণির পরিবেশ হবে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ ও খোলামেলা। এই পরিবেশ হয় গণতান্ত্রিক এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষণ কার্য চলাকালে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়।

❖ ১.৪.৩.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Reflective Teaching) :

চিন্তনমূলক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অর্জনে সহায়তা করে।

(i) শেখা ঘটনা এবং অর্জিত বোধগম্যতা অথবা অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে শিক্ষার্থীকে চিন্তার স্তরে নিয়ে যাওয়া।

(ii) অন্তর্দৃষ্টির পরীক্ষিত সামান্যীকরণ চরিত্রকে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে সহায়তা করা এবং সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটানো।

(iii) শিক্ষার্থী যাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে সেজন্য তার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

(iv) স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ-সাধন করা।

❖ ১.৪.৩.৪ চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা (Role of teacher & learner in Reflective Teaching) :

স্মৃতিমূলক শিক্ষণে শিক্ষক যেমন অনেকটাই এক নায়কতন্ত্র সুলভ আচরণ করেন এবং ধারণামূলক বা বোধমূলক শিক্ষণে যেমন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেন তেমন করে

Scanned with CamScanner

চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন না। শিক্ষক এখানে পরিচালকের ভূমিকায় থাকেন। তিনি কোনো ঘটনা বা সামান্যীকরণের বর্ণনাদানের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের আবিষ্কারের প্রেরণা দান করেন। তিনি তাদের এমন শিখনে সহায়ক করেন যেখানে শিক্ষার্থীরা সমস্যা গঠন করে আবিষ্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার সূত্রপাত করে, সমালোচনামূলক চিন্তন প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানায়, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয় এবং যতখানি সম্ভব নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান করতে পারে। এদিক থেকে শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেকখানি। কোনো তথ্য-প্রদান করা বা বলে দেওয়ার চেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সেই তথ্যের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করাতে এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় সেই সমস্ত তথ্যগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে অনুসন্ধান করতে সহায়তা করা শিক্ষকের কেটি বড়ো দায়িত্ব। সুতরাং তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি, কার্য-কারণ-সম্পর্ক বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি আবিষ্কারের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর চিন্তার স্তরকে প্রেষিত করাই শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

শিক্ষার্থী এই ধরনের শিখনে নির্বাক শ্রোতা হিসেবে অবস্থান করে না, বরঞ্চ সে একজন সক্রিয় আবিষ্কারক এবং শিক্ষার্থী তার বোধ বা ধারণামূলক ক্ষমতার পূর্ণব্যবহার করতে শেখে। সমস্যা সমাধানমূলক পরিস্থিতিতে অনেক বেশি করে তার বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করে।

চিন্তনমূলক শিক্ষণ-এর ক্ষেত্রে শিক্ষক কী ভূমিকা গ্রহণ করবেন সেই ব্যাপারে তাঁর মডেল (হান্টের শিক্ষণ মডেল) এ যে নির্দেশিকা বা guide line দিয়েছেন বা সুপারিশ করেছেন সেগুলিকে নিম্নে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এগুলি হল—

(i) চিন্তনমূলক শিক্ষণকার্য পরিচালনা করার আগে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের স্মৃতিমূলক ও ধারণামূলক শিক্ষণকে সফল করে তুলতে হবে। এই দুটি শিক্ষণস্তর সফল হলেই চিন্তনমূলক শিক্ষণ কার্য পরিচালনা করা যাবে।

(ii) শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত বা প্রত্যাশার মাত্রাকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উচ্চতায় স্থাপন করতে হবে বা তুলে ধরতে হবে।

(iii) শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা বা ত্রুটির ক্ষেত্রগুলিকে খুঁজে বের করে বা চিহ্নিত করে সেগুলির দূরীকরণে যথাযথভাবে শিক্ষামূলক মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

(iv) সমস্যামূলক পরিস্থিতিকে শিক্ষার্থীদের নিকট এমনভাবে উপস্থাপিত করা দরকার যাতে শিক্ষার্থীরা উচ্চ ক্ষমতা ও সৃজনীশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাগুলির বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়।

(v) শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ পরিবেশকে মুক্ত, অন্তরঙ্গ, খোলামেলাভাবে গড়ে তোলার জন্য আন্তরিকভাবে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষণ পরিবেশ হবে গণতান্ত্রিক।

(vi) সমস্যার সমাধান শিক্ষক করে দেবেন না, সমাধান করতে হবে শিক্ষার্থীকে কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা উপস্থাপনের ভঙ্গি এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় সমস্যার প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে সমর্থ হয় এবং সমাধানের সূত্র বা উপায়গুলিকে খুঁজে পায়।

❖ ১.৪.৩.৫ চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাসমূহ (Advantages of Reflective Teaching) :

চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা** : চিন্তনমূলক শিক্ষণ গতানুগতিক বা প্রচলিত বিষয়কেন্দ্রিক অথবা শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের শিক্ষণ এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য স্থির করে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় উদ্ভাবন করে।

(২) **শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার যথার্থ বিকাশ** : স্মৃতিমূলক ও ধারণামূলক শিক্ষণস্তরের তুলনায় এটি অনেক বেশি উচ্চস্তরের শিক্ষণ। এই ধরনের শিখন তথ্য সংগ্রহ, সামান্যীকৃত অন্তর্দর্শন এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বলে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়।

(৩) **বৃহত্তর জগতে সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন** : শিক্ষার্থীদের জীবনে সমস্যা শুধু বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবিষয় বা পাঠক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার্থীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিদ্যালয় পরিস্থিতির বাইরের বৃহত্তর জীবনেও। এই বাইরের বাস্তব জীবনে সমস্যা মুখোমুখি হতে এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করে এই চিন্তনমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি।

(৪) **শ্রেণিকক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠন** : আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে শ্রেণিকক্ষের মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ-এর ওপর। চিন্তনমূলক শিক্ষণ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে গণতান্ত্রিক, স্বাস্থ্যকর, জীবনমুখী এবং উদ্দীপনা ধর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় মিথষ্ক্রিয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যে এবং শিক্ষকের সঙ্গে আবদ্ধ হতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে প্রকৃত চিন্তনশীল, আবিষ্কারের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং সমস্যা সমাধান করার মতো মানসিকতা গঠন করতে পারে শিক্ষার্থীরা।

(৫) **বিভিন্ন ধারণা, নীতি, সম্পর্ক, নিয়ম ও তত্ত্বের উপলব্ধি** : শিক্ষার্থীরা এই ধরনের শিক্ষণে বিভিন্ন রকম ধারণা নীতি, সম্পর্কস্থাপন, সামান্যীকরণ, নিয়ম ও তত্ত্বের উপলব্ধিতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা নিজেদের সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে শেখে।

Scanned with CamScanner

(৬) **জ্ঞানার্জন, বিশ্লেষণ ও আবিষ্কারের প্রেরণা দান :** আজকের এই আধুনিক প্রযুক্তি যুগে পড়ে উঠেছে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার এবং এর কোনো একটি মাত্র অং একজন শিক্ষার্থী তার জীবনে সংগ্রহ করতে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ে। স্বাভাবিকভাবে খুব যুক্তিসঙ্গত কিন্তু হল শিক্ষার্থীকে তথ্যভাণ্ডার থেকে শুধু জ্ঞান নয়, বরঞ্চ কীভাবে তথ্যকে অর্জন বা সংগ্রহ করে, তাকে বিশ্লেষণ করে এবং উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কাজে লাগাতে হয় তাই শেখানো দরকার। চিন্তনমূলক শিক্ষণ সেই কাজটি করে। সমস্য সমাধান এই স্তরে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সমস্যাকে সমাধান করতে পারবে, সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারবে, আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে পারবে তাই-ই চিন্তনমূলক শিক্ষণে সম্ভব হয়।

(৭) **শিখন সঞ্চালনের ক্ষেত্রপ্রস্তুত :** কোনো একটি পাঠ্যবিষয় তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি বিষয় কার্যত আরও অন্যান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এজন্য interdisciplinary approach আজ সর্বত্র গৃহীত হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে শিখন সঞ্চালন। চিন্তনমূলক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের এই শিখন সঞ্চালনের ক্ষমতাকে বিকশিত করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এর ফলে বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখনকে কাজে লাগিয়ে তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত, বৃত্তিসংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন করতে পারে।

১.৪.৩.৬ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Reflective Teaching) :

চিন্তনমূলক শিক্ষণের বেশ কতকগুলি অসুবিধা বা ত্রুটি লক্ষ করা যায়। সেগুলি হল—

(১) এই ধরনের শিক্ষণ সব রকম শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়। যে সব শিক্ষার্থীরা অপরিণত, যাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ পর্যাপ্ত হয়নি তাদের জন্য এই শিক্ষণ পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকরী নয়। আবার এই চিন্তনমূলক শিক্ষণ উন্নত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উপযোগী হলেও ধীরগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এমনকি সাধারণ মানের মাঝারিবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী নয়।

(২) চিন্তনমূলক শিক্ষণ সংগঠিত হয় একটি নমনীয় পথে। এই নমনীয় পথে অগ্রসর হয়ে শিক্ষার প্রথাগত পাঠক্রম ছাড়াই বা পাঠ্যবিষয়বস্তুর অভাবে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়বস্তু জ্ঞানার্জনে এবং উপলব্ধিতে সক্ষম হয় না।

(৩) সুগঠিত পরিকল্পিত শিক্ষণ শিখন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই শিক্ষার্থীরা যেভাবে স্বাধীনতা নিয়ে এবং নমনীয় পথে অগ্রসর হয় তাতে বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঘটনা বা তথ্যের আবিষ্কার, ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারণা এবং অর্থহীন অনুসন্ধান অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের সময় ও শক্তি ব্যয়ের নামান্তরে পর্যবসিত হয়।

(৪) বিদ্যালয়ের সবধরনের বিষয়গত শিখনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক দিক থেকে এই ধরনের শিক্ষণের ক্ষেত্রটির সীমাবদ্ধতা আছে। যে সব বিষয়ে আবিষ্কার এবং সমস্যা সমাধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যায় সেই সমস্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলিতে তা সম্ভব নয়। আবার বিদ্যালয়ের সময় তালিকা মেনে এই শিক্ষণ কর্মসূচি অনুসরণ বা পরিচালনা ও যথেষ্ট অসুবিধাজনক।

(৫) চিন্তনমূলক শিক্ষণ সংগঠিত করার জন্য যে ধরনের উন্নত মেধাসম্পন্ন, পরিণতমনস্ক এবং কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের প্রয়োজন তার যথেষ্ট অভাব আছে। বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ শিক্ষক ছাড়া কখনোই এই ধরনের শিক্ষণ পরিচালনা সম্ভব নয়।

❑ ১.৪.৪ নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching) :

পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠীজীবনের নিকট একটি বড় সমস্যা হল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পারদর্শীতায় ব্যর্থতা। এই সমস্যা কম-বেশি প্রায় সর্বত্র। পিতা মাতারা বুঝে উঠতেই পারছেন না যে, কেন তাদের সন্তানরা বিদ্যালয়ে পারদর্শীতায় সফল হতে পারছে না। এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পেতে তারা ব্যর্থ। পিতামাতারা যেমন এই সমস্যার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না, তেমনই শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে। কিন্তু কার্যত এই সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে কেউই সেইভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন।

অন্যদিকে বেচারা শিশুটি বাকরুদ্ধ। সে জানে না, কেন তার পিতা মাতা এতটা উদ্বিগ্ন আর হতাশাগ্রস্ত। এই শিশুটির নিকট পরিস্থিতির সম্পূর্ণটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই পরিস্থিতিতে পিতা মাতা সাহায্যের প্রত্যাশায় প্রায় দিশাহারা, কখনো তারা পরিবর্তন করছেন নির্দেশনার মাধ্যম যেমন ইংরেজি থেকে বাংলা কিংবা বাংলা থেকে ইংরেজিতে, কখনো পরিবর্তন করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার কখনো বা বাসস্থান। এমনটি অতিরিক্ত টিউশন কিংবা পড়ার সময় বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে এগুলি কোন সমাধান নয়। বস্তুত বেশিরভাগ শিক্ষক শিক্ষিকার মত হল যে, শিক্ষার্থীরা সকলেই এক নয়। যাই হোক, শিক্ষক- শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করেছেন :

(i) শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবিষয় বস্তুর দিক থেকে।

(ii) ব্যবহৃত মূল্যায়ন কৌশল বা যন্ত্রের প্রকৃতির দিক থেকে।

(iii) নির্ধারিত পারদর্শিতার দিকগুলির দিক থেকে।

(iv) ব্যবহৃত নির্দেশনার কৌশলগত দিক থেকে।

প্রকৃত পক্ষে একজন শিক্ষার্থীর পোশাক যেমন অন্যজনের ক্ষেত্র গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি শ্রেণিকক্ষে একটিমাত্র উপায় বা ব্যবস্থা সকলের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না কারণ বেশ কিছু শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিখন সমস্যা থেকেই যায়।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

❖ ১.৪.৪.১ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা (Specific Problems of Learners)

আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল শিক্ষার্থীদের জীবনে সাফল্যের বিষয়টি শিক্ষার্থী
শিখনে যে সমস্ত দিকগুলিতে দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল— পঠন (reading
লিখন (Writing) এবং গণিত (mathematics) বিষয়ে। মাঝারি থেকে উন্নত বুদ্ধি সম্প
হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় এই সব শিক্ষার্থীরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতা যথে
কম বা ধীরগতি সম্পন্ন। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি সমস্যাকে দায়ী করা যেতে পারে। এ
শ্রেণিকক্ষে একই শিক্ষকের চিহ্নিত করেছেন—

যেমন— (i) নিম্নস্তরের বৌদ্ধিক ক্রিয়া এবং বিলম্বিত বিকাশ।

(ii) দৃষ্টিশক্তি জনিত বা দেখার সমস্যা,

(iii) শোনা এবং কথা বলাতে সমস্যা।

(iv) গমন অঙ্গের সমস্যা।

(v) মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ায় সমস্যা,

যেমন- প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, স্মৃতি, চেষ্টায়-দর্শন সংক্রান্ত সমস্যা।

উপরোক্ত সমস্যামূলক দিকগুলির ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয় পঠনে সমস্যা, লিখনে
সমস্যা, বানানে সমস্যা এবং গণিত বিষয়ে সমস্যা। এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের বিশে
বা শিখন ক্ষেত্রে পঠন, লিখন এবং গণিতের সমস্যাগুলিকে আলোচনা করবো। শিক্ষার্থীদে
শিখনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে একদিকে গৃহপরিবেশ বা পরিবার এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান গ
পরিবেশ বা বিদ্যালয় সংক্রান্ত দিকগুলি দায়ী। এই সমস্ত দিকগুলি হল নিম্নরূপ–

গৃহপরিবেশগত দিকগুলি হল—

(i) পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা এবং যত্নের অভাব।

(ii) পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট গ্রহণ যোগ্যতার অভাব।

(iv) শিখনের জন্য সুযোগ অভাব (বিশেষত, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী),

(v) শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে ভ্রান্তনীতি ও উপায় সমূহ ইত্যাদি।

বিদ্যালয় সংক্রান্ত দিকগুলি হল—

(i) শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষকের গ্রহণ যোগ্যতার অভাব এবং শিক্ষার্থীদের শিখন পারদর্শিত
নিয়ে স্বল্প প্রত্যাশা।

(ii) শ্রেণিকক্ষের প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ সামাজিক এবং শিক্ষকদের স্বল্প মিথস্ক্রিয়া।

(iii) সহপাঠীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার অভাব।

(iv) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সমস্যা পূরণে উন্নত গুণমানের শিক্ষণ পদ্ধতি
অভাব।

(v) শ্রেণিতে সঙ্গতি বিধানের সমস্যা এবং ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার অভাব ইত্যাদি।

এটা দেখা গেছে যে, শতকরা চার ভাগ শিক্ষার্থীর কিছু শিখন সমস্যা বিভিন্নভাবে
আসে। কিন্তু যদি বিশেষধর্মী ক্ষমতা সম্পন্ন বা ভিন্ন ধর্মী ক্ষমতা সম্পন্ন (Specially
challenged children / differntly abled children) শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এই
শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে হবে শতকরা কুড়ি ভাগ (২০%)। পারদর্শিতার একটি বিশেষ স্তর
পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্তরের শিক্ষার্থী ধরা হয়, কিন্তু তার নীচের স্তরের শিক্ষার্থীদের
ধরা হয় প্রতিবন্ধী বা অক্ষম হিসাবে। গড় পারদর্শিতার নীচের স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য
সংশোধনমূলক শিখনের প্রয়োজন হয়।

নির্দিষ্ট শিখন সমস্যার প্রকারভেদ (Types of specific learning problems) :
সাধারণত শ্রেণিতে নির্দিষ্ট শিখন সমস্যাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা নিম্নমানের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে।
এদের বলা হয় নিম্ন পারদর্শি শিক্ষার্থী (under achiever)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণ মানের
অথবা মাঝারিদের তুলনায় উচ্চমানের হয়। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের ছয়টি ভাগে ভাগ করা
যায় (otto. et al. ১৯৭৩)। এরা হল নিম্নরূপ—

(i) মাঝারি বা গড় মানের ক্ষমতা সম্পন্ন এবং নিম্নপারদর্শিতা সম্পন্ন

(ii) ধীরগতি শিখন সম্পন্ন

(iii) উজ্জ্বল কিন্তু নিম্ন পারদর্শিতা সম্পন্ন

(iv) অনিচ্ছুক বা অনাগ্রহী শিক্ষার্থী

(v) সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী

(vi) স্বল্প ভাষা বিকাশ সম্পন্ন শিশু।

(i) মাঝারি মানের বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের বয়স অনুসারে তাদের কাছ থেকে মাঝারি মানের পারদর্শিতা প্রত্যাশা করা হয়, কিন্তু যারা তা পারে না তাদের বলা হয় নিম্ন পারদর্শিতা সম্পন্ন। ব্যর্থতার কারণে এই স্তরের শিশুরা ক্রমশ হতাশায় ভুগতে ভুগতে প্রাক্ষোভিক সমস্যার শিকার হয় যা তাদের শিখনে সমস্যা তৈরি করে এবং পরিবর্তে ব্যর্থতাকে ডেকে আনে।

(ii) যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে, সাধারণত তারা ধীরগতি শিখন সম্পন্ন হিসাবে পরিচিতি পায়। কিন্তু কখনো কখনো ৯০ থেকে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পন্ন শিশুরা ৮০ থেকে ৯০ বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট শিশুদের মত আচরণ করে। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার।

(iii) উজ্জ্বল কিন্তু নিম্ন পারদর্শিতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উচ্চ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মাঝারি স্তর হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এরা পারদর্শিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নিম্নমানের হয়। এদের প্রতিও শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

(iv) কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা বিদ্যালয়ে পড়াশোনায় খুব একটা ইচ্ছুক হয় না। পড়াশোনায় অনাগ্রাহী এই সব শিশুরা অন্যান্য অভীক্ষায় ঠিক ঠিক সাড়া দিলেও বিদ্যালয়ে অভীক্ষায়

Scanned with CamScanner

পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের সাধারণত প্রেষণার অভাব থাকে। এদের প্রেষণা বাড়ানোর দরকার।

(v) কখনো কখনো এমন সব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে যাদের বাড়ীর পরিবেশ অত্যন্ত সাধারণমানের এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশও খুব সীমিত স্তরে অবস্থান করে। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে তারা অনেক সময় মানিয়ে নিতে পারে না। সাধারণ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী দের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এদের প্রতিও বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার।

(vi) এমন কিছু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে যাদের পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশ অন্য সাধারণ মানের জন্মগত বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাষাবিকাশ থাকে সীমিত। ফলে যে সমস্ত বিষয়ে ভাষার দখল থাকা দরকার সেই সমস্ত বিষয়গুলিতে পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। শ্রেণিকক্ষের ভিতর এবং বাইরেও এই ধরনের শিশুদের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার।

সাধারণত, শিখন অক্ষমতাকে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন— তথ্য সংগ্রহের অক্ষমতা অথবা সংগ্রহের অভাবজনিত কারণে বিশেষ অক্ষমতা। সেদিক থেকে অক্ষমতা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত—

(i) তথ্য সংগ্রহে অভাব বা দুর্বলতা (Information Processing Deficiencies)
(ii) মনোযোগের অভাব অথবা অতি চঞ্চলতা (Attention Deficit or Hyperactivity Disorder)
(iii) গণিতে অক্ষমতা (Discalculia)
(iv) লিখনে অক্ষমতা (Disgraphia)
(v) পঠনে অক্ষমতা (Dyslexia)
(vi) চিন্তনে অক্ষমতা (Dyspraxia)
(vii) আত্মমগ্নতা (Autism)

(i) **তথ্য সংগ্রহে অভাব বা দুর্বলতা :** তথ্য সংগ্রহের কাজটি সম্পূর্ণ হয় চারটি পর্যায়ে যেমন– ইনপুট বা প্রবেশ, ইনটেগ্রেশান বা সমন্বয় বা সংহতিকরণ, স্টোরেজ বা সঞ্চয় এবং আউটপুট বা প্রকাশ বা ফলাফল প্রাপ্তি। সংবেদনের মাধ্যমে তথ্যের ইনপুট বা প্রবেশ সম্পন্ন হয়। ইনপুটের ক্ষেত্রে দর্শন প্রত্যক্ষণে অসুবিধা ঘটলে বস্তুর আকার, অবস্থান এবং আয়তনগত সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয় আবার শ্রবণ প্রত্যক্ষণের অসুবিধার কারণে শব্দের সম্পূর্ণ শ্রবণ সম্ভব হয় না বা শোনার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। স্বাভাবিকভাবে যেসব শিক্ষার্থীদের এইভাবে তথ্য সংগ্রহের অসুবিধার ফলে অনুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উদ্ভব ঘটে।

তথ্যের সংহতিকরণ বা integration এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যা থাকলে সঠিকভাবে কোনো বক্তব্য বা গল্পকে সূত্রিত করে, উপস্থাপন করতে সমর্থ হয় না, বিভিন্ন তথ্যকে ঠিক ঠিক স্মরণ করতে সমর্থ হয় না। নতুন কোনো বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারলেও শিখনে সামান্যীকরণ করতে সমর্থ হয় না।

তথ্য সঞ্চয় বা storage এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা থাকলে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত সময়কালীন স্মৃতি, কার্যকরী স্মৃতি অথবা দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে সমস্যা ঘটে। বেশিরভাগ স্মৃতির সমস্যা সংক্ষিপ্ত সময়কালীন স্মৃতিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তথ্যের ফলাফল প্রাপ্তি বা প্রকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ে যখন ভাব প্রকাশ বা ভাষাগত প্রকাশ ঠিকমত হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কথাবলার ভাষায়, লেখার ভাষায় অথবা চেষ্টায় ক্ষমতায় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(ii) **মনোযোগের অভাব :** এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্নায়ুশরীর বৃত্তীয় কিছু বিশৃঙ্খলার মস্তিষ্কের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে যেগুলি উদ্দীপনার নিয়ন্ত্রণ এবং মনোযোগকে পরিচালিত করে।

(iii) **গণিতে অক্ষমতা :** এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গণিতে দক্ষতার অভাব ঘটে যার ফলে গণিতে অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

(iv) **লিখনে অক্ষমতা :** লিখনে অক্ষমতা হল শিক্ষার্থীদের অন্যতম স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা যা লিখনেকে প্রভাবিত করে এবং লেখার ক্ষেত্রে শারীরিক দিককে অসুবিধায় ফেলে। এদের লিখন ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হল অপরিনত অক্ষরের প্রকাশ, বাঁকা লাইনে লেখা, অসম্পূর্ণ শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা এবং হাতের লেখা পঠন যোগ্য না হওয়া। লেখার ক্ষেত্রে এরা অনীহা প্রকাশ করে।

(v) **পঠনে অক্ষমতা :** এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠনে অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। মুদ্রিত ভাষা পাঠ করার ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়ে এরা। ভুল উচ্চারণ করে, কিংবা ধীরে ধীরে পড়া, অথবা ত্রুটিপূর্ণ পড়া বা ঠেকে ঠেকে পড়ার মাধ্যমে এদের অক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।

(vi) **চিন্তনে অক্ষমতা :** এই ধরনের সমস্যাটি মূলত মস্তিষ্কের স্বল্প বা অপরিণত বিকাশের ফলশ্রুতি। এই সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের শারীরিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সুনিয়ন্ত্রিত প্রভাব থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীদের বেশি কিছু সমস্যায় পড়তে হয়, যেমন– দাঁত ব্রাশ করা, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদি।

(vii) **আত্মমগ্নতা :** এই সমস্যাটি ঠিক কোনো রোগ নয়, কিন্তু মস্তিষ্কের কাঠাবলির বিকাশগত বিশৃঙ্খলা। শৈশবের প্রথম তিন বছর মধ্যেই এর প্রকাশ ঘটে এবং সারা জীবনে ধরে তা এগিয়ে চলে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে এর প্রকাশ ঘটে প্রায় চারগুণ।

Scanned with CamScanner

পৃথিবীর প্রায় সব জাতির মানুষ এবং সবরকম সামাজিক পটভূমিকায় একে ঘটতে দেখা যায়।

❖ ১.৪.৪.২ নিরাময়কারী শিক্ষার অর্থ (Meaning of Remedial Education) :

Merriam - Webster's Medical Dictionary (2002 Merriam - Webster Inc) এর মতানুসারে 'Remedial' এর অর্থ হল নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বা নিরাময় প্রদানের জন্য নিরাময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মন্দ বিষয় বা বস্তু দূরীকরণ অথবা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একজন এর দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো।

Webster's Revised Unbri dged Dictionary (1998, MICRA Inc) Remedial Education কে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : "Programms that are designed to develop specific cognitive skills, usually in the languages arts and mathematics from a dificient level to one that is appropriate to the educational level and aspirations of a particulare students Diagnostic testing to determine. The nature and extent of the problem may also be included.

কিন্তু 'Merriam Webster's Medical Dictionary' (2002 Merriam Webster, Inc.) শব্দটিকে ব্যাখ্যা করছেন একটু অন্যরকম ভাবে—

"As for as Remedial Education is concerned, the learning difficulties or disabilities could be categorized so as children are streamed and taught in these remedial classes in order to help them overcome their difficulties and improve the educational output. আবার Merraiam - Webster's Dictionary of Law (1996 Merriam - webster, Inc) Remedial Education প্রসঙ্গে মত দিয়েছেন এইভাবে : "Education helping to improve skills : designed to help people with lear ning difficulties to improve their skills or knowledge, or relating to education designed to do this."

Farrant (1994) এর মতানুসারে, : "Remedial Education is any programme of teaching which has reasonable chance of restoring to normal the educational performance of children whole progress has been adversely affected by environmental factors" (Farrant, J.S. 1994).

Farrant, চিকিৎসক এবং নিরাময় কারী শিক্ষকের কাজের মধ্যে তুলনা করে বলেছেন, শিক্ষক চিকিৎসকের মতই একইভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত আঘাতকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন নিম্নলিখিত ভাবে—

(i) শিক্ষার্থী তার শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে নাকি শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, তার বিস্তার এবং গভীরতাকে চিহ্নিত করেন।

(ii) শিক্ষার্থীর বাড়ীর পরিবেশ, তার স্বাস্থ্য, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক

ক্ষমতাকে খুব যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষার্থীর সমস্ত রেকর্ড অনুসন্ধান করে সমস্যার কারণগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

(iii) কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দুর্বলতার প্রকৃতি এবং পশ্চাদপদতার মাত্রাকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে তুলে ধরতে আদর্শায়িত দুর্বলতা নির্ণায়ক অভীক্ষা (Standing ardised diagnostic test) এবং পারদর্শিতার অভীক্ষা (achievement test) গুলি ব্যবহার করেন।

(iv) শিক্ষার্থীর পশ্চাদপদতা ঘটানোর জন্য দায়ী বিষয়গুলি যাতে তার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পুনরায় প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তারজন্য সংশোধন মূলক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে করার চেষ্টা করেন।

(v) দুর্বল শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা সম্ভব তার জন্য চেষ্টা করা হয়।

সুতরাং Remedial Education কে বলা যেতে পারে, বিশেষ ধনের শ্রেণিশিক্ষা বা শিক্ষণ কৌশল যার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর শিখনে অসুবিধাগুলিকে দূর করে। নিরাময়ের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্বাভাবিক দক্ষতা সম্পন্ন শিশুদের সমকক্ষ হতে পারে।

শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে নিরাময়কারী শিক্ষা (Remedial Education) এবং শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) দু'টি শব্দ একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) বলতে বোঝায় একটি দলবদ্ধ বিশৃঙ্খল অবস্থা যা একটি বিস্মৃত শিক্ষাগত দিক এবং যা শিক্ষার্থীর কথা বলা, শোনা, পড়া, লেখা, বানান, যুক্তি প্রদান এবং সংগঠিত তথ্যসহ কার্যকরী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রকে নেতিবাচক প্রভাবিত করে। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার যে, শিখন অক্ষমতা নিম্নস্তরের বুদ্ধিমত্তাকে নির্দেশ করে না। শিক্ষার্থীদের শিখন অক্ষমতার মধ্যে বিশেষ কিছু অসুবিধা থাকে যা তাদের বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।

❖ ১.৪.৪.৩ শিখন অক্ষমতা এবং নিরাময়কারী শিক্ষা (Learning Disabilities and Remedial Education) :

সংশোধনীমূলক শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার যে কাদের জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন, কেননা অনেকের ধারনা বিশেষ প্রতিবন্ধী শিশুদের বা শিক্ষার্থীদের জন্যই এই শিক্ষা। এমন অনেক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যারা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হলেও শিক্ষার প্রথম জীবনে শিখন অক্ষমতার শিকার ছিলেন। সংশোধনীমূলক শিক্ষার প্রয়োজন হয় সেইসব শিক্ষার্থীদের যাদের শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ অক্ষমতা থাকে। বিশেষ ভাবে শিক্ষাগত সাহায্য দিয়ে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা

Scanned with CamScanner

দরকার কখনো কখনো দেখা যায় যে, নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching) ও বিকাশমূলক অথবা সংশোধনমূলক শিক্ষণ (Developmental or Corrective Teaching) এর মধ্যে পৃথক করতে পারেন না অনেকেই। অথচ এই শব্দ দুটির অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা ও শিক্ষার্থীরাও দুটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শিখন অক্ষমতার একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : "The term 'specific learning disability' means a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using language, spoken or written, that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or to do mathematical calculations. The term includes such conditions as perceptual disabilities, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia and developmental aphasia. The term does not apply to children who have learning problems that are primarily the result of visual, hearing or motor disabilities of mental retardation, of emotional disturbance, or of environmental, cultural, or economic disadvantages."

কিন্তু ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে Federal Register শিখন অক্ষমতার যে পরিবর্তিত সংজ্ঞা সুপারিশ করেছেন তা হল, এই রকম : ".....a severe discrepacy between achievement and intellectual ability in one or more of the areas : 1) oral expression; 2) listening comprehension; 3) written expression; 4) basic reading skill; 5) reading comprehension; 6) mathematics calculation; or 7) mathematics reasoning. The child may not be identified as having a specific learning disability if the discrepancy between ability and achievement is primarily the result of : 1) a visual, hearing, or motor handicap; 2) mental retendation, 3) emotional disturbance, or 4) environmental, cultural, or economic disadvantages." (USOE, 1977)

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনাতে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, 'Remedial Education' এর সঙ্গে 'Learning Disability' ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে US Department of education office of special Education Programme (OSEP) একটা সংজ্ঞা প্রদান করে। সেটি হল : "The central concept of specific learning Disability involves disorders of learning and cognition that are intrinsoc to the individual. Specific learning Disability are specific in the sense that these disorders are significantly affect a relatively narrow range of academic and performance outcomes. Specific Learning Disability may occur in combination with disabling conditions, but they are not due primarity to other conditions, such as mental retardation, behavioural disturbance, lack of opportunitics to learn, or primary sensory defects."

ব্যক্তিগত প্রভাবে পশ্চাদপদতার জন্য দুই ধরনের নিরাময়কারী শিক্ষা (Remedial Education) হতে পারে :

(১) যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে শিখন অক্ষমতা আছে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো বা বিকাশ সাধন করা।

(২) যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের এক বা একাধিক মৌলিক মানসিক ক্রিয়াগুলি যেমন প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, স্মরণক্রিয়া এবং অন্যান্য বৌদ্ধিক ক্রিয়ার (পঠন, লিখন, গণিত) ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে তাদের মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়ায় নিরাময় সাধন।

❖ ১.৪.৪.৪ নির্দিষ্ট পশ্চাদপদতা এবং শিখন অক্ষমতার বিভিন্ন লক্ষণ (Specific Backward ness and different warning signs of learning disabilities) :

শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে যে কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এই অংশে তিনটি বিশেষ দিকে শিক্ষার্থীদের পশ্চাদপদতার সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। পঠন, লিখন এবং গণিত সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অক্ষমতার কারণগুলিকে জানার চেষ্টা করবো। এই কারণগুলি জানতে পারলে শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের নিরাময় মূলক। শিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনাও করা থাকে।

শিখন অক্ষমতার কারণগুলিকে এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে জানা সম্ভব হয়নি, যদিও এটা মনে করা হয় যে, শিক্ষার্থীরা মৌলিক শিখনের ভ্রান্ত প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি (Cohen, 2007)। যদি একে প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই সব শিক্ষার্থীদের নিরাময়কামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবে যথেষ্ট সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিখন অক্ষমতার নিম্নলিখিত কয়টি দিক সম্পর্কে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সচেতন থাকতে হবে। সেগুলি হল–

(১) শিক্ষার্থীর পঠনে অসুবিধা থাকে।

(২) শ্রেণি শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থী সামনাসামনি পঠনে অনিচ্ছুক থাকে বা অনীহা দেখায়।

(৩) শিক্ষকে মৌখিক অথবা লিখিত নির্দেশ উপলব্ধিতে শিক্ষার্থীর অসুবিধা থাকে।

(৪) পঠন অথবা লিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রায়শই অক্ষর বাদ দিয়ে যায়।

(৫) বোর্ডের কোনো লিখিত বিষয়কে নিজের খাতায় লিখতে অসুবিধাবোধ করে।

(৬) গনিতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৭) এমন অনেক সময় প্রশ্ন করে যেগুলির উত্তর পূর্বেই শ্রেণিকক্ষে আলোচিত হয়েছে।

(৮) নিজে নিজে কোনা কাজ করতে প্রচণ্ড অসুবিধা বোধ করে এবং পরনির্ভরশীলতার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

(৯) শ্রেণিতে সচরাচর কোনো সহযোগিতা করে না এবং কোনো প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারে না।

Scanned with CamScanner

(১০) কোনো বস্তুর নাম বলতে বা কোনো শব্দ খুঁজতে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে।

● **(ক) পঠনে অক্ষমতা (Reading Disability) :**

অনেক মনোবিজ্ঞানী পঠন অক্ষমতা বা Reading Disability কে 'Dyslexa' শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃত পক্ষে Dyslexia শব্দটির দ্বারা মারাত্মক রকমের পঠন অক্ষমতা বোঝায়। কিন্তু সমস্ত শিক্ষার্থীই যাদের শিখন অক্ষমতা আছে, তাদের সকলেই মারাত্মক পঠন অক্ষমতায় আক্রান্ত নয়। এটি কোনো শারীরিক অক্ষমতা নয়, শারীরিক সমস্যার কারনে এটির উৎপত্তি হয় না। এই ধরনের সমস্যায় থাকে মস্তিষ্কে তথা সংগ্রহণ প্রক্রিয়া করনের ব্যক্তিগত সমস্যা।

পঠন অক্ষমতাকে Robinovitch (১৯৬২) এবং Kolson ও তাঁর সহযোগিরা (১৯৮৩) দুটি ভাগে ভাগ করেছেন— (১) মারাত্মক অক্ষমতা এবং (২) স্বল্প অক্ষমতা otto (১৯৭৩) পঠন অক্ষমতাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন : (১) প্রাথমিক অক্ষমতা (Primary disability) এবং গৌন অক্ষমতা (Secondary disability)।

প্রাথমিক অক্ষমতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য হল—

(১) শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বুদ্ধি থাকে,

(২) বানান, পঠন এবং গণিতে দক্ষতা খুব কম।

(৩) শোনা ও দেখার ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা খুব কম।

(৪) দর্শন সংক্রান্ত স্মৃতি খুব দুর্বল এবং শব্দগুলির পঠনে ভীষণ দুর্বল।

(৫) পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলির বিন্যাস অদল-বদল ঘটায় যেমন— was এর স্থানে saw, on এর স্থানে no; d এর স্থানে b ইত্যাদি।

(৬) প্রাক্ষোভিক সমস্যা থাকে,

(৭) কোনো শারীরিক বা দৃষ্টিশক্তি জনিত দুর্বলতা থাকে না,

(৮) জন্মগত ট্রমা (birth trauma) অথবা মস্তিষ্কে আঘাত জনিত ইতিহাস থাকে।

Ott মাধ্যমিক অক্ষমতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত কতকগুলি দিক উল্লেখ করেছেন :

(১) পরিবেশগত, শিক্ষাগত, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক সমস্যা থাকে।

(২) প্রেষণার যথেষ্ট অভাব থাকে।

(৩) বৌদ্ধিক ক্ষমতার থাকে সীমাবদ্ধ।

(৪) বিভিন্ন প্রাক্ষোভিক সমস্যা থাকে, যেমন— উদ্বেগ (anxiety), বিষন্নতা (depression) ইত্যাদি।

পঠনে অক্ষমতার কারণ (Causes of Reading Disability) :

পঠন অক্ষমতার বৃদ্ধি পত্রায় কতকগুলি কারনে। মৌলিক পঠন ক্ষমতার অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বেশি কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এগুলিকে সমিলিত ভাবে বলা হয় পঠন প্রস্তুতি। পঠন অক্ষমতার কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) **প্রাক্ পঠন দক্ষতার অভাব :** পঠনের জন্য যদি কিছু পূর্ব প্রস্তুতি না থাকে, তবে পঠন অক্ষমতার সব সময় সম্ভাবনা থেকে যায়। পঠন অক্ষমতার জন্য কিছু গবেষক শিক্ষার্থীর দেখা, শোনা অনুভূতি এবং বয়সকে দায়ী করেছেন। যেহেতু শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণ নামক জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সাক্ষিষ্ট অনুভূতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে তাই এগুলি পঠনে প্রস্তুতিতে সহায়তা করে থাকে। ফলে সেই অনুভূতি ঠিক ঠিক না হলে পঠন অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীর বয়সও শিক্ষার্থীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজের সমন্বয় ও পরিনতিতে সহায়তা করে থাকে এজন্য উপযুক্ত বয়স ছাড়া পঠন দক্ষতা সম্ভব নয়। Venezky (১৯৮০) এবং Spachi (১৯৮১) প্রাক্ পঠন দক্ষতার অভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

(২) **শিক্ষার্থীর বয়স :** কিছু গবেষক শিক্ষার্থীর বয়সকে পঠন প্রস্তুতির বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে আরোপ করেছেন। Morphett এবং Wash burne বলেছেন বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর ৬.৫ বছর বয়সে পঠনে অগ্রগতি দেখায়।

(৩) **পঠনে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব :** পঠনের জন্য যে সমস্ত দক্ষতার দরকার সেগুলি যদি শ্রেণিশিক্ষন, নিরাময়কারী শিক্ষণ অথবা বিশেষ ব্যক্তিগত শিক্ষণে অর্জিত না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতার অভাব দূর হয় না।

(৪) **পঠন সংক্রান্ত শিখনে পূর্ববর্তী ক্ষমতার অভাব :** পঠন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষালাভের আগে শিক্ষার্থীদের কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকা দরকার। যেহেতু সেগুলি পঠন দক্ষতার তুলনায় একদিকে যেমন অনেক বেশি মৌলিক তেমনি অন্যদিকে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তাও করে থাকে। এই সমস্ত পূর্ববর্তী ক্ষমতার অভাবে পঠন দক্ষতা গড়ে উঠতে পারে না।

(৫) **পঠন সংক্রান্ত নির্দেশনায় সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি :** অনেক শিক্ষার্থী বাচনিক ক্ষমতা, পঠনে সাংকেতিক ক্ষমতা যথেষ্ট না হওয়ায় তারা পঠনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

(৬) **সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত চেষ্টীয় দক্ষতার অভাব :** শিখন বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সংবেদন ও প্রত্যক্ষন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে। এগুলির অভাবে স্বাভাবিকভাবেই পঠনে অক্ষমতা দেখা যায়।

পঠন অক্ষমতার নির্ণয় বা চিহ্নিতকরণ (Diagnosis of Reading Disability) :

বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পঠন অক্ষমতার দেখা যায়। পঠন অক্ষমতা এই বৈচিত্র্যের কারণে নির্ণায়ক দৃষ্টিভঙ্গী (diagnostic - prescriptive approach) কে বিবেচনা করে শিক্ষার্থীকে একেবারে ব্যক্তিগত স্তরে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। নিম্নলিখিত নির্ণায়ক দিকগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

Scanned with CamScanner

(১) সমীক্ষা স্তরে নির্ণয় (Survey Level of Diagnosis)
(২) নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় (Specific Level of Diagnosis)
(৩) নিবিড় স্তরে নির্ণয় (Intensive Level of Diagnosis)

নিম্নে এইসমস্ত স্তরের নির্ণয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) **সমীক্ষা স্তরে নির্ণয় :** শিক্ষার্থীর পঠন অক্ষমতার নির্ণয় এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপস্থিতিকে পরীক্ষা করেন এইজন্য—

(ক) শিক্ষণ প্রোগ্রামএর সাফল্য পরীক্ষা করার জন্য

(খ) যেখানে শিক্ষার্থীর মনোযোগ (একক/দলগত) দরকার, সেই ক্ষেত্রকে স্থির করার জন্য;

(গ) ব্যক্তি শিক্ষার্থী যার সমস্যা নির্ণয় করার দক্ষর হয় তাকে চিহ্নিত করার জন্য পঠন অক্ষমতা নির্ণয় এর জন্য যে সমস্ত তথ্য ও তাদের উৎস সংগ্রহ করতে হয় তার জন্য পঠন অক্ষমতা সমীক্ষাধর্মী অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঠন অক্ষমতা নির্ণয় এর জন্য নির্ণায়ক অভীক্ষার প্রয়োগ হয়। যেমন—

(i) The Primary - I Battery (Grade - I)
(ii) The Primary - II Battery (Grade - II),
(iii) The elementary Rediny (Grade - 3 & 4)
(iv) Intermediate Reading (Grade - 5 & 6)
(v) Advance Reading (Grade - 7 & 8)
(vi) Diagnostic Reading Test)
(viii) Surveny section, the stanford Reading Test (Reviseded)

(২) **নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতাকে জানার প্রয়োজন হয়। এইভাবে মানসিক ক্ষমতাকে জানার জন্য ব্যবহার করা হয় নিম্নলিখিত অভীক্ষাসমূহ—

(i) Stanford - Binet Intelligence Scale (New Edition),
(ii) The Wechsler Intelligence Scale for Children,
(iii) Full Range of Picture Vocabulary Test,
(iv) The Quick Test ইত্যাদি। এছাড়াও আছে—

Standardised reading test যেমন—

(i) The Silent Reading Diagnostic Tests,
(ii) Word Recognition Tests,
(iii) General Word Elements ইত্যাদি।

(৩) **নিবিড় স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরের এর প্রয়োগ দেখা যায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যখন শিক্ষার্থীরা শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় অথবা উভয়েই সমষ্টিগত সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের

মধ্যে মারাত্মক রকমের পঠন সমস্যা বা পঠন অক্ষমতা দেখা দেয়। যখন সব রকম নিরাময়কারী শিক্ষা বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন নিরাময়কারী শিক্ষক সমস্ত রকম অভীক্ষা প্রয়োগ করেন। সেখানেও ব্যর্থ হলে তিনি বাধ্য হয়ে এই ক্ষেত্রের বা field এর বিশেষজ্ঞের সমস্যার কারণগুলির গভীরতা জানার প্রয়োজন হয়।

পঠন অক্ষমতায় নিরাময়কারী শিক্ষণে শিক্ষকের কার্যাবলী (Functions of the Teacher in Remedial Teaching) : শিক্ষার্থীর পঠন অক্ষমতা নির্ণয় বা নির্ধারণ করার পর শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর যথাযথ নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যা ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাময়কারী শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হয়। নিম্নলিখিত কার্যাবলীর দ্বারা নিরাময়কারী শিক্ষক তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন :

(১) পঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সামগ্রী সরবরাহ করা,
(২) পঠনের পূর্ববর্তী কিছু কৌশল প্রয়োগ করা,
(৩) বড় হরফের ছাপানো সামগ্রী ব্যবহার করা,
(৪) বহুমূখী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পূর্ণ ব্যবস্থা নিয়োজিত করা।
(৫) গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সম্ভার শেখানো।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) **পঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সামগ্রী সরবরাহ করা :** পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত মানের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, তথ্যের প্রাথমিক উৎস, সহায়ক পুস্তক, প্রোগ্রাম লার্নিং ম্যাটেরিয়াল, আধুনিক on line উৎসও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) **পঠনের পূর্ববর্তী কিছু কৌশল প্রয়োগ করা :** পঠনের পূর্বে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর গঠন শেখানো দরকার। সাধারণ, পাঠ্যপুস্তকের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রধান বিষয়-এর উল্লেখ থাকে, পরের অধ্যায়-এর বাক্যগুলিতে থাকে বিস্তৃত বর্ণনা, এবং সবশেষে থাকে সংক্ষিপ্ত সার। শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে বলার আগে কিছু প্রথমিক জ্ঞান দেওয়া দরকার। তাছাড়া পঠন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন, নির্দেশ ও পরামর্শদানের প্রয়োজন। চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে পঠনের বিষয়বস্তুর ফটোগ্রাফ, স্থূলাক্ষর বিশিষ্ট শব্দার্থ, শিরোনাম, উল্লেখযোগ্য শব্দ পরীক্ষা করার মাধ্যমে পঠনের উপযোগী প্রস্তুতিতে উৎসাহিত করা দরকার।

(৩) **বড় হরফের ছাপানো সামগ্রী ব্যবহার করা :** শিক্ষার্থীদের যেখানে যতখানি সম্ভব বড়ো বড়ো ছাপানো সামগ্রী ব্যবহার করা দরকার।

(৪) **বহুমূখী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পূর্ণ ব্যবস্থা নিয়োজিত করা :** আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যুগে অন্যান্য দিকগুলির মত শিখনকেও প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারনা। এইসমস্ত বহুমূখী আধুনিক সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়োজিত করা দরকার।

Scanned with CamScanner

(৫) **গুরুত্ব শব্দভাণ্ডার শেখানো :** নিরাময়কামী শিক্ষার্থীরা যখন পাঠ করে তখ হীনমন্যতার শিখার থাকে প্রায় প্রত্যেকেই। যেহেতু তাদের পূর্ণবর্তী সেই অভিজ্ঞ থাকে। শিক্ষার্থীরা একই শব্দকে বার বার ব্যবহার না করলে সেই হীনমন্যত হতাশার কিছুটা দূর হয়। সেজন্য পঠনের কাজে তাদের অতি প্রয়োজনীয় শব্দ গু শেখানো দরকার।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও নিরাময়কারী শিক্ষক অন্যান্য আরো কিছু ব্যবস্থা গ্র করতে পারেন, সেগুলি হল :

(i) দর্শন ও শ্রবণ সমস্যা আছে এমন শিক্ষার্থীকে খুঁজে বের করা,

(ii) পঠনে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা,

(iii) দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ অভিজ্ঞতা অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা,

(iv) শিক্ষার্থীকে পঠনে মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ইত্যাদি।

(খ) লিখন অক্ষমতা (Writing Disability) : কথা বলার মত লেখার মাধ্যমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। সুতরাং লেখার ক্ষেত্রে যাদের অক্ষমতা বা দুর্বলত দেখা যায়, সেই সব শিক্ষার্থীরা অন্যের সাথে লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষ হয় না।

লিখন অক্ষমতার কারণসমূহ (Causes Writing Disability) : লিখন একটি উচ্চস্তরের জটিল স্নায়বিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে যার মধ্যে অনেকগুলি মস্তিষ্কের ক্রিয়ামূলক দিককে অন্তর্ভূক্ত করে। এর জন্য দরকার হয় যোগাযোগ, বহুমুখী তথ্য প্রক্রিয়াকরম, স্মৃতি, কর্মেন্দ্রিয়ের দক্ষতা, ভাষাগত দক্ষতা, বিকাশমূলক প্রক্রিয়ার উপরো পর্যায়ক্রমিক সংহতি রক্ষিত না হয় বা কার্যকরী লিখনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সংশ্লি দক্ষতাগুলি যখন শিক্ষার্থী অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তখন স্বাভাবিকভা লিখন অক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। Boss এবং Vanghan (২০০২)-এর মতানুসারে মাঝারি স্তরের বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের লিখন অক্ষমতা, তাদের লিখন দক্ষতার অভাবে প্রকা পায়। সাধারণত এইসব শিক্ষার্থীদের কোনো নির্দিষ্ট স্নায়বিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যা অথব অতিরিক্ত উপলব্ধিমূলক চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না।

লিখন অক্ষমতার নির্দেশক বা চিহ্ন (Indicators of Writing Disability) : লিখন অক্ষমতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের লেখায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেগুলির দ্বার লিখন অক্ষমতা বোঝা যায়। এগুলিকে বলা হয় লিখন অক্ষমতার নির্দেশক বা চিহ্ন। লিখন অক্ষমতার এই নির্দেশকগুলির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) হাতের লেখয় অস্পষ্টতা বর্তমান,

(২) অনুলিখন এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ধীর গতি এবং কষ্টসাধ্য অবস্থা বোঝা যায়।

(৩) লেখার সময় শিক্ষার্থীর হাতের অস্বাচ্ছান্দ্য অবস্থা, অনুপযুক্ত দেহভঙ্গি এবং উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা লক্ষ করা যায়।

(৪) লেখার লাইন বাঁকা, হরফে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, ফলে লেখা অনেক ক্ষেত্রে বোধগম্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৫) লেখায় দুটি হরফের মাঝ, দুটি শব্দের মাঝে এবং পৃষ্ঠায় অবসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিক ভঅবে ফাঁক না রাখা এবং ধারাবাহিকতার অভাব থাকে।

(৬) অক্ষর, শব্দ এবং বাক্যে অসম্পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে,

(৭) শব্দ সম্ভারে এবং বাক্যের গঠনে সরলতা,

(৮) লেখার বিষয়বস্তুতে ভাষাগত দক্ষতার প্রতিফলন না হওয়া,

(৯) লেখায় সামগ্রিক সৌন্দর্যবোধের যথেষ্ট অভাব এবং বিরক্তি ছাপ স্পষ্ট।

লিখন অক্ষমতার প্রকারভেদ (Types of Writing Disability) : লিখন অক্ষমতাকে সাধারণ দুইভাগে ভাগ করা যায় :

(১) নির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা (Specific dysgraphia) :

(২) অনির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা (Non-specific dysgraphia)

(১) **নির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা :** এই ধরনের অক্ষমতার সৃষ্টির পেছনে আছে বানান সংক্রান্ত অক্ষমতা, কর্মেন্দ্রিয়ের সমন্বয়মূলক সমস্যা, ভাষাগত দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণ। কর্মেন্দ্রিয়ের সমন্বয়মূলক সমস্যার সঙ্গে অনেক সময় সম্পর্কিত বিষয়গুলি হল শারীরিক গঠনগত সমস্যা, পরিচালন ক্রিয়া, হীনতা, কর্মেন্দ্রিয়ের পরিকল্পনার অভাব, দর্শন ও প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি।

(২) **অনির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা :** অনির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা সৃষ্টি হয় সাধারণত মানসিক ব্যাহত বুদ্ধি; মনস্তাত্ত্বিক বঞ্চনা অথবা বিদ্যালয়ের স্বল্প উপস্থিতির কারনে। কিছু শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত লিখন দক্ষতা অর্জন করতে পারে না কারণ তাদের যথেষ্ট পরিমান লিখিত ভাষায় প্রত্যক্ষ নির্দেশ থাকে না।

Deuel (১৯৯৪) লিখন অক্ষমতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) পঠন অক্ষমতার কারনে লিখন অক্ষমতা (Dyslexic dysgraphia)

(২) চেষ্টীয় আনাড়িপনার কারনে লিখন অক্ষমতা (Dysgraphia due to motor clumsiness)

(৩) স্থান সংক্রান্ত উপলব্ধির ত্রুটির কারনে অক্ষমতা (dysgraphia due to defect in inderstanding of space)

Scanned with CamScanner

লিখন অক্ষমতা নির্ণয় (Diagnosis of Writing Disability) : লিখন অক্ষমতা নির্ণয়ে বিভিন্ন ধরণের কৌশল বা যন্ত্র কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুরি মধ্যে আছে—

(১) প্রসেসিং স্পিড ইনডেকস স্কোরস্ ফ্রম দ্য WISC - IV

(২) ডেভেলপমেন্টল টেস্ট অর্ব ভিসুয়াল-মোটর-ইনটিগ্রেশান,

(৩) বেনেডার - গেস্টাল্ট্।

(৪) জর্ডন লেপট্ রাইট রিভার্সাল টেস্ট ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও বেশু কিছু ভাষামূলক পারদর্শিতা পরিমাপক ব্যবহার করা যায় :

(১) দ্য টেস্ট্ অব্ রিটন্ ল্যাঙ্গুয়েজ,

(২) উডকক্ জনশন সাইকো - এডুকেশনাল ব্যাটারি (থার্ড এডিশন)

(৩) ডায়াগনোস্টিক অ্যাচিভমেন্ট ব্যাটারী থার্ড এডিশান ইত্যাদি।

উপরোক্ত কৌশলগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিভিন্নরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্দেশনা যেগুলি জ্ঞানমূলক ভিত্তি প্রদান করে এবং শিক্ষার্থীর জীবন ইতিহাসকে অন্তর্ভূক্ত করে সেগুলিকেও ব্যবহার করা যেতে পারে লিখন অক্ষমতা নির্ণয়ে। যেমন :

(১) পেন ম্যানশিপ্ ইনস্ট্রাকশন

(২) কিভাবে চিন্তাকে বিন্যস্ত এবং সংগঠিত করা যায় তার জন্য ইনস্ট্রাকশন,

(৩) ভাষা লিখনের নিয়ম কানুন যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে বড় হাতের অক্ষর লেখার ধরন, যার চিহ্ন ব্যবহার, ব্যাকরণ, বানান এবং বাক্যের গঠন রীতি শিখন।

লিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়কারী শিক্ষণ পদ্ধতি (Remedial Teaching of Writing Disabled Learners) : ভাষামূলক লিখন বিশৃঙ্খলায় নিরাময় নির্ভর করে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট অভাবজনিত লক্ষণগুলির সঠিক অবস্থান এবং পরিমাপ জানার উপর। যখন শিক্ষার্থীর অসুবিধাগুলি তাদের বয়স বা জীবন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত তখন সেই অনুসারে বয়সভিত্তিক নিরাময়কারী শিক্ষার দ্বারা দক্ষতার অভাব পূরণের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু যখন লিখন অক্ষমতা বহুমুখী অভাব জনিত কারণে উদ্ভূত হয়, তখন নিরাময়কারী কার্য সমস্যার bypass বেশ কঠিন হয়। যদি শিক্ষার্থী কর্মেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যার কারণে ভোগে তাহলে নিরাময়কারী শিক্ষক নিম্নলিখিত উপায় অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন—

(১) হাতের পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে অনুশীলনে অভ্যস্ত করা। শিক্ষক এমন ব্যবস্থাও গ্রহন করতে পারেন যেখানে শিক্ষার্থীকে বালিতে, নরম মাটিতে, চক বোর্ডের উপর লেখার পরামর্শ দেওয়া যায়।

(২) কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি লিখন সামগ্রী, কাগজ সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের অভ্যাস করানো উচিত।

(৩) লেখার হরফগুলিকে সঠিকভাবে লেখায় অভ্যস্ত করার জন্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা।

(৪) শিক্ষার্থীকে লেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা দরকার; এজন্য শিক্ষক তাকে পর্যাপ্ত সময় দেবেন এবং লাইন টানা কাগজ ব্যবহার করতে পরামর্শ দেবেন।

(৫) স্পষ্ট ও সহজপাঠ্য অক্ষর সংযোগ; দুটি শব্দের মধ্যবর্তী স্থানে এবং লেখার লাইনের মধ্যে প্রয়োজন মত ফাঁক রাখার বিষয়টি শিক্ষার্থীকে শেখানো দরকার।

(৬) লেখার উপর লেখা, যথেচ্ছ কাটাকাটি, পরিচ্ছন্নতা, এলোমেলো অবস্থা পরিহার করতে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া উচিত।

(গ) **পাটীগণিতে অক্ষমতা (Arithmetic Disability) :** বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পাঠীগণিত। শিক্ষায় এই বিষয়টিতে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ এই বিষয়টিতে উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় থাকে। এই বিষটিতে বহু শিক্ষার্থী সাফল্যের নিম্নস্তরে অবস্থান করে। কখনো কখনো পাটীগণিতের এই অক্ষমতাকে Dyscalculia বলা হয়, যার ফলে পাটীগণিত ধারণা লাভ করতে, পাটীগণিতের ঘটনা স্মরণ করতে, সংখ্যা সংগঠিত করতে এবং সমস্যা সংগঠনের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয় শিক্ষার্থীরা।

● **পাটীগণিতে অক্ষমতার কারণসমূহ** (Causes of Disalitity in Arithmetic) : পাটীগণিত শিখনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঁচটি বড় দিক হল : বৌদ্ধিক ক্ষমতা (cognitive abilities), যোগ প্রক্রিয়া (addition), বিয়োগ প্রক্রিয়া (subtraction) গুণ প্রক্রিয়া (multiplication) এবং ভাগ প্রক্রিয়া এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে সাধারণ জ্ঞান। 'ঠিক' একই রকমভাবে পাটীগণিতের অক্ষমতার প্রধান দিকগুলি হল : হাতে রাখা (carrying), ধার করা (Borrowing), ভগ্নাংশ যোগ করা (add fraction), অজানা সংখ্যাকে বার করা (solving the unknown) এবং সংখ্যাগত সমস্যা প্রস্তুত করা (setting up word problems) [Rothstein, P. R, 2005]। বস্তুত পাটীগণিতে অক্ষমতার উদ্ভব হয় শারীরিক, সংবেদনগত, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অবশ্যই বুদ্ধিগত উপাদানে পরিপ্রেক্ষিতে। এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে কতকগুলি শিক্ষাগত এবং কতকগুলি হল প্রেষণাগত। অবশ্য আরো কিছু উপাদান আছে।

(ক) **শিক্ষাগত কারণ বা উপাদান—**

(১) **অপর্যাপ্ত নির্দেশনা :** অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন পাটীগণিতের অক্ষমতার কারণ হল পাটীগণিত শিক্ষণের জন্য শিক্ষকের যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকা।

(২) **অতিরিক্ত অনুশীলন এবং স্মরণক্রিয়া :** পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীর প্রেষণা সঞ্চারে অনেক ক্ষেত্রেই বাধা দেয়। একই কাজ বা সমস্যা বার বার করতে গিয়ে পাটীগণিত শিখনে

Scanned with CamScanner

বিরূপ প্রভাব পড়ে, বিশেষ করে যখন শিক্ষার্থী তার সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তির ফলে ব্যর্থ হয়।

(৩) **সামাজিক এবং আবেগমূলক প্রস্তুতির অভাব :** পাটীগণিত শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর সবরকম প্রস্তুতি থাকা দরকার। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। এজন্য শিক্ষকের জোর দেওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপর। সামাজিক ভাবে অনুকূল পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে পাটীগণিত শিক্ষণের জন্য প্রস্তুতির গ্রহণ করা দরকার।

(৪) **পাটীগণিতের শব্দ সম্ভারে অপর্যাপ্ত মনোযোগ :** অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থী পাটীগণিতের শব্দকে সনাক্ত করতে অথবা উপলব্ধি করতে পারে না। এমনকি তাদের শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না এবং শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়।

(খ) **প্রেষণামূলক উপাদান সমূহ** (Motivational fuctors of Arithmetic disability) :

বিদ্যালয় শিক্ষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আগ্রহ এবং প্রেষণা, এই আগ্রহ ও প্রেষণার উপর অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের সাফল্য। বিশেষ করে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। অনেক সময় বাড়ীর পরিবেশে পিতা মাতার বা বড়দের অপ্রেষণামূলক আচরণের কারণে এবং বিদ্যালয়ে অপ্রশিক্ষিত এবং অপরিণত শিক্ষকদের অপ্রেষণামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী পারদর্শিতা দেখাতে পারে না ফলে ব্যর্থতা এসে যায়।

● **পাটীগণিতে অক্ষমতার সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য** (Identifying characteristics of Arithmetic Disabled Learnerss) :

যে সব শিক্ষার্থীরা পাটীগণিতে অক্ষমতা তাদের কিছু লক্ষণ দেখা যার। এই লক্ষণগুলি দেখে সহজেই তাদের চিহ্নিত করা যায় নিম্নে সেরকম কিছু উল্লেখ করা হল :

(১) সংখ্যাগত এবং পাটীগণিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীকগুলি শিক্ষার্থী সঠিক ভাবে লিখতে পারে না।

(২) পাটীগণিতের সাধারণ চিহ্ন বা প্রতীকগুলির অর্থ মনে করতে পারে না এবং মৌলিক ঘটনা ও তথ্যের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়।

(৩) তারা পাটীগণিতের সমস্যাগুলির বর্ণনা, হিসাব এবং সমাধান করতে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৪) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক পর্যায়গুলি অনুসরণ এবং উপলব্ধি করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৫) পাটীগণিতের মৌলিক সমস্যাগুলি যেমন স্থানিক মান পরিচালিত সংখ্যা।

● **পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয়** (Diagnosis of Arithmetic Disability) :

পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয় এর কাজ তিনটি পর্যায়ে হতে পারে (OHO, ১৯৭৩) এই তিনটি পর্যায় হল : (ক) সমীক্ষা স্তরে নির্ণয়, (খ) নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় এবং (গ) নিবিড় স্তরে নির্ণয়।

উপরোক্ত স্তরগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

(ক) **সমীক্ষা স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরে সাধারণবুদ্ধির অভীক্ষা (general Intelligence Test) ব্যবহার করা হয়। এর ফলাফল সমস্যা স্তরের অভিমুখ বুঝতে সাহায্য করে। এই ধরনের কিছু অভীক্ষা হল Lowr Test of Basic Skills, California Achievement Test, co-ordinated scales of Achievement, Stanford Achievement Test. এছাড়া বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের কাজ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে পাটীগণিতে অক্ষমতাকে সনাক্ত করা যেতে পারে।

(খ) **নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরে শিক্ষার্থীদের অক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য বেশ কিছু অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের কাজে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নিয়মিত পরীক্ষার নম্বর সাহায্য করে। এই পর্যায়ে নিরাময়কারী পদ্ধতি, ওয়ার্কবুক, নিরাময়কারী উপকরণ ইত্যাদিত সহায়তা করে। নির্দিষ্ট করে নির্ণয় এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অনুসরণ করা যেতে পারে–

(১) মাঝারি মানের নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বয়স এবং গ্রেড লেভেল এর সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ হওয়া দরকার।

(২) বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সমস্তদিককে অবলম্বন করে অভীক্ষণ চালানো দরকার।

(৩) যাতে সঠিক স্তরে ব্যবহার করা যায় সেজন্য অভীক্ষাটি উপযুক্তভাবে আদর্শায়িত হওয়া দরকার।

(গ) **নিবিড় স্তরে নির্ণয় :** পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয় এর ক্ষেত্রে তৃতীয় বা নিবিড় স্তরের নির্ণয়ের বিষয়টি সাধারনত খুব কম ব্যবহৃত হয়। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের নির্ণয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় তখন এই নিবিড় স্তর এর নির্ণয়কে কাজে লাগানো হয়। যেখানে পাটীগণিতে শিক্ষার্থীদের বহুরকমের সমস্যার কারণে অক্ষমতা আসে সেক্ষেত্রে এই নিবিড় স্তরের নির্ণয় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

● **পাটীগণিতে নিরাময়কারী শিক্ষণ** (Remedial Teaching in Arithmetid) :

পাটীগণিতে নিরাময়কারী শিক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য নিরাময়কারী শিক্ষককে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

(১) **শিক্ষার্থীদের সহযোগিতাকে নিশ্চিত করা :** শিক্ষার্থীদের মানের নিরিখে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই ধরনের শিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি না এবং তা শিক্ষার্থীদের

Scanned with CamScanner

সমস্যার সমাধান করবে কিনা। তাহলে সেক্ষেত্রে নিরাময়কামী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের এই সহযোগিতা করার মানসিকতাকে নিশ্চিত করতে হবে নিরাময়কারী শিক্ষককে।

(২) **দক্ষ নিরাময়কারী পদ্ধতি ব্যবহার :** পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য হল কার্যকরী এবং দক্ষ নিরাময়কারী নির্দেশনাকে নির্দেশ করা বা স্থির করা। সুতরাং নিরাময়কারী কর্মপ্রচেষ্টা নির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক হওয়া দরকার।

(৩) **সঠিক ও কার্যকরী পদ্ধতি এবং সামগ্রীর ব্যবহার :** পাটীগণিত অক্ষমতার বেশীরভাগ কারণ সমূহ অকার্যকরী প্রারম্ভিক শিখনের মধ্যেই খুঁজতে হবে। যখন পূর্ববর্তী ধাপগুলিতে শিক্ষার্থী পারদর্শী হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই নতুন কোন পাটীগণিতের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। সেজন্য একমাত্র কার্যকরী পদ্ধতি এবং সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত। এই ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

(৪) **সম্পর্কযুক্ত উপাদানগুলিকে অনুসন্ধান এবং সংশোধন করা :** শিক্ষার্থীদের পাটীগণিতে অক্ষমতার পশ্চাতে শুধুমাত্র অকার্যকরী শিক্ষণপদ্ধতিই দায়ী নয়, এর পশ্চাতে দায়ী আছে বেশ কিছু অন্যান্য ব্যর্থতাও। সেগুলি হল প্রক্ষোভগত, শারীরিক এবং পরিবেশগত উপাদান। নিরাময়কারী শিক্ষককে সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে সনাক্ত করা দরকার। এই সনাক্তকরণের পর শিক্ষক নিরাময়কারী শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

● নিরাময়কারী শিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষক নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর কার্য সম্পাদন করতে পারেন—

(ক) শিক্ষার্থী যাতে তার সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য তাতে উযুক্তভাবে শেখানো উচিত। এতে শিক্ষার্থী তার অযত্নের কারণে উদ্ভূত ভুলগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে।

(খ) সমস্যা সমাধান মূলত ভুল আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পাটীগণিত সংক্রান্ত পূর্বজ্ঞান, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি সম্বন্ধে নিশ্চিত করে জানতে হবে।

(গ) ভুলের বিশ্লেষণ করে স্থির করতে হবে শিক্ষার্থীর গননা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে কিনা।

(খ) শিক্ষার্থী যাতে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে তারজন্য শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করা দরকার। শিক্ষার্থীর পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে।

(ঙ) শিক্ষার্থীকে তার সমস্যার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(চ) দক্ষতার মৌলিক দিকগুলি যেমন—যোগ প্রক্রিয়া, গুণপ্রক্রিয়া ইত্যাদি উপযুক্ত স্তর অনুযায়ী ঘটনা সমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মধ্যে কতকখানি বর্তমান সেই সম্পর্কে শিক্ষককে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে।

(ছ) পাটীগণিতের বিভিন্ন কৌশলগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করতে হবে।

(জ) সুপরিকল্পিতভাবে গঠিত প্রোগ্রাম লার্নিং সামগ্রীগুলিকে এবং নিরাময়কারী কর্মপ্রক্রিয়াকে গড়ে তুলতে হবে।

(ঝ) দরকার হলে, সম্ভবমত কম্পিউটারের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

❑ ১.৪.৫ শিক্ষণ কৌশলে নতুন প্রযুক্তি (New Technology in Teaching Straties) :

আজকের আধুনিক জীবনে প্রযুক্তিগত কৌশল বৃদ্ধি পেয়েছে দুর্বার গতিতে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে আজ তার প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির প্রভাব পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে, এমনকি তার চাপ শেষপর্যন্ত এসে পড়েছে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অভ্যন্তরেও।

প্রযুক্তি তার প্রভাব ফেলেছে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রযুক্তি বিপ্লবে পরিবর্তন ঘটে চলেছে শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার তত্ত্ব, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ, প্রেষণা ইত্যাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বেশকিছু দিন পূর্বেই ভারতীয় শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪-৬৬) তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন "The destiny of Indian is now being shaped in her classrooms. In a world based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of people..." [The Education Commission 1964-66)। এরিক অ্যাসবি (Ashby, E, 1967) শিক্ষার চারটি বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে চতুর্থ বিপ্লবকে উল্লেখ করেছেন 'ইলেকট্রনিক্সের বিপ্লব' বলে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—"any technology which increases rate of learning would enable the teacher to teach less and the learner to pearn more." আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে অ্যাসবি যে কথা বলেছিলেন একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আজ তা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স বলতে তিনি মূলত রেডিও, টিভি, টেপরেকর্ডারকেই বুঝিয়েছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে ব্যবহারের ইতিহাস খুব নতুন নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হত মুখে, পরবর্তীকালে লেখার আবিষ্কারের ফলে শিক্ষক হাতে লেখা বিষয়বস্তু ব্যবহার করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপাখানা আবিষ্কার শিক্ষাক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দেয়। যদিও প্রথম দিকে বই ছাপানো হত মূলত : ধর্ম অথবা ব্যাকরণ বিষয়ে। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে পিটার রেমাস উচ্চশিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে

Scanned with CamScanner

শিক্ষণের ক্ষেত্রে আসে নতুন যুগ। জন কমেনিয়াস ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে শিশুদের জন্য লেখা 'Orbus Picture' নামে বইটি। শতাধিক বই লিখলেও কমেনিয়াসের সেই প্রচার ছিল না।

পরবর্তীকালে শিক্ষণে ধারণাটাকেই বদলে দেন রুশো, হার্টার্টস্পন সাব, ফ্রয়েবেল, পেষতালৎসি প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ। আর এই সময়ের মধ্যে উন্নতি ঘটেছে ছাপাখানার কাজে অগ্রগতি ঘটেছে মনোবিজ্ঞানে, পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষণ পদ্ধতিতেও। শিক্ষণ পদ্ধতিকে অনেকখানি বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন জন ডিউই।

বিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতি শিক্ষায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিক্ষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে বিনেৎ। ১৯২৫-এ সিডনি, এল. প্রেসি আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সভায় 'টিটিং মেশিনের' ব্যবহার প্রদর্শন করেন এবং শুরু হয় 'প্রোগ্রাম নির্দেশনার' সূত্রপাত। ১৯৩৮ এবং ১৯৪০-এ শিক্ষার দৃশ্য সহায়ক (Visual aid) ব্যবহার শুরু হয়। সেই সঙ্গে সূত্রপাত ঘটে দর্শন এবং শ্রবন নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণের প্রয়োগ। ১৯৫৪-তে এডগার ডালে তাঁর বিখ্যাত 'Cone of Experience' প্রকাশ করেন। প্রায় ওই একই সময়ে অপারেন্ট অনুবর্তন ব্যবহার করে 'টিটিং মেশিন' প্রস্তুত করেন বি.এফ. স্কিনার। এতে তিনি ফিডব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এর ঠিক কিছুদিন পূর্বে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ক্রাউডার আমেরিকার বিমান বাহিনীর জন্য শাখা পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম নির্দেশনার নক্‌শা প্রস্তুত করেন।

শিক্ষার আর এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি তার ব্যবহার ক্ষেত্রকে দ্রুত হারে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিক্ষায় CAI (Computer Assisted Instruction), CMI (Computer Managed Instruction), CAL (Computer Assisted Learning) ইত্যাদির ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে CAI, CMI, CAL ইত্যাদির ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে দূরশিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে একসঙ্গে অগ্রসর হতে পারছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির জন্যই। www মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ প্রচার ইত্যাদিতে ইন্টারনেটের ব্যবহার আজ আর নতুন নয়। ভার্চুয়াল বিদ্যালয়, ভার্চুয়াল মহাবিদ্যালয়, ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাস্তব। এমনকি ভার্চুয়াল পাঠাগার, ভার্চুয়াল গবেষণাগারের ব্যবহার আমাদের দেশে ব্যাপক না হলেও বহু দেশেই এটি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষায় এবং শিক্ষণে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাদের কয়েকটি হল—

(১) শিক্ষায় দূরদর্শনের ব্যবহার।

Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in

(২) C.C.T.V

(৩) প্রোগ্রাম নির্দেশনা।

(৪) টিমটিচিং।

(৫) ফ্লেক্সি লার্নিং।

(৬) ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনা।

(৭) স্বাধীন শিখন।

(৮) ভাষা গবেষণাগার বা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটারি।

(৯) মুক্ত শিক্ষা।

(১০) আচরণমূলক উদ্দেশ্যের ব্যবহার।

(১১) সাইবার নেটিকের বিভিন্ন ব্যবহার ইত্যাদি।

আজেকর এই যুগ হল তথ্য বিপ্লবের যুগ। তথ্য সংগ্রহ, নির্বাচন এবং প্রসার শিক্ষণের একটি অন্যতম কাজ বলে আজ অনেকেই মনে করেন। এই তথ্য বিপ্লবের যুগে তথ্য যেমন প্রচুর, যে তথ্য আবার দ্রুত অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ হল তথ্যকে সময়মতো ব্যবহার এবং সঠিক প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষকের দায়িত্ব কিন্তু কম নয়। আজকের এই বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশি। নতুন শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে শিক্ষা পদ্ধতিকে আরও অনেক বেশি গতিশীল করাও শিক্ষার একটি নতুন দায়িত্ব। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এবার কয়েকটি আলোচনা করার চেষ্টা করবো আমরা।

❑ ১.৪.৫.১ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ভূমিকা (Role of Multimedia as Technology in Teaching Stratigies) :

ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা আদান প্রদান ঘটাতে সাহায্য করে যোগাযোগ। এই যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক ও মানসিক নানা ধরনের কাজ হয়ে থাকে। যোগাযোগের প্রধান কাজ হল তথ্য আদান-প্রদান, সামাজিকীরণ, প্রেষণা সঞ্চার করা, শিক্ষা ও বিনোদন (Mac Bride. 1980)। যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির মধ্যে আছে—সংকেত এবং শব্দের ব্যবহার, ভাষা, ডাকবিভাগ, টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি। মাধ্যম এবং যোগাযোগ এত সম্পর্কযুক্ত যে অনেক সময়ই একে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(ক) শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনার মাধ্যমের ব্যবহার (Use of Media in Classroom Instruction) :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দেশনার স্তর এবং গুরুত্ব অনুসারে তিন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করেন। এই তিনটি স্তর হল—স্মৃতি স্তর, ধারণার স্তর ও চিন্তামূলক স্তর। শিক্ষায় ব্যবহৃত

Scanned with CamScanner

কয়েকটি সাধারণ মাধ্যম হল—শিক্ষণ প্রদীপন, চক-বোর্ড, চার্ট, ভিডিও ইত্যাদি। এগুলি শিক্ষণে স্পষ্টতা, নির্ভুলতা সম্পন্ন করে শিখনকে সাহায্য করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমের উদ্দেশ্য, শিক্ষার পরিকাঠামো, খরচ ইত্যাদি অনুসারে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়:

(১) **জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে—**

(ক) শ্রবণ-মাধ্যম—বেতার, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি।

(খ) দর্শন-মাধ্যম (মুদ্রিত)—পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাহায্যকারী বইপত্র ইত্যাদি।

(গ) দর্শন-মাধ্যম (দ্বি-মাত্রিক এবং প্রক্ষেপণ যোগ্যনয়)—বার্তা চিত্র, পোস্টার ইত্যাদি।

(ঘ) দর্শন-মাধ্যম (ত্রিমাত্রিক এবং প্রক্ষেপনযোগ্য নয়)—মডেল, গ্লোব, পুতুল ইত্যাদি।

(ঙ) দর্শন-মাধ্যম (স্থির এবং প্রক্ষেপনযোগ্য)—স্লাইড, ও.এইচ.পি ইত্যাদি)

(চ) দর্শন-মাধ্যম (গতিশীল এবং প্রক্ষেপনযোগ্য)—চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, ক্লোজ সার্কিট টিভি, ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি।

(ছ) মাল্টিমিডিয়া—স্লাইড + টেপ, স্লাইড + টেপ + ওয়ার্কবুক, টিভি + ওয়ার্কবুক, কম্পিউটার ইত্যাদি।

(জ) নতুন মাধ্যম—ইন্টারনেট, টেলি কনফারেন্সিং ইত্যাদি।

(২) **শিক্ষার্থীর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে—**

শিক্ষার্থী মাধ্যমকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই অনুসারে বেশি নিয়ন্ত্রণ থেকে কম নিয়ন্ত্রণ অনুসারে সাজানো যায়।

১	২	৩	৪
নিয়ন্ত্রণহীন ——————————————————→ উচ্চ নিয়ন্ত্রণ			
টিভি, রেডিও ইত্যাদি	প্রক্ষেপণযোগ্য মাধ্যম	প্রক্ষেপনযোগ্য নয় এমন মাধ্যম	কম্পিউটার টেপরেকর্ডার

নিয়ন্ত্রণ অনুসারে মাধ্যমের নির্বাচন

(৩) **অভিজ্ঞতা অর্জন করানোর ক্ষেত্রে :** কী ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেও মাধ্যম নির্বাচন করা হয়। এডগার ডালের 'কোন্ অব এক্সপিরিয়েন্স (Cone of Experience)-এ এইভাবে মাধ্যমকে সাজানো হয়।

(৪) **শিক্ষার্থীর দলগত বিন্যাস অনুসারে :** ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ, দলগত বা শ্রেণিগত প্রশিক্ষণ অনুসারেও মাধ্যম নির্বাচন করা হয়। ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

(খ) **মাধ্যম নির্বাচন ও ব্যবহার** (Proper selection of Media and its use) :

শিখনের মান যদি বেশি পেতে হয়, তাহলে শিক্ষার মাধ্যমকে যথোপযুক্ত ভাবে নির্বাচন এবং ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং শিক্ষণের ক্ষেত্রে মাধ্যম নির্বাচন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষ। আবার মাধ্যম নির্বাচনও নির্ভর করে মাধ্যমকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার উপর। নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়-এর উপর মাধ্যমের ব্যবহার নির্ভর করে। বিষয়গুলি হল—

(১) নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য।

(২) বিষয়বস্তু।

(৩) শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা।

(৪) শিক্ষকের শিক্ষণের ধরন ইত্যাদি।

সুতরাং মাধ্যম নির্বাচনের আগে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে হবে—

(১) কী শেখানো হবে?

(২) কীভাবে শেখানো হবে?

(৩) কাকে শেখানো হবে?

(৪) মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে?

(৫) শ্রেণিকক্ষের মাধ্যমটিকে কতটা ব্যবহার করা যাবে?

(৬) শিক্ষকের মাধ্যমটি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আছে কিনা? ইত্যাদি।

(গ) **শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমাধ্যম** (Multimedia in Education) :

মাল্টিমিডিয়ার সঙ্গে আরও দুটি শব্দ ব্যবহার হতে দেখা যায়, যেগুলি হল— (i) হাইপার টেক্সট এবং (ii) হাইপার মিডিয়া।

(i) **হাইপার টেক্সট** (Hyper text) **এবং হাইপার মিডিয়া** (Hyper media)

থিওডোর নেলসন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে হাইপার টেক্সট নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। বিংশ শতকের আশির দশকে ম্যাকিনটোস সফটওয়্যার 'হাইপার কার্ড' ব্যবহারের পর হাইপার টেক্সট শব্দ বহুল প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া এবং হাইপার টেক্সট একত্রে ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন সংযোগের মাধ্যমে একই বিষয়ের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। হাইপার টেকসট-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **টোলহার্স্ট** (Tolhurs-1995) বলেছেন : "...nonlinear organized and accessed series of text and static diagrams, pictures and tables." বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে শব্দ, রেখাঙ্কিত চিত্র, ছবি, ভিডিয়ো ইত্যাদি হাইপার টেক্সট-এ যুক্ত

Scanned with CamScanner

হয়েছে। **একেই বলা হয় হাইপার মিডিয়া**। হাইপার মিডিয়াকে টেকসট-এর আরো বিস্তারিত রূপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞ হাইপার টেকসট এবং হাইপার মিডিয়াকে যুক্তভাবে মাল্টিমিডিয়া বলতে আগ্রহী (**Kid** এবং তাঁর সহযোগী গবেষকবৃন্দ, ১৯৯২) আবার, অনেকে এই দুই-এর সমন্বয়কে 'ইন্টার অ্যাকটিভ মিডিয়া' বলার পক্ষপাতী (**গলব্রেথ** ১৯৯১, স্ক্রোডার, ১৯৯২)।

শিক্ষাক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমের ব্যবহার (Use of Multimedia in Education) :

আজকাল বিভিন্ন সফট্ওয়ারের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই ধরনের কয়েকটি সফট্ওয়ার হল—অথর ওয়ার প্রফেশনাল, ডাইরেক্টর, স্টুডিয়ো ম্যাক্স, হাইপার কার্ড, অ্যাপল মিডিয়া টুলকিট ইত্যাদি। শ্রেণিশিক্ষণে মালিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমের ব্যবহার মিথষ্ক্রিয়াকে যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি শিখনের হার বাড়াতে সাহায্য করে।

মাল্টিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমকে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়, তার একটি তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে:

(i) যে সমস্ত বস্তু দেখা বেশ কষ্টকর সেখানে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।
(ii) ত্রিমাত্রিক বস্তুকে যেহেতু বইতে ছাপানো যায় না, তাই সেক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।
(iii) বড় ধরনের বিষয়বস্তুকে মাল্টিমিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায়।
(iv) যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ বা জটিল বিষয়ে যা প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমাধ্যম বা মাল্টিমিডিয়ার প্রকৃতি (Nature of Multimedia in Education) :

(i) বহুমাধ্যমে অনেকগুলি মাধ্যম, যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কৌশল শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত হয়।
(ii) বহুমাধ্যম কর্মপ্রক্রিয়ার উৎপত্তি মূলত শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষণ কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে, যার উদ্দেশ্য হল শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটানো।
(iii) বহুমাধ্যম-এর লক্ষ্য হল পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীকে অর্থপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতা প্রদান। এজন্য অনেকগুলি মাধ্যমের সমন্বয় ব্যবহার করা হয়।
(iv) মাধ্যমগুলিকে এমনভাবে যত্ন সহকারে নির্বাচিত করা দরকার যাতে কোনো একটি মাধ্যম অন্য মাধ্যমের কার্যকারিতাকে বিঘ্নিত না করে, বরং প্রতিটি মাধ্যম অন্য মাধ্যমগুলির পরিপূরক হতে পারে।

(v) মাধ্যমগুলিকে তাদের ক্রম অনুসারে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার দরকার হয়। যখন যেটি দরকার তখন সেটিই একমাত্র ব্যবহার করা দরকার, তাহলে সামগ্রিকভাবে অল্প সময়ে মাধ্যমগুলিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
(vi) বহুমাধ্যম কর্মপ্রক্রিয়ায় অনেকগুলি মাধ্যম ও কৌশলকে ব্যবহার করা হয় যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে।

বহুমাধ্যমকে কার্যকরী করে তোলার পদ্ধতি :

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বহুমাধ্যম অনেকগুলি মাধ্যমকে নিয়ে গড়ে ওঠে। অনেকগুলি সম্ভাব্য মাধ্যমের যুক্তিপূর্ণ সম্মিলন বা মিশ্রণ-এর প্রয়োজন হয় এতে। **কোনো বহুমাধ্যম কর্ম প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে নিম্নলিখিত ধাপ বা পর্যায়গুলি অনুসরণ করা হয়—**

প্রথম পর্যায় : প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণ-শিখন কার্যকে শুরু করেন। নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পাঠদানের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই পর্যায়ে শিক্ষক অনেকগুলি মাধ্যম উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত মাধ্যমের মিশ্রণকে ব্যবহার করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত শিখন সামগ্রী বা Programmed Learning Material Cassetes: CD ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

তৃতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শিখন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে অথবা শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে।

চতুর্থ পর্যায় : এই চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে অনেকগুলি মাধ্যম এবং অন্যান্য সামগ্রীকে তাদের স্বশিখনে ব্যবহার করে।

পঞ্চম পর্যায় : পঞ্চম পর্যায়ে শিক্ষার্থী শিখন তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলন-এর সংহতি সাধন করে।

ষষ্ঠ পর্যায় : এই শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থী অনুসন্ধানের দ্বারা উপলব্ধি করে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলিকে উচ্চতর স্তরে সংগঠিত করতে হবে। সে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং মত বিনিময়ে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বহুমাধ্যম ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in use of multimedia): শিক্ষক যদি বহুমাধ্যম-এর কর্ম প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে চান তবে, তাঁকে বেশকিছু পরিবর্তন সাধন এবং সমঝোতা করতে হবে। চিরাচরিত ভূমিকার তুলনায় তাঁর ভূমিকায় থাকবে ভিন্ন তাৎপর্য। শিক্ষককে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

(১) শিক্ষককে অনেকগুলি পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে, তিনি শুধু চক-কথা (chalk-talk) এর মধ্যে বক্তৃতা সীমাবদ্ধ রেখে সন্তুষ্ট থাকবেন না।

Scanned with CamScanner

(২) বিভিন্ন মাধ্যমের সহজলভ্যতা সম্পর্কে শিক্ষককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিভিন্ন মাধ্যমকে প্রদর্শন করতে দক্ষ হতে হবে।

(৩) মাধ্যমগুলির যুক্তিপূর্ণ নির্বাচন-এর ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট দক্ষ হতে হবে। মাধ্যমগুলির মধ্যে সংহতি ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে সেগুলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

(৪) শিক্ষকের ভূমিকা হবে একদিকে ভালো ব্যাবস্থাপকের, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের সহজ শিখনে সহায়তা করতে হবে। তাঁর একটি দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ও ব্যক্তিগত শিখনে পরিচালিত করা।

(৫) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এমন অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন যাতে তারা তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা সংহতি স্থাপন করতে পারে।

❑ ১.৪.৫.২ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে সি.ডি.রম (CD-Rom as Technology in teaching strategies) :

বহুমাধ্যম বা multimedia-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে CD-Rom-এর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। CD-Rom বা কম্প্যাক্ট ডিস্ক 'রিড্ অন্‌লি মেমোরির' (Compact Disc Read Only Memory) যাত্রা শুরু গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আশির দশক পর্যন্ত ভিনাইল গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবহার হত। ১৯৫০-এ CD প্রযুক্তি কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পরে ১৯৫২-তে LP রেকর্ড ব্যবহার প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। ১৯৯২-এর হিসেব ভিনাইল ডিস্কের র ব্যবহার খুবই কম।

একটি সাধারণ CD-Rom ডিস্ক বর্তমানে ৭০০ মেগাবাইট তথ্য সঞ্চয় করতে সক্ষম। এই তথ্য পাঠ্যবিষয়, রেখাচিত্র, শব্দ, চলচ্চিত্র, ভিডিও ইত্যাদি হতে পারে। কম্প্যাক্ট ডিস্কে শুধুমাত্র তথ্যকে পেতে পারে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ তথ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য ডিক্‌শনারি, এন-সাইক্লোপিডিয়া এবং যে কোনো পাঠ্যবিষয়বস্তুকে সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব। এতে স্থান খুব কম লাগে।

আর একটি বড় সুবিধা CD-Rom-এ পাওয়া যায়, যেটি হল এতে তথ্য, শব্দ, চিত্র, সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব। এতে কম ক্ষমতার লেসার ব্যবহার করে তথ্যাবলিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এতে তথ্যের বিকৃতি ঘটতে পারে না। তথ্যকে সংখ্যা (digit) দিয়ে সঞ্চয় করা হয় বলে তথ্যের যে কোনো অংশকে পুনরুদ্ধার করা অনেক খানি সহজ। এর ফলে যে সব তথ্য পরিবর্তন করার দরকার হয় তা মুদ্রণ আকারে না রেখে CD-তে রাখা অনেক বেশি সহজ এবং কম ব্যয় সাপেক্ষ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় টাইম টেবিল, টেলিফোনের ডাইরেক্টরি এবং সফটওয়ার প্যাকেজ ইত্যাদি CD-Rom-এ সংগ্রহ করে রাখা হয়। বর্তমানে CD-Rom প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, ফলে ৭০০ মেগাবাইট তথ্য

একবার সঞ্চয় করে রাখতে পারলে বহুবার বহুলোকের তা ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। অন্য CD-Rom-এ তথ্য সঞ্চালিত করাও অনেক সহজ হয়। মাল্টিমিডিয়ার এই পদ্ধতিকে অনেক প্রতিষ্ঠান WORM (Write Once, Read Many) নামও দিয়ে থাকেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে CD প্রযুক্তি সর্বপ্রথম হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। এর সফল প্রয়োগের পর ব্রিটেন ১৯৯২-তে Interactive Media System-এ প্রযুক্তি প্রচলন করে।

আজকের দিনে কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে বিভিন্ন সফটওয়ার-এর ব্যবহার CD Rom-এর মাধ্যমে করা হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান যে, নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমই উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, এই প্রযুক্তির দাম ক্রমাগত কমার ফলে আজকের দিনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনোদন, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদিতে স্থান করে নিয়েছে।

CD-I (Compact Disc-Interactive) প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কোনো বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। এছাড়া এই ধরনের প্রযুক্তির আর একটি বড় সুবিধা হল যে, এটি সহজে বহনযোগ্য এবং সহজে তা নষ্টও হয় না। যেখানেই এগুলি ব্যবহার করার ন্যূনতম সুবিধা আছে সেখানেই তা ব্যবহার করা চলতে পারে।

❑ ১.৪.৫.৩ শিক্ষণ-কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনা (Web-based instructions as Tecechnology in Teaching Stratigies) :

ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ যুক্ত হল ইন্টারনেট। স্বাভাবিকভাবেই ওয়েবভিত্তিক নির্দেশনাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রথমে ইন্টারনেট সম্বন্ধে আমরা জেনে নেব।

(ক) **ইন্টারনেট** (Internet) :

'ইন্টারনেট' কথাটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। Inter-network System-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে 'ইন্টারনেট' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেট হল কম্পিউটার এবং অন্যান্য নতুন মাধ্যম গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রসমূহের একটি বিশ্বব্যাপী জালিকা। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ইন্টারনেটকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এইভাবে, "a global pool of information and services, accessible by means of locally executed interface software." যখন দুই বা তার বেশি কম্পিউটার অথবা অন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা একসঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যে তারা একে অপরকে যোগাযোগের দ্বারা তথ্য প্রদানের জন্য একটি জালকতন্ত্র গড়ে তুলে। এই জালক তন্ত্রে দুটি কাজ হয় তথ্যবহন এবং তথ্যবহন-এর জন্য পথ প্রস্তুত। ইন্টারনেট নতুন মধ্যমের জ্ঞাপন বা যোগাযোগ পদ্ধতিতে তথ্যবহন পথের কাজ করে আর অন্য দিকে ওয়েব সেই পথকে ব্যবহার করে তথ্যবহনের কাজ করে। সুতরাং ইন্টারনেটের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েব বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক।

Scanned with CamScanner

প্রকৃতপক্ষে তথ্যবহনকারী বাহনের অংশগুলি হল বিভিন্ন ওয়েবসাইট। বিশেষ বিশেষ কম্পিউটার কার্যক্রম ব্যবহার করে ওয়েবসাইটগুলি তৈরি করা হয়। সাইটগুলি রক্ষিত হয় ওয়েব সার্ভার নামে কম্পিউটারে। প্রতিটি সাইটে থাকে ওয়েব পৃষ্ঠা এবং তার ভিন্ন ভিন্ন তথ্যপঞ্জী। ওয়েবসাইট এবং তার পৃষ্ঠাগুলি দেখার জন্য দরকার হয় ওয়েব ব্রাউজার ধরনের সফ্টওয়্যারের। সুতরাং ইন্টারনেট হল কম্পিউটার এবং অন্যান্য নতুন মাধ্যমের গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রসমূহের এক বিশাল এবং বিশ্বব্যাপী জালিকা।

(খ) **বিশ্বব্যাপী জালিকা** (World Wide Web সংক্ষেপে www) : www বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর ধারণার জনক হলেন টিম বারনার্স লী নামে সুইজারল্যান্ডের একজন পদার্থবিজ্ঞানী। ১৯৮৯ সালে এই ধারণাটির জন্ম হয়। এই প্রযুক্তি বর্তমানে www নামেই পরিচিত। হাইপার টেক্সট্ এবং হাইপার মিডিয়ার সাহায্যে www কার্যকরী হয়। Web brouser হল একটি সফটওয়ার যার সাহায্যে ওয়েব ব্যবহার করা যায়। ১৯৯৪-এর জুলাইতে একটি সংগঠন তৈরি হয়, এটির নাম হয় World Wide Web Consortium (সংক্ষেপে WBC)। এর কাজ হল ভবিষ্যতে web-এর গুণগত মান এবং বৃদ্ধিকে পরিচালিত করা।

বর্তমানে নানা ধরনের ওয়েব ব্রাউজার পাওয়া যায় যেমন—Microsoft Internet Explore, Navigator, Mosaic ইত্যাদি। এগুলির দ্বারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, শব্দ, বর্ণ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন বিষয়কে অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(গ) **WWW-এর শিক্ষামূলক সম্ভাবনা** (Educational Potentials of www) : বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়েবের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে গবেষণার বিষয় আছে সেখানেই এই ওয়েবের মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান, নতুন তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে web-এর ব্যবহার যে ক্রমেই জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দূরশিক্ষা (Distance Education) এবং মুক্ত শিক্ষার (Open Education)-এর ক্ষেত্রে web-এর ব্যবহারের ফলে গুণগত এবং পরিমাণগত উৎকর্ষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও web-এর ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও পর্যাপ্ত নয়, তথাপি এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক বা প্রোগ্রামিং না জেনেও যে কেউ web ব্যবহার করতে পারে।

www-এর কতকগুলি বিশেষ গুণ রয়েছে সেগুলি হল—

- মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
- হাইপার টেক্সট্ এবং হাইপার মিডিয়ার ব্যবহার ক্ষমতা।
- www-এর নেটওয়ার্কের সাহায্যে দূর শিক্ষার ব্যবহার ইত্যাদি।

ওয়েবের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আর একটি অতিরিক্ত এবং মজার ঘটনা হল আকস্মিক শিখন বা 'accidental learning'। হয়তো কেউ নির্দিষ্ট কোনো কাঙ্ক্ষিত তথ্যের জন্য অনুসন্ধান শুরু করলেন কিন্তু তিনি হয়তো এমন কোনো নতুন তথ্য পেলেন যাতে সেই দিকেই মনোনিবেশ করে ফেললেন, এতে তার পূর্ব কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেছনে পড়ে থাকলেও অন্য একটি নতুন শিখন সম্ভব হল, যা তার প্রত্যাশার মধ্যে ছিলই না। এই ধরনের শিখনকে বলা হয় আকস্মিক শিখন বা 'accidental learning'। অবশ্য সংগঠিত শিক্ষণ www-এর মাধ্যমে দু'ভাবে হতে পারে।

(১) এই প্রযুক্তিকে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ রাখা। হাইপার মিডিয়া এবং দূরবর্তী শিক্ষার কাজে ওই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়।

(২) এই প্রযুক্তিকে শিক্ষণের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে মুক্ত রাখা। পূর্বে এইভাবে তথ্যকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি ছিল না।

শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গঠনে web-এর মাধ্যমে শিক্ষা যথেষ্ট কার্যকরী। web-এর সাহায্যে শিক্ষার নকশাও প্রস্তুত করা যায়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই আরও যে সব ক্ষেত্রের তথ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারে তা হল—

(১) ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন, বিভিন্ন কোর্স ইত্যাদি।

(২) যাদুঘরের বিষয় সমূহ (যদি—কর্তৃপক্ষ তা web-এ প্রকাশ করেন)

(৩) ডিজিট্যাল পাঠাগারের মাধ্যমে বিভিন্ন বই, ছবি, গান, রচনা ইত্যাদি।

(৪) বিভিন্ন সভা এবং কনফারেন্স (যা হয়েছে তা বিবরণ এবং যা হবে তার সূচি) ইত্যাদি।

নেটওয়ার্কে ওয়েবের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়, বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমাধান বা সমাধানের ইঙ্গিত, গবেষণাগারের বিভিন্ন কাজকর্ম ওয়েবের মাধ্যমে পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের The Cornell Theory Centre (CTC) একটি ভার্চুয়াল স্কুল। এটি শুরু হয়েছে ১৯৯৫ থেকে। এই স্কুলটি এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন হার্ডওয়ার এবং সফ্টওয়ার প্রস্তুত করা হচ্ছে। এগুলিকে কাজে লাগিয়ে web-এর ব্যবহার ক্রমাগত আরও প্রসারিত হচ্ছে।

❑ ১.৪.৫.৪ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি (Intelligent tutoring system as technology in teaching strategies) :

ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধির বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। তাই ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে কৃত্রিম বুদ্ধি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাক। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধির বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক,

Scanned with CamScanner

কোনো একজন ব্যক্তি কোনো একটি কারখানার পরিচালক। সুতরাং তার দায়িত্ব হল কারখানার সর্বোচ্চ উৎপাদন হচ্ছে কিনা, কোনো অপচয় হচ্ছে কিনা, সমস্ত বিভাগ ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতির কোনো পরিবর্তন করতে হবে কিনা সেই সমস্ত দেখা। তাছাড়া উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রির জন্য বাজার খোঁজা, উৎপাদিত পন্যের গুণমান বজায় রাখা ও পরিচালকের খোঁজখবর রাখার দায়িত্ব। তাঁকে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হলে এবং কম্পিউটারের প্রোগ্রামারকে দিয়ে সমস্ত প্রোগ্রাম করিয়ে কম্পিউটারের মস্তিষ্কে রাখার কাজ করতে হলে ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য। এবার তাঁর কম্পিউটার কিন্তু তাঁর কারখানায় অনেক বিশেষজ্ঞের কাজ এবার নিজেই করবে, তবে তা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রোগ্রাম অনুসারে বুদ্ধিমান মানুষের মতোই বিশেষজ্ঞের কাজ করবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার-এর কৃত্রিম বুদ্ধি (Artificial Intelligence) আছে বলা হবে। এই ধরনের বুদ্ধিকে কৃত্রিম বুদ্ধি বলার কারণ হল কম্পিউটার বুদ্ধির কাজ করছে কিন্তু তা প্রোগ্রামের সাহায্যে মাত্র। প্রোগ্রাম যেমন যেভাবে করা তার বেশি কিন্তু করতে পারবে না। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কম্পিউটার মানুষের থেকে অনেক দ্রুতগতিতে কাজ সম্পন্ন করবে। এবার কৃত্রিম বুদ্ধির একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তিবিজ্ঞানী পিটার জোরকোকজি।

"The formalization of procedures in a computer programme to carry out tasks which, if they were done by human, would be regarded as intelligent." (Zorkoczy, p. 1990)

ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির ব্যবহারের একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে বিষয়টি বোঝাবার জন্য। নিউইয়র্ক টাইমস্ (16 সেপ্টেম্বর, 2004) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধটি মোটামুটি এইরকম—রোচিলি অষ্টম শ্রেণির একটি মেয়ে। যে তার কম্পিউটারে গণিতের একটি প্রশ্নের উত্তরে ভুল উত্তর (২.৪) দিয়েছে। কম্পিউটার তাকে প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত জানালো: "তোমার উত্তরের চিহ্ন সম্বন্ধে ভাব।"

শেষপর্যন্ত রোচিলি সঠিক উত্তর (–1.8) লেখার পর কম্পিউটার তাকে ধন্যবাদ সূচক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নতুন বিষয় শুরু করল। এই সফটওয়ার-এর প্রস্তুতকারক 'কর্নোগি লার্নিং'। সফটওয়ারটিকে ব্যবহার করছে 'কর্নোগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়'। এটি তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এটি একটি ইন্টেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতি। রোচিলি যখন ক্রমাগত চিহ্ন দিতে ভুল করছে তখন প্রোগ্রাম তাকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর চেয়ে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কৃত্রিম বুদ্ধির (Artificial Intelligence) প্রোগ্রামের জন্যই এই কমিটি সম্ভব হয়েছে। আবার এই প্রোগ্রামে যে শুধুমাত্র অনুশীলনই আছে তাই নয়, প্রত্যেক ধাপে কোথায় ভুল হচ্ছে তাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থী এক বার টিখ করতে পারলে

তাকে প্রশংসা করা এবং একই ধরনের আরও কাজ দেওয়া হচ্ছে যাতে ভুলের পরিমাণ একেবারেই না থাকে অথবা ভুলের পরিমাণ খুব কম হয়। যখন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন অথবা শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষক ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারে না তখন সেখানে এই ধরনের ইনটেলিজেন্ট পদ্ধতি খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এবার আসা যাক্ ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি কাকে বলে সেই প্রশ্নে।

(ক) ইনটেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তরে বলা যায় ইনটেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতি হল কৃত্রিম বুদ্ধি যুক্ত এমন একটি শিক্ষামূলক সফটওয়ার যা শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি নজর রাখে, প্রয়োজন মতো ফিডব্যাক দেয় এবং দরকার মতো উত্তরের ইঙ্গিতও দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর কাজের ধারা বিশ্লেষণ করে তার ঐ বিষয়ে ভালো দিক এবং দুর্বলতা জানিয়ে দেয় এবং কী কী করলে ওই দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনী দেয়।

এখানেই কৃত্রিম বুদ্ধি (Artificial Intelligence) ইন্টেলিজেন্ট টিউটর (Intelligent tutor)-এর ভূমিকা পালন করে। এখানে এই 'Intelligent tutor' একজন গৃহশিক্ষকের কাজ করে। এই গৃহশিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে ব্যক্তিগত যত্ন নেয়, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা দেখিয়ে তাকে নির্দেশনা দেয়, শিক্ষার্থীর ভালো দিকগুলি সম্বন্ধে প্রশংসা করে এবং অনুশীলন করায় যাতে শিক্ষার্থীর ভুলের শতকরা হার অনেকখানি কমে যায়।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, এই ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি কম্পিউটারের সাহায্যে নির্দেশনার (CAI) থেকেও অনেক বেশি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। সুতরাং শিক্ষক না থেকেও শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে সবসময় শিক্ষকের সান্নিধ্য পায়। নীচের চিত্রে ইন্টেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতির কাঠামো দেখানো হয়েছে।

ইন্টেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জিম অং এবং তাঁর সহযোগী গবেষক বলেছেন—

"Imagine that each learner in a classroom setting has a personal training assistant who pays attention to the partcipont's learning needs, assesses and diagnoses problems and provided assitance as needed... providing a personal training assistant for each learner is beyond the training budgets of most organizations. However a virtual training assistant that captures the subject matter and teaching experience of experienced trainers provides a captivating new option. The concept known as intelligent tutoring system or intelligent computer-aided instruction" (ong, J and Ramachandran, S, 2000)

Scanned with CamScanner

(খ) **ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির উপাদান** (Components of intelligent tutoring system) :

Burns এবং Capps (১৯৮৮) ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

(i) **বিশেষজ্ঞের অংশ** (Expert module) : এই অংশের বিভিন্ন ভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিভিন্ন স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয়গুলি, বিশেষজ্ঞের জ্ঞান এবং সমস্যা সমাধানের বৈশিষ্ট্য।

(ii) **শিক্ষার্থীর অংশ** (Student module) : এই অংশটি বেশির ভাগ সময় শিক্ষার্থীর মডেল হিসেবেও পরিচিত। এই অংশে অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষার্থীর বোধ (understanding) বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ।

(iii) **শিক্ষণের অংশ** (Tutoring module) : এই অংশটিতে প্রধানত শিক্ষণের কৌশল এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে। কৌশল হিসেবে কখনই এই অংশে প্রকৃত শিক্ষককে রাখা হয় না। এই অংশটির মূল উদ্দেশ্যই হল বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের পার্থক্যকে ধীরে ধীরে যতখানি সম্ভব কমিয়ে আনা।

ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির এই তিনটি উপাদান একত্রে 'প্রচলিত ত্রয়ী' বা 'সনাতন ত্রয়ী' (Traditional Trinity) নামে অভিহিত।

(গ) **ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির প্রয়োগ** (Application of intelligent tutoring system) :

বর্তমানে এই ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি নানা বিষয়ে শিক্ষণ, নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও এই পদ্ধতির সম্প্রতি ব্যবহার শুরু হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির ব্যবহার সংক্ষেপে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হল—

(i) **The Love Machine :** David Diamond ২০০৩ সালে এটি তৈরি করেছেন। আমেরিকার MIT এটিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছেন।

(ii) **Pitch-perfect PC :** Alex Markels ২০০৩ সালে এটি সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করেছেন।

(iii) **Auto Tutor :** এই সফটওয়ারটি প্রকৃত শিক্ষকের মতো কথা বলে, দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি করতে সক্ষম এমনকি শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে পারে।

(iv) **Andes :** এটি হল পদার্থবিদ্যা বিষয়ের জন্য ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি।

(v) **Epsilon :** হিসাব শাস্ত্রে ব্যবহার করার জন্য এটি উদ্ভাবিত।

(vi) **Metutor :** US Naval Postgraduate School-এর N.C. Rowe এটি তৈরি করেছেন। এতে পদ্ধতিগত দক্ষতা শেখানোর ব্যবস্থা আছে।

সবশেষে বলা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধির উপর নানা ধরনের গবেষণা এবং কম্পিউটারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নানা ধরনের ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির প্রস্তুতি এবং ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে. দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি বর্তমানে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির কাজ প্রায় শিক্ষকের মতোই। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত নির্দেশনা এবং যত্ন নেওয়ার ফলে শিখন ভালো হয়। বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্যের সত্যতা প্রমানিত হয়েছে।

১.৫ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির বিকাশ (Inculcation of National Integrity through social science teaching) :

ভূমিকা : বর্তমান ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল জাতীয় সংহতি। জাতীয় সংহতি হল একটি বোধ, একটি উপলব্ধি এবং একটি চেতনার নাম যা জাতীয়বাদী মনোভাব ও জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতীয় সংহতি হল একটি ভাবগত আদর্শ। দেশের প্রতি আনুগত্য। দেশাত্মবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, সহযোগীতা, সহমর্মিতা, ঐক্যবোধ প্রভৃতি হল জাতীয় সংহতির মূল উপাদান। জাতীয় সংহতি হল 'a feeling of oneness' যা ব্যক্তিকে ছোটো ছোটো গণ্ডী, ভৌগোলিক সীমারেখা, উগ্র প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মান্ধতা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভাষাগত ব্যবধান প্রভৃতি বাধা অতিক্রম করে, আমরা ভারতবাসী, সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-এই বোধ ব্যক্তির মধ্যে উন্মেষ ঘটায়। অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমা ও গোষ্ঠীগত আনুগত্য অতিক্রম করে রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যের মনোভাব জাগ্রত হওয়াকেই বলা হয় **জাতীয় সংহতি**। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রতা ভুলে গিয়ে আমরা আসমুদ্রহিমাচল ব্যাপী ভারতবর্ষের সকলেই আমরা নাগরিক। আমাদের আশা, স্বপ্ন, ভালোলাগা সুখ-দুঃখ একসূত্রে গাঁথা। জাতীয় সংহতি কোনো দেশের নাগরিকের মধ্যে এই বোধের উন্মেষ ঘটায়। ভারতের জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণন কমিশন মন্তব্য করেন যে, "National Unity and Progress requires a deeper foundation than political and economic arrangements. It is the life of spirit that has shaped and united our collective existence and has been the real bond of oneness among the indian people."

১.৫.১ জাতীয় সংহতির ধারণা (Concept of National Integration) :

সাধারণভাবে জাতীয় সংহতি হল বিচ্ছিন্নতাবাদকে বর্জন করে, সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে খণ্ডাংশের পরিবর্তে সমগ্র দেশের প্রতি কোনো জাতির আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করা। জাতীয় সংহতির ধারণাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। **এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য নীচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হল—**

Scanned with CamScanner

ডরোথি থম্পসনের (Dorothy Thompson) মতে, "জাতীয় সংহতি হল একটি অনুভূতি, যা একটি দেশের জনসাধারণ বা নাগরিকদের একত্রে বেঁধে রাখে।"

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (Pt. Jawaharlal Nehru) বলেছেন " জাতীয় সংহতির দ্বারা আমরা আমাদের মন এবং হৃদয়ের সংহতি বুঝি যা **পৃথক করণের** অনুভূতিকে ভুলিয়ে রাখে।"

ড. ডি. এস কোঠারির নেতৃত্বে গঠিত 1964-66 খ্রিস্টাব্দের 'কোঠারি শিক্ষা কমিশনের' রিপোর্টে জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

জাতীয় সংহতি হল তাই, যা—

(1) জাতির ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা জাগায়।

(2) দেশের আপামর জনগণের জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি, দেশের বেকার যুবক-যুবতিদের সংখ্যা হ্রাস, দেশের বিভিন্ন অংশের উন্নতির জন্য সবরকম অসমতা দূরীভূত করে।

(3) নাগরিকতার মূল্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধাবন এবং খণ্ড অংশের পরিবর্তে সমগ্র দেশের প্রতি অনুগত্য প্রদর্শন করে।

(4) উন্নত মানের এবং নিরপেক্ষ শাসন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি, দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহারের আশ্বাস দেয়।

(5) দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের সাংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

❑ ১.৫.২ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা :

সাধারণভাবে জাতীয় সংহতি যে-কোনো জাতির উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। শুধুমাত্র অগ্রগতির শর্ত নয়, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র নিশ্চিত ও নিরপেক্ষ উপাদান। বারংবার আমাদের অনৈক্যের সুযোগ। বিদেশি আক্রমণে (হুন, আক্রমণ, গ্রিক আক্রমণ, মোঙ্গল আক্রমণ, পাঠানদের আক্রমণ, ইংরেজদের ভারত দখল) আমরা হারিয়েছি আমাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার। এই হারানো শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকেনি, ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়েছে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, লুণ্ঠিত হয়েছে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যও। সুতরাং যা ঘটেছে অতীতে, একই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে (১৯৬৪-৬৬) প্রকাশ যে "সামাজিক ও জাতীয় সংহতিই কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং যে-কোনো রাষ্ট্রে সমস্ত রকম উন্নতির জন্য খুবই প্রয়োজন।

ebook.dascoaching.in

❑ ১.৫.৩ জাতীয় সংহতির বিকাশে ইতিহাস শিক্ষণের ভূমিকা :

শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতিবোধের বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয়তাবোধের বিকাশ, স্বদেশ প্রীতির উন্মেষ ও বিকাশ, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা, দেশকে জানা, দেশের মানুষকে জানা, দেশের ভৌগোলিক সীমাকে জানা। "We the citizens of India" জাতীয় সংহতির বিকাশের জন্য এই ভারতীয়ত্ব বোধের বিকাশ ঘটানো খুবই জরুরি এবং এক্ষেত্রে ইতিহাস চর্চার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ভারতের ইতিহাস হল তাদের ইতিহাস যারা ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে। এখানে কোনো আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতার লেশমাত্র নেই। ইতিহাস পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে 'ভারতবর্ষের' এই অখণ্ডরূপটি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন না করে পরিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে একটি সামগ্রিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা প্রয়োজন ফলে শিক্ষার্থীদের অখণ্ড ভারতবর্ষের একটি সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করে (a version of India as a whole) এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একত্ব বোধ গড়ে ওঠে (The feeling for the 'one' in the many)।

▲ প্রতিটি জাতির নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে। এই সাংস্কৃতির উত্তরাধিকার বা সংস্কৃতিক ঐতিহ্যতার পরিচয় যা তাকে অন্যান্য দেশ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। ভারতীয় সংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সর্বসাধারণের সম্পদ। জাতীয় সংহতির বিকাশের জন্য ভারতীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার যথাযথ উপস্থাপন একান্তভাবে প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সকলের সমান অধিকার। প্রত্যেক ভারতবাসী এই জাতীয় সাংস্কৃতির অংশীদার। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের প্রতি অঞ্চলের সমস্ত ভাষাভাষি, সমস্ত ধর্মের, সমস্ত বর্ণের, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ সকল মানুষের অবদানে সমৃদ্ধ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার এবং শিক্ষকের কাজ হবে এই চেতনাকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হবে ও জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্থ হবে।

▲ ভারতবর্ষ হল একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এখানে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের জাতিগোষ্ঠীর প্রদেশের ও সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করে। এদের রীতিনীতি, বিশ্বাস, জীবনযাপন প্রণালী ও চিন্তন প্রণালী বৈচিত্র্যপূর্ণ। এটি ভারতীয় সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের অন্যতম দিক। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের** ভাষায়, "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—এটাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলে জানে না, সে পরকে শত্রু বলে কল্পনা করে না, এইজন্য ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে। স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।" সুতরাং বৈচিত্র্য কোনো নেতিবাচক বিষয় নয়। এটি ভারতীয় সংস্কৃতিক একটি ইতিবাচক দিক। যুগযুগ ধরে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও

Scanned with CamScanner

ভারতবাসী একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করে একত্রে বাস করছে। তাই শিক্ষকের ক
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই বিশেষত্বের দিকটি শিক্ষার্থীদের সামনে সঠিকভাবে উপস্থা
করা, যাতে শিক্ষার্থীরা এত বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার মূল ঐক্যের সূ
বুঝতে পারে। এটা শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার প্রে
যোগাবে।

▲ ভারতবর্ষে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ইতিহাসের পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যক্রমে একটি বি
জায়গা জুড়ে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবা
বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নেতৃত্ববৃন্দ ও শহিদদের বীরত্ব, ম
কীর্ত্তি ও তাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কঠোর প্রয়াস যথাযোগ্য মর্যাদা সহযোগে তুলে ধরতে হ
শিক্ষার্থীদের সামনে। এর ফলে এই সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধ
ভাব সৃষ্টি হয় এবং তারা উপলব্ধি করতে পারে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সম
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে
নরনারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস শিক্ষকের কাজ হবে সমস্ত প্রদেশে
নেতা ও নেত্রীবৃন্দের অবদান সমমর্যাদা সহকারে উপস্থাপন যাতে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি
করতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে সমগ্র ভারতবাসীর অবদানকে যা তাদের মধ্যে
ভাবগত ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না
বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত মহামানবেরা অংশগ্রহণ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন
তাঁরা কোনো বিশেষ অঞ্চল বা প্রদেশের নয়। তারা সমগ্র ভারতবর্ষের সম্পদ। এ কথা
শিক্ষার্থীদের বোঝানো দরকার।

▲ ভারতবর্ষের ইতিহাস হল ভারতবাসীর ইতিহাস। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের
ইতিহাস। বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস শিক্ষক সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করবেন। ভারতবর্ষের
ইতিহাস হিন্দু শাসকদের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস মুসলিম শাসকদের ইতিহাস।
ইতিহাসের শিক্ষক নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শাসকদের ইতিহাস উপস্থাপন
করবেন। ইতিহাসের বিতর্কিত স্পর্শকাতর বিষয়গুলি খুব সাবধানতার সঙ্গে পক্ষপাতহীনভাবে
উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন। এর জন্য প্রয়োজন ইতিহাস শিক্ষকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি
এবং নিরপেক্ষ মনোভাব। কোনো অবস্থাতেই যেন ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন না
করেন। তাতে সংহতি সাধনের কাজ বিড়ম্বিত হবে।

▲ ইতিহাস হল জাতীয় অতীত স্মৃতির বিবরণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দিলে
দেখা যায়—যখন দেশের রাজনৈতিক ঐক্য বর্তমান ছিল। তখন সম্রাট বা শাসকেরা এই
রাজনৈতিক ঐক্য প্রকাশ করার জন্য নিজেরা **একরাট, স্বরাট, রাজচক্রবর্তী** প্রভৃতি উপাধি
গ্রহণ করতেন এবং অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করতেন। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষের
একচ্ছত্র অধিপতি। সম্রাট আকবরও নিজেকে জাতীয় সম্রাট বলে মনে করতেন অর্থাৎ হিন্দু

ও মুসলমান প্রজার শাসক। ইতিহাস শিক্ষণের মাধ্যমে এই অতীত স্মৃতি সঠিকভাবে
পরিবেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে ভাবগত ঐক্য ও অন্তরের ঐক্য। আর
এই পথ ধরে গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতিবোধ।

▲ পূর্বে ইতিহাস বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসকে বোঝাত। কিন্তু বর্তমানে
ইতিহাসের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক,
সামাজিক, সংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চা করা হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাঠের মধ্য
দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, তাদের কার্যকলাপ,
চিন্তাভাবনা, শিল্প; সাহিত্য, ধর্ম বিশ্বাস, বিভিন্ন মহাপুরুষের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিতি
হয়। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে ভক্তি আন্দোলন, সুফী আন্দোলন, অশোক, আকবর প্রভৃতি
বিষয়গুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে এবং সংহতি বোধের প্রেরণা লাভ করে।

▲ জাতীয় সংহতির বিকাশে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। **নিম্নলিখিত ভাবে কার্যাবলির মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতিবোধের বিকাশ ঘটাতে পারেন—**

(১) ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ, আন্তরাজ্য ভ্রমণ
(২) ইতিহাসের বিষয় নিয়ে বিতর্কসভার আয়োজন।
(৩) মিউজিয়ামে পরিদর্শন ।
(৪) ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ের প্রদর্শনী।
(৫) ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ের পত্র-পত্রিকা পাঠ ও আলোচনাসভার আয়োজন।
(৬) বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, মহামানবের জীবন, আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামী বা জাতীয়বীরদের উপরে বক্তৃতা সভার আয়োজন।
(৭) জাতীয় দিবস পালন—১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি, ২৩ শে জানুয়ারি, ২ অক্টোবর ইত্যাদি।
(৮) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্ম দিবস পালন— ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, অরবিন্দ ঘোষ, মাতঙ্গিনী হাজরা, নেতাজী, গান্ধিজি ইত্যাদি।
(৯) বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে (যুব উৎসব) যোগদান।
(১০) বিভিন্ন জাতির ও উপজাতীর উৎসবে যোগদান।
(১১) জাতীয় মেলার আয়োজন।

▲ জাতীয় সংহতি বোধের বিকাশে ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। **পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।**

(১) জাতীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য ও জাতীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের পাঠ্যবই রচিত হবে।

Scanned with CamScanner

(২) ইতিহাস পুস্তকে সঠিক এবং সাম্প্রতিককালের তথ্য (Authentic, Accurate and up to date) পরিবেশিত হবে। এর মধ্যে কল্পনা, বিকৃত তথ্য, সংস্কার, কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে পুস্তক রচিত হবে না।

(৩) নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস রচনা করতে হবে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, অঞ্চল, সংস্কৃতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা অনুচিত।

(৪) পাঠ্য পুস্তক কখনোই অন্ধ আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। কোনো রাজনৈতিক দল বা শাসক গোষ্ঠীর মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেও রচিত হবে না।

(৫) ইতিহাস গ্রন্থে স্বদেশের শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, জীবনধারা, প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাস রচনা করতে হবে। রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

(৬) পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সর্বভারতীয় ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করতে হবে। বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, গুজরাট, কাশ্মীর দাক্ষিণাত্য, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাস রচনা করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশের সকল নেতৃবৃন্দের অবদান সমান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে International understanding may be defined as informed conciousness of the place of one's own nation in the world societies and the contribution that it can make to world society. Whose survival depends upon maintenance of peace and relief from war."

◆ **আর্ন্তজাতিকতাবোধের বিকাশে ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা** (Teaching History for International Understanding) : আন্তর্জাতিকতার অর্থ হল বিশ্বের প্রতি ভালোবাসা। এটি একটি মানসিক অনুভূতি। এই অনুভূতির ফলে মানুষ নিজেকে বিশ্বের একজন নাগরিক হিসেবে মনে করে। তার চিন্তাভাবনা নিজের রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আন্তর্জাতিকতা বলতে বোঝায়, জাতীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তাই **জিমার্ন** (Zimmern) বলেছেন— "জাতীয়তাবাদের পথ ধরেই আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছানো যায়। অর্থাৎ বিশ্বসভ্যতার প্রয়োজনে প্রকৃত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। এই ভালোবাসার নাম আন্তর্জাতিকতা। মানবজাতির ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব হল আন্তর্জাতিকতার মূল কথা।" ঐতিহাসিক **স্মিথ** (Smith) মন্তব্য করেছেন - "Internationalism is the feeling that the individual is not only a member of his state, but citizen of the world." তবে আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তি সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। ব্যক্তির মধ্যে এই মানসিক অনুভূতি জাগ্রত হলে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি

ও সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিশ্বের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। এইভাবে বিশ্ববাসীর মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয় ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে।

(i) **বিশ্বজনীনতাবোধ সৃষ্টিতে ইতিহাস :** হিংসা, দ্বেষ ও জিঘাংসা, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। UNESCO-র মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, "মানুষের মনেই যুদ্ধের জন্ম আর এই মনেই শান্তির বীজ বপন করতে হবে।" ("Since wars began in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed")। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে দেশে দেশে হিংসা ও কুটিলতার পরিবর্তে বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করা যায়। দেশ-বিদেশের ইতিহাস চর্চা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যবোধ সৃষ্টি করে।

(ii) **আন্তর্জাতিক সচেতনতা ও সম্প্রীতি :** উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। তেমনই আন্তর্জাতিক সচেতনতার জন্ম হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব, যানবাহনের উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার, বিজ্ঞানের উন্নতি, আন্তর্জাতিকতাবোধকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে। আন্তর্জাতিক নানা সম্মেলন, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি, U.N.O.-র কর্মসূচি বিশ্ববাসীকে এক অখণ্ড পৃথিবী গঠনে সচেতন করে তুলেছে।

(iii) **মানব প্রগতিতে ইতিহাস :** মানব জাতির সমৃদ্ধি ও প্রগতির ইতিহাস আমাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। এই ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে ঔপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, শোষণবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রায় লুপ্ত হয়।

(iv) **বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে ইতিহাস :** বিশ্বের প্রতিটি দেশের বিদ্যালয়ে যদি বিশ্ব শিক্ষা দিবস, UNESCO দিবস, রাষ্ট্র সংঘ প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপন, দেশি, বিদেশি ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও আন্তর্জাতিক কলা ও চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ গড়ে উঠবে।

(v) **আন্তর্জাতিক সংবেদনশীলতার ইতিহাস :** ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসপটে জন্ম নেয় এক অপরূপ পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন। সংকীর্ণ আত্মদ্বন্দ্বে দৃঢ় পৃথিবীতে নেমে আসে মহামিলনের ঐকতান। সংবেদনশীলতার মাধ্যমে জন্ম নেয় অহিংস বিশ্ব মানবতাবোধ।

(vi) **যুদ্ধের বাতাবরণরোধে ইতিহাস :** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে Cold war—বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিষিকা থেকে মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে ইতিহাসের মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গঠন সম্ভব। বিভিন্ন জাতির স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্বকে যথাযথ মর্যাদাদানের মাধ্যমে গড়ে উঠবে আন্তর্জাতিকতার মনোভাব। তার শ্রেষ্ঠ পথ হল ইতিহাস।

Scanned with CamScanner

(vii) **পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টিতে ইতিহাস :** বর্তমান বিশ্বে কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের পক্ষে একক প্রচেষ্টার দ্বারা নিজ নিজ উন্নতি ও সমৃদ্ধি কখনো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সকল রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। কারণ বিভিন্ন জাতি একত্রে বসবাস করলে এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হলে মানব সমাজ কল্যাণ ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। বস্তুত আন্তর্জাতিকতার মূল নীতি হল নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও (Live and let live)। এইভাবে বিশ্বের ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হবে।

(viii) **বিশ্বশান্তি ও মানব সভ্যতা সংরক্ষণে ইতিহাস :** বিশ্বশান্তি ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকতার প্রয়াজন সবচেয়ে বেশি। বর্তমান কালের আণবিক যুদ্ধ হবে সামগ্রিক যুদ্ধ। যার পরিণাম হল সামগ্রিক ধ্বংস। পারমাণবিক যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অন্তর্জাতিকতার আদর্শকে বাঁচাতে হবে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে, না হলে অন্যথায় আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। রাসেল (Russel)-এর বক্তব্য হল, "হয় মানুষ যুদ্ধকে শেষ করবে, না হয় যুদ্ধই মানুষকে শেষ করবে।" ("Either man will abolish war, or war will abolish man.") পণ্ডিত নেহরু (Nehru) বলেছেন—"শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প হল সম্মিলিত ধ্বংস।" (The alternative to peaceful co–existence is co-destruction")। আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ও পথ মানব সভ্যতাকে জাতীয় এই চরম সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাহলে পৃথিবীতে সৌভাতৃত্বমূলক এক আন্তর্জাতিক সমাজের সৃষ্টি হবে।

সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, আগামী দিনের নাগরিককে বিশ্ব নাগরিক রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কবির ভাষায় বলা যায়— "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে বর্তমান সভ্যতার সংকট দূর করতে ইতিহাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংকীর্ণ স্বার্থদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থেকে উন্নততর পৃথিবী গঠন করতে ইতিহাস অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 2

১। ইতিহাস শিক্ষণের দুটি উদ্দেশ্য কী? (What is two objectives of teaching History)

২। ইতিহাস শিক্ষণের দুটি মূল্য কী (What is two value of teaching History)

৩। উদ্দেশ্য গঠনের প্রধান ভিত্তি কী? (What are bases of formation of objectives?)

৪। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যগুলি কী কী? (What are the functions of educational objectives?)

৫। উদ্দেশ্য নির্বাচনের শর্তগুলি কী কী? (What are the criteria of selection of objectives?)

৬। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference 'Aims' and 'Objectives'?)

৭। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রধান ছয়টি শ্রেণির নাম কর। (Write six main classes or steps of cognitive domain.)

৮। জ্ঞানের প্রধান তিনটি দিক কী কী? (What are the main three aspect of knowledge?)

৯। নির্মিতিবাদ কী (What is constructivism?)

১০। নির্মিতিবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখো। (Write four characteristics of constructivism?)

১১। প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ কাকে বলে? (What is cognitive constructivism?)

১২। সামাজিক নির্মিতিবাদ কাকে বলে? (What is social constructivism?)

১৩। 'মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা' কী (What is Brain storming?)

১৪। 'চিন্তনমূলক শিক্ষণ' কী? (What is Reflective Teaching?)

১৫। চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the objectives of Reflective Teaching?)

১৬। ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি কাকে বলে? (What is intelligent tutoring system?)

১৭। ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির উপাদানগুলি কী কী? (What are the components of intelligent tutoring system?)

১৮। জাতীয় সংহতি কাকে বলে? (What is National Integration?)

Scanned with CamScanner

১৯। জাতীয় সংহতির উপাদানগুলি কী কী? (What are the components of National Integration?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন। (Write in brief the functions of Educational Objectives.)

২। নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের ধারণা দিন। (Give the concept of Instructional objectives.)

৩। ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of History with Geography.)

৪। ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of History with Political Science.)

৫। ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of History with Economics.)

৬। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of History with Literature.)

৭। নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of Constructivism?)

৮। চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of Reflective Teaching?)

৯। শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমাধ্যমের প্রকৃতি উল্লেখ করুন। (Write the nature of multimedia in Education.)

১০। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি কী কী? (What are the needs for National Integration?)

১১। জাতীয় সংহতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী? (What is the role of educational institution in National Integration?)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks – 10

১। বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Discuss the aims and objectives of teaching History in school level.)

২। ইতিহাস শিক্ষণের মূল্য বর্ণনা করুন। (Describe the values of teaching History.)

৩। বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে ইতিহাসের স্থান নির্ণয় করুন। (State the place of History in school curriculum.)

৪। নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। (Discuss the characteristics of constructivist classroom.)

৫। নির্মিতিবাদ শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of teacher in constructivist approach of teaching?)

৬। চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী? (What are the advantages and disadvantages of Brain Storming Strategy?)

৭। জাতীয় সংহতিতে শিক্ষার ভূমিকা কী? (What is the role of education in National Integration?)

৮। জাতীয় সংহতিতে ইতিহাস শিক্ষণের ভূমিকা কী? (What is the role of teaching History in National Integration?)

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

অধ্যায় ২

সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) শিক্ষণের কৌশল
(Strategies of Social Science Teaching)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

২.০ বিভিন্ন শিক্ষার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা এবং তুলনা (Features, Limitations and comparison of different methods)

২.১ বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)

২.২ আলোচনা বা মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি (Interactive Method)

২.৩ প্রতিপাদন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Demonstration-observation method)

২.৪ আঞ্চলিক পদ্ধতি (Regional Method)

২.৫ আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method)

২.৬ প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)

২.৭ কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (CAI)

Scanned with CamScanner

✪ ২.০ বিভিন্ন শিক্ষার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা এবং তুলনা (Features, Limitations and comparison of different methods) :

◆ ভূমিকা :

শিক্ষণ একটি জটিল কাজ। এই কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কোনো পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ও অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। প্রত্যেক পদ্ধতির যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে. তেমনি তার অসুবিধাও অনেক। শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ অংশ শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। প্রয়োজন মতো বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠদান প্রক্রিয়াকে সফল করে তোলা যায়। সমাজবিজ্ঞান পাঠদানের নানারকম কৌশল ও পদ্ধতি আছে। পশ্চিমবঙ্গে নবপ্রবর্তিত বি.এড. স্তরের সমাজবিজ্ঞান পাঠদানের জন্য বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি হল—বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা বা মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি, উৎস পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি, আঞ্চলিক পদ্ধতি ও প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি বিশদে আলোচিত হয়েছে।

উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন একটি গুরুত্ব কাজ। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে খুব সাধারণতার সঙ্গে পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়।

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, বিদ্যালয়ের তথা শ্রেণিকক্ষের পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ছাত্রসংখ্যা, ক্লাসের দৈর্ঘ্য (class hour), শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিবেচনা করে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ্ধতি নির্বাচন করা প্রয়োজন।

◆ ইতিহাস শিক্ষণের মূলনীতি :

★ কালানুক্রমিকতার নীতি (Principle of Chronology) :

ইতিহাসের দুটি চোখ হল স্থান ও কাল। মানব সভ্যতার কালনুক্রমিক (Choronological order) নিরবচ্ছিন্ন ধারাই হল ইতিহাস। স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়। তাই স্থান চেতনার ন্যায় কাল চেতনা ইতিহাস পঠন পাঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। **V.D. Ghate**-এর মতে, "This conception of time pregnant with life and action is very important to history. "অর্থাৎ কালের সঙ্গে জীবন ও কার্যের যোগসূত্র রচিত হলে বিষয়টি ইতিহাসে গুরুত্ব অর্জন করে। তাই ইতিহাস শিক্ষণে কালচেতনার মূল্য অপরিসীম। মানব সভ্যতার উত্থান, বিকাশ, ও ক্রমগতির ধারা কালক্রমের সঙ্গে জড়িত কোনো যুগান্তকারী ঘটনা, ইতিহাসের ভাঙাগড়া, কোনো বিশেষ সভ্যতার উত্থানপতন কালের ক্রমগতির সঙ্গে সংযুক্ত। কালক্রমকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে ইতিহাস চেতনার জাগরণ ঘটে না। তাই কালচেতনাই ইতিহাস শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ এবং শিক্ষক

অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিষয়বস্তু কালানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী উপস্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সময় চেতনা গড়ে ওঠে।

★ ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of continuity) :

ইতিহাসের অপরিহার্য ধর্ম হল নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ধর্ম। এই ধারাবাহিকতার ধর্ম বা নীতি অনুসরণ করে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা প্রয়োজন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান ইতিহাস সমিতিতে **এডওয়ার্ড পিচেনি** (Edward. P. Cheyney) বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাসের ছটি বিধির (Law) কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে একটি হল নিরবচ্ছিন্নতার বিধি (Law of continuity)। ইতিহাস হল অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাস প্রবহমান, ধারাবাহিকতা এর প্রাণ। ইতিহাস বয়ে চলে অবিরত। একটি যুগের শেষ এবং পুরোনো যুগের গর্ভে জন্ম নেয় নতুন যুগ। একটি যুগের শেষ ভাগ এবং অপর যুগের প্রথমভাগ একই সময়সীমার মধ্যে অবস্থান করে। মানব সমাজের ক্রমউন্নতির ধারা ইতিহাসে বিবৃত হয়। প্রগতির বা ক্রম উন্নতির এই ধারায় বহু ঘটনা ঘটে। প্রত্যেকটি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সুতরাং ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতার নীতি অনুসরণ করে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।

★ নৈর্ব্যক্তিকতার নীতি (Principle of objectivity) :

ইতিহাস হল বিজ্ঞানের সমতুল্য। নিরপেক্ষতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা হল ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিকের একমাত্র কাজ হল সত্য ঘটনাবলির বা কাহিনি হুবহু উপস্থাপন করা। এখানে কল্পনা, অনুমান, ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায় কোনোরকম ব্যক্তিসাপেক্ষতার (Subjectivity) কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞানের কঠোর বাস্তবতা ও গভীর বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচিত হবে এবং শিক্ষার্থীদের সামনে তা উপস্থাপিত হবে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি উপস্থাপনে সচেষ্ট হবেন। তবে "History is social physics." মানুষ তথা সমাজবিজ্ঞানী যখন মানুষের ও মানুষের কার্যকলাপ বা আচরণ নিয়ে পর্যালোচনা করে তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিস্বার্থ, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি ব্যক্তি সাপেক্ষতার (Subjective Forces) বিষয়গুলি সক্রিয় থাকে। তাই শিক্ষককে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। সমস্তরকম জাতীয়, সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক প্রভৃতি প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

★ কার্যকারণ সম্পর্কের নীতি (Principle of Cause-Effect Relationship) :

ইতিহাস হল বিজ্ঞান। প্রকৃতি বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে প্রাকৃতিক বা জাগতিক প্রতিটি ঘটনার পিছনে কোনো না কোনো কারণ আছে। ঠিক তেমনি অতীতে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে এক বা একাধিক কারণ আছে। ফরাসি দার্শনিক **মন্তেস্কু** তাঁর Spirit of

Scanned with CamScanner

Laws গ্রন্থে বলেন "এই পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পিছনে লুকিয়ে আ
কারণ।" অধ্যাপক **কারের** মতে, "the study of history is a study of Causes
দার্শনিক **ভলতেয়ার** যথার্থই বলেছেন যে "ঘটনার মূলে নিহিত কারণ বিশ্লেষণ ব্যতীত
বর্ণনামূলক ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য নেই। এটা আমাদের কোনো কাজে আসে না এ
আসতে পারে না।" অর্থাৎ ইতিহাস শুধু বর্ণনাধর্মী (Narrative) নয়, ইতিহাস বিশ্লেষণ
ও ব্যাখ্যানির্ভর। ঐতিহাসিকের কাজ হবে এই কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করা। ইতিহা
শিক্ষকের কাজ হল প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে যে কার্যকারণ সম্পর্ক হয়েছে সেটি
বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে ইতিহাসের শিক্ষক
সতর্ক থাকতে হবে, কারণ একটি ঘটনার পিছনে একাধিক কারণ থাকে। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসি
ও শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ, যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক কারণটি নির্বাচন বা গ্রহণ করতে হবে
ইতিহাসকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে এবং এই নির্বাচন অবশ্য
ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ভিত্তিতে হবে।

★ সর্বজনীনতার নীতি (Principle of Universality)

ইতিহাস হল সর্বজনীন। ইতিহাস শুধুমাত্র রাজাবাদশার কাহিনি নয়। শ্রমিক, কৃষ
রাজা, প্রজা, বীরনায়ক সকলেই হলেন ইতিহাসের কুশীলব। সকলের কথা সমানভাবে গুরু
দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে।

★ অনুবন্ধের নীতি (Principle of Co-relation) :

সুশিক্ষণ পদ্ধতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অনুবন্ধনীতি। জ্ঞান, অখণ্ড ও অবিভাজ্য
জ্ঞানের এই অখণ্ডতার ধারণা থেকে অনুবন্ধ তত্ত্বের সৃষ্টি। ষোড়শ শতাব্দীতে এই ধারণা
বিকাশ, কমেনিয়াস, পেস্তালৎসী, হার্বার্ট, জিলার, জন ডিউই, মহাত্মাগান্ধি প্রমুখ মনীষী
শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় এই ধারণাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের বিভি
শাখার মধ্যে আপাত-বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান
বস্তুত জ্ঞানের কোনো শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। জ্ঞানের প্রতিটি শাখার মধ্যে সংযোগের ফ
প্রত্যেকটা শাখাই পরিপুষ্ট হয়। তাই বলা হয়— "Knowledge is one whole and
should be imparted and received as a whole." জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসে
ইতিহাস অন্যান্য জ্ঞানের শাখাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঐতিহাসি
ট্রেভেলিয়ানের মতে, "History is not a subject at all but a house in which all
subjects dwall." সুতরাং অনুবন্ধতত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু উপস্থাপ
করা শুধু অভিপ্রেত নয়, অপরিহার্যও বটে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব
সাহিত্য, শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপ
করা প্রয়োজন। এছাড়া ইতিহাসের সঙ্গে চলতি প্রসঙ্গের (Current Affairs) অনুব
স্থাপন করা প্রয়োজন।

★ মনোবিজ্ঞানের নীতি (Principle of Psychology) :

শিক্ষা হল একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ভালো শিক্ষণপদ্ধতি কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে চলে। যেমন জানা থেকে অজানা (known to unknown), সরল থেকে জটিল (simple to complex), মূর্ত থেকে বিমূর্ত (concreate to abstract), ইত্যাদি। ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। স্থানীয় ইতিহাস (Local History), আঞ্চলিক ইতিহাস (Regional History), জাতীয় ইতিহাস (National History) এবং সবশেষে বিশ্ব ইতিহাস (World History)-এভাবে ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা উচিত। শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থাৎ যত উঁচু স্থানে যাবে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

★ সামগ্রিকতার নীতি (Holistic Approach) :

ইতিহাস হল মানুষের কথা কাহিনি। ইতিহাসের কেন্দ্রীয় উপাদান হল মানুষ। মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা। মৌলিক বিচারে ইতিহাস এক ও অখণ্ড সামগ্রিক মানব সমাজের ইতিহাস। বিশ্বের মানব জাতির ও তাদের সমাজের বিবর্তনের কাহিনি ইতিহাসের উপজীব্য। ইতিহাস হল সর্বকালের সর্বযুগের সামগ্রিক বিশ্ব সমাজের ক্রমবিবর্তনের বিবরণ। স্থানভেদে ইতিহাসকে ভাগ করা যেতে পারে—স্থানীয় ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাস। কালভেদে ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসকে ভাগ করা যায়—সামাজিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, ধর্মীয় ইতিহাস, সংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রশাসনিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস, নারীর ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, শিক্ষার ইতিহাস ইত্যাদি। এভাবে ইতিহাসকে বিভক্ত করা হলেও বস্তুত প্রতিটি বিষয় এক ও অখণ্ড বিশ্বমানবের বিশ্বসমাজের ইতিহাসের অংশ ভিন্ন কিছুই নয়। ইতিহাস শিক্ষণের মধ্য দিয়ে এই সামগ্রিকতার ও সার্বজনীনতার ছবিটি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

★ সক্রিয়তার নীতি (Principle of Activity) :

সক্রিয়তা হল শিশুর প্রাণ ধর্ম। শিশু সাধারণত কর্মচঞ্চল। সর্বদা কিছু করতে চায়। নির্মিতিবাদ তত্ত্ব জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ ও শিক্ষার অধিকার আইনি সক্রিয়তাভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইতিহাস শিক্ষণ শিশুর এই সক্রিয়তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। বিতর্ক (Debate), কুইজ, প্রজেক্ট প্রভৃতি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

Scanned with CamScanner

❂ ২.১ বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) :

ইতিহাস পড়ানোর ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলি প্রচলিত আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রাচীতম পদ্ধতি হল বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)। এটি Oral Method বা Telling Method নামেও পরিচিত। এটি হল শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি। শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হল বিষয়বস্তুটি বক্তৃতার মাধ্যমে বা মৌখিকভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সক্রিয় বক্তা এবং শিক্ষার্থীরা নীরব ও নিষ্ক্রিয় শ্রোতা, এই পদ্ধতি অমনোবৈজ্ঞানিক। ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি এই পদ্ধতিতে অনুসৃত হয় না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকেরা যেন তেন প্রকারে পাঠ্যসূচি (Syllabus) শেষ করার দিকে বেশি নজর দেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গড় ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেশি (৬০-১০০) এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কম। এছাড়া দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিশেষত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, তাই বক্তৃতা পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

★ **বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of Lecture method) :

(i) এটি হল মৌখিক শিক্ষণ পদ্ধতি।

(ii) এই পদ্ধতি হল শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা প্রধান। শিক্ষক বক্তৃতার সাহায্যে পাঠ্যবিষয় বস্তু উপস্থাপন করেন।

(iii) এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়, এখানে ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করে শিক্ষা দান করা হয় না। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পূর্ব শিক্ষা বা সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে পাঠদান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়না। এই পদ্ধতিকে 'One way communication বলে অভিহিত করা হয়।

(iv) এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করা সহজ হয়।

(v) অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শিক্ষাদান করা যায়।

(vi) এখানে শিক্ষার্থী গৌণ, পাঠ্য বিষয় মুখ্য।

(vii) এইপদ্ধতিতে কর্ম অভিজ্ঞতার সুযোগ নেই বললে চলে।

(viii) এই পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(ix) এই পদ্ধতিতে অর্থের প্রয়োজন খুবই কম।

(x) এই পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত তথ্য জ্ঞান (Information) প্রদান করা হয়।

(xi) এই পদ্ধতিতে পাঠদান করে শিক্ষার্থীদের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে মূল্যায়ন করা হয়।

★ **একটি ভালো বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of a good Lecture) : একটি ভালো বক্তৃতা প্রদানের জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হয়—

(১) **শিক্ষকের অবস্থান** : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যখন বক্তৃতা রাখার জন্য প্রস্তুত হবেন তখন তিনি এমনভাবে অবস্থান করবেন বা দাঁড়াবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দে তাঁকে দেখতে পায়। শিক্ষক এমন একটি সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়াবেন যেখানে দৃষ্টিমূলক শিক্ষা-উপকরণগুলি দেখা যায় এবং শিক্ষকের বক্তৃতা খুব স্বচ্ছন্দে শিক্ষার্থীরা শুনতে পায়।

(২) **বাহ্যিক রূপ** : শিক্ষকের চেহারা বা বাহ্যিক রূপ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষকের সাজপোষাক হবে পরিচ্ছন্ন, রুচিসম্পন্ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই। এককথায় তাঁকে দেখলেই শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধায় আগ্রহ অর্জন করবে।

(৩) **চাল-চলন ব্যবহার** : বক্তৃতা চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মনোযোগকে ধরে রাখার জন্য শিক্ষকের আচার-আচরণের সংযম যেমন দরকার তেমনি অন্যদিকে মার্জিত ও অমায়িক ব্যবহার দরকার।

(৪) **দেহভঙ্গি** : বক্তৃতা চলাকালে শিক্ষকের কার্যাবলি ও দেহভঙ্গি যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া দরকার। কোনোরকম মুদ্রাদোষ যেন প্রকাশ না পায়, যেমন চক দিয়ে খেলা বা ছোঁড়াছুঁড়ি করা, ঠোঁট কামড়ানো, কিংবা অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি করা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৫) **কণ্ঠস্বর** : শিক্ষকের কণ্ঠস্বর ব্যবহৃত হবে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে। কণ্ঠস্বরে যেমন আত্মবিশ্বাস, আবেগ নিয়ন্ত্রিত থাকবে তেমনই প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে স্বরের ওঠানামা হবে। উচ্চারণ হবে স্পষ্ট।

(৬) **শব্দজ্ঞান** : শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা দেন খুব সহজ সরল ভাষায়। কোনো জটিল, অস্বাভাবিক শব্দ বা অশালীন শব্দ ব্যবহার করবেন না যাতে শিক্ষার্থীরা ভুল ব্যাখ্যা করে। ভাষাগত কু-অভ্যাস থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। শিক্ষার্থীদের বোধগম্য শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা উচিত।

(৭) **দৃষ্টি-শ্রবণমূলক উপকরণের ব্যবহার** : গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ব্যবহার করার সময় শিক্ষক যেমন ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করতে পারেন তেমই সম্ভব হলে দৃষ্টি শ্রবণমূলক উপকরণ ও ব্যবহার করতে পারেন। যাতে বক্তৃতার মূল্য বা গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

(৮) **সময়ের ব্যবহার** : বক্তৃতার মূল বস্তু আলোচনার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য শেষের দিকে ১০ মিনিট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন। সমস্ত বিষয়টি কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে শেষ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

★ **বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা** (Need of Lecture method) : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে—

(i) পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা প্রসঙ্গে বা নতুন পাঠের সূচনা প্রসঙ্গে।
(ii) পরীক্ষা করে দেখানো সম্ভব নয় এমন কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যাদানে।
(iii) বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শিক্ষাদানের সময়।
(iv) পাঠের বিষয় উপস্থাপনের শেষে সামান্যীকরণের (Generalization) সময়।
(v) শিক্ষা বিষয়ক কোনো নির্দেশনা দানের সময়।
(vi) তথ্য বহুল কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময়।
(vii) পাঠ দ্রুত সমাপ্ত করার সময়।
(viii) কোনো প্রতিপাদন (Demostration) করার আগে ও পরে বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনার সময়।

★ **বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা** (Advantages of Lecture method) :

(i) অল্প সময়ে অনেক তথ্য পরিবেশন করা যায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচি শেষ করার ব্যাপারে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।
(ii) একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট বা অল্প সময়ে বহু শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শিক্ষাদান করতে পারেন।
(iii) অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক। কারণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে ব্যয় খুবই কম।
(iv) এই পদ্ধতির জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ।
(v) কম সময়ে অনেক শিক্ষার্থীকে বহু তথ্য পরিবেশন করা যায়।
(vi) ইতিহাস, সাহিত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্শন, সমাজতত্ত্ব, প্রভৃতি উপস্থাপনে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

★ **বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা** (Disadvantages of Lecture method) :

(i) এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়, এখানে ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করা হয় না। ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের উপযোগী নয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা, সমস্যা ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করা হয় না।
(ii) আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষণ হল Two way communication' এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষণ হল one way communication শিক্ষণ এখানে সর্বেসর্বা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অবহেলিত।
(iii) এই পদ্ধতি শিক্ষক কেন্দ্রিক।

(iv) শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া (Student - Teacher interaction) অনুপস্থিত। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না।
(v) এই পদ্ধতিতে কর্মের মাধ্যমে শিখনের কোনো সুযোগ নেই। ফলে হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়।
(vi) এই পদ্ধতিতে শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন।
(vii) অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকের দীর্ঘ বক্তব্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্লান্তি একঘেয়েমি ও বিরক্তি সৃষ্টি করে ও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।
(viii) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের পরিপন্থী।
(ix) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় আগ্রহ ও মনোযোগ বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না।
(x) এই পদ্ধতি বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে ব্যর্থ।
(xi) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা বিকাশের অনুপযুক্ত।
(xii) এটি 'Rote Learning' বা মুখস্থ বিদ্যায় উৎসাহী করে।

★ **বক্তৃতা পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উপায় :**

(i) শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন অর্থাৎ সঠিকভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।
(ii) পাঠ ঘোষণার বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করতে হবে।
(iii) শিক্ষকের উপস্থাপনা আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং এই কারণে বর্ণনা, ব্যাখ্যা দান, দৃষ্টান্ত উল্লেখ প্রভৃতি দক্ষতার ফলে ব্যবহার করতে হবে।
(iv) বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠদান চলাকলীন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে হবে।
(v) শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে বক্তৃতা দান করতে হবে। চার্ট, মডেল, ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করে মৌখিক বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে।
(vi) ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ বেশি করতে হবে।
(vii) বক্তৃতা ন্যূনতম ও প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন।
(viii) শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের স্তর ভিত্তিক বক্তৃতা দেওয়া উচিত।
(ix) বক্তৃতা দানের সময় শিক্ষক শিক্ষিকা সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করবেন।
(x) শিক্ষকের উচ্চারণ হবে স্পষ্ট। শিক্ষক কণ্ঠস্বরের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বরের ওঠানামা হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে শিক্ষকের বাচনভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

Scanned with CamScanner

★ **উপসংহার :** নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগেও বক্তৃতা পদ্ধতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না, সুপ্রাচীন কাল থেকে আজও পর্যন্ত ভারতের বক্তৃতা পদ্ধতি সমানভাবে জনপ্রিয়।

২.২ আলোচনা বা মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি (Interactive Method) :

ইতিহাস বিষয়ের যে-কোনো বিষয়বস্তু আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করতে পারে। সাধারণ অর্থে আলোচনা বলতে আমরা পারস্পরিক মত বিনিময়ের প্রক্রিয়াকে বুঝি। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষকের সহযোগিতায় আলোচনার মাধ্যমে কোনো নতুন সিদ্ধান্তে পৌছানো বা কোনো নতুন সত্যকে আবিষ্কার করা যায়। **মাইকেল লি** (Michael Lee) বলেছেন, "Discussion is an educational group activity in which the teacher and the students co-operatively talk over some problems or topics." অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় কোনো বিশেষ সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে আলাপ করেন তাকে বলা হয় আলোচনা পদ্ধতি।

আলোচনা পদ্ধতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে কতকগুলি বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন–

(১) আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনার জন্য প্রথমে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাধারণত শিক্ষার্থীদের সামর্থ, আগ্রহ, চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় স্থির করা হয়। বিষয়টি পাঠের অংশভিত্তিক হতে পারে বা সমস্যামূলক হতে পারে।

(২) আলোচনার লক্ষ ও উদ্দেশ্য স্থির করা প্রয়োজন।

(৩) আলোচনার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন। যে বিষয় বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকের যদি কোনো ধারণাই না থাকে তাহলে তারা আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না।

(৪) সব শিক্ষার্থীরা যেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে তার দিকে নজর দিতে হবে। যে শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছে না তাদের উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে।

(৫) আলোচনা যেহেতু একটি দলগত পদ্ধতি সেই কারণে শিক্ষককে একটি দল গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণির শিক্ষার্থী দলে থাকতে পারে অথবা সমগুণসম্পন্ন কয়েকজন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলগঠন করা যায়।

(৬) একজন দলনেতা থাকবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকই দলের নেতৃত্ব দেবেন।

(৭) আলোচনার একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন।

(৮) শিক্ষককে দক্ষতার সঙ্গে শ্রেণি পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষক যদি ঠিকমতো আলোচনা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন তাহলে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে।

ebook.dascoaching.in

(৯) সবশেষে আলোচনার মূল্যায়ন প্রয়োজন। যে উদ্দেশ্য আলোচনা করা হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল হল তা জানা বাঞ্ছনীয়।

● **আলোচনা পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ ও পরিচালন পদ্ধতি :** আলোচনা পদ্ধতিকে প্রথম দুভাগে ভাগ করা হয়—

(১) দলগত অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Informal Group Discussion)

(২) দলগত নিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Formal Group Discussion)

নিয়ন্ত্রিত দলগত আলোচনাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়—

(ক) প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion)

(খ) সিম্পোজিয়াম (Symposium)

(গ) সেমিনার (Seminer)

(ঘ) গোল টেবিল আলোচনা (Round Table Discussion)

১। দলগত অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Informal Group Discussion) :

এই আলোচনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলিতভাবে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনায় কোনো নির্দিষ্ট কার্যসূচি বা Agenda থাকে না। পূর্বনির্ধারিত কোনো বিধিনিষেধ ও আরোপ করা হয় না। দলের যে-কোনো সদস্য আলোচনা শুরু করতে পারে। আলোচনায় অংশ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। অন্যান্য সদস্যরা বিষয়টির ওপর প্রশ্ন করতে বা ব্যাখ্যা চাইতে পারে। শিক্ষকের প্রধান কাজ আলোচনাকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং শেষে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের মূল্যায়নে তিনি সহায়তা করবেন।

২। দলগত নিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Formal Group Discussion) :

এই আলোচনা পূর্বকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক দলের একজন করে দলনেতা ঠিক করা হয়। এই দলনেতারাই আলোচনার সার্বিক দায়িত্বে থাকেন। শেষে আলোচনার ফলাফল নথিভুক্ত করা হয়।

(ক) প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion) :

এই আলোচনায় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে প্যানেল তৈরি করা হয়। প্যানেলের সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে ৮ জনের বেশি হয় না। প্যানেলের আলোচনায় একজন নেতা নির্বাচন করা হয়। তা সভাপতি (Chairman) চেয়ারম্যান সাধারণত শিক্ষক-ই হয়ে থাকেন। প্যানেলের সদস্যরা আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে শ্রেণির সামনের দিকে বসে পরস্পরের মধ্যে আলোচন করেন। সভাপতি হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

তিনি প্রথমে আলোচনার বিষয়বস্তু ঘোষণা করেন এবং এর গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। আলোচনার শেষে আলোচনার সারাংশ সকলের সামনে তুলে ধরেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। আলোচনা কতটা সার্থক হয়েছে মূল্যায়ন করার দায়িত্ব শিক্ষকের।

(খ) **সিম্পোজিয়াম** (Symposium) :

প্যানেল আলোচনার থেকে সিম্পোজিয়াম আলাদা। এখানে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যের সংখ্যা ২-৩ জন। এই নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বা সদস্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয় আলোচ্য বিষয়ের ওপর ছোটো ছোটো প্রবন্ধ রচনা করতে। শিক্ষকই সভাপতিত্ব করেন। তাঁর নির্দেশে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাঁদের প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন এবং পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে। শ্রোতা শিক্ষার্থীরাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

(গ) **সেমিনার** (Seminar) :

আলোচনা সাধারণত কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পূর্ব থেকেই শিক্ষার্থীদের বিষয় দিয়ে দেওয়া হয় এবং বিষয়টিকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রপত্রিকার reference শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত এবং দলগতভাবে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে এবং বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়। শিক্ষক আলোচনার নেতৃত্ব দেন। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর ওপর তৈরি report আলোচনার জন্য পেশ করে। আলোচনার অন্য শিক্ষার্থীরাও যাতে অংশ নিতে পারে শিক্ষক সে দিকেও দৃষ্টি দেন। সবশেষে আলোচনাটি মূল্যায়ন করা হয়।

(গ) **গোল টেবিল আলোচনা** (Round Table Discussion) :

এই আলোচনা সেমিনারের মতোই। শুধু যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা ডায়াসের ওপর গোল বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

● **আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা :**

▲ **সুবিধা** (Advantages) :

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। ফলে শিখন অনেকাংশে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

(২) আলোচনা দলগতভাবে হয়। ফলে শ্রেণিকক্ষে একটি স্বাভাবিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(৩) শিক্ষার্থীরা স্বাধীন চিন্তার সুযোগ পায়। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়।

(৪) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতার বিকাশ ঘটে এবং বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিবিড় হয়।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা বাড়ে, দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

(৭) সুন্দরভাবে কোনো বস্তু সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করার ক্ষমতা ও সাহস বাড়ে। এর ফলে সুবক্তা হতে পারে।

(৮) এর মাধ্যমে শিক্ষক talented শিক্ষার্থীদের সন্ধান পেতে পারে।

▲ **অসুবিধা** (Disadvantages) :

(১) সব বিষয়ের ক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না।

(২) অনেক সময় দেখা যায় সমস্ত আলোচনা কয়েকজন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে সম্পাদিত হয়, বাকি শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা।

(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় বন্ধুত্বের পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে।

(৪) আলোচনা পদ্ধতিতে দলগঠনের সময় সাধারণত অপেক্ষাকৃত ভালো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়। এর ফলে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতা ভাব জাগে।

❂ ২.৩ প্রতিপাদন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Demonstration-observation method) :

প্রত্যক্ষ নির্দেশনার ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যতীত অপর আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল প্রতিপাদন বা ডেমনস্ট্রেশন পদ্ধতি। শ্রেণি শিক্ষণের সময় এই ডেমনস্ট্রেশন পদ্ধতির দ্বারাও শিখন বেশ ভালো হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সাধারণত তিনটি ধাপ বা পর্যায়ে ডেমনস্ট্রেশন দেন। অবশ্য এই তিনটি ধাপের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা নেই। এই তিনটি ধাপের প্রথম ধাপে শিক্ষার্থীদের বলা হয় বা দেখানো হয় তাদের কী শেখানো হবে; দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরিচালনায় অনুশীলন করে, এই স্তরে বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে শিক্ষক তা দেখেন বা সংশোধন করেন, যখন শিখন সম্পূর্ণ হয় তখন পরের তৃতীয় ধাপে যাওয়া হয়। তৃতীয় ধাপে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিখনের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। এই তৃতীয় স্তরে শিক্ষকের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। এই তৃতীয় ধাপে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিখনে সচেষ্ট হয় এবং তাদের দক্ষতাও বাড়ানোর সুযোগ থাকে।

● **প্রতিপাদন পদ্ধতির ধাপ বা পর্যায় সমূহ** (Steps of Demonstration Method) :

আগেই বলা হয়েছে প্রতিপাদন পদ্ধতিতে শিক্ষণ কার্য পরিচালনা করার জন্য শিক্ষক মূলত তিনটি ধাপ বা পর্যায়ে অগ্রসর হন। একটি পর্যায়ের শিখন সম্পূর্ণ হলে পরের পর্যায়ে অগ্রসর হতে হয়। যে তিনটি ধাপ এক্ষেত্রে পরিচালিত হয় সেগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল—

Scanned with CamScanner

প্রথম ধাপ : শিক্ষার্থীকে কী শেখানো হবে তা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হল প্রথম ধাপের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি খুব সচেতনভাবে গুরুত্ব দেবেন :

(i) পাঠ্যবিষয়বস্তুর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের আগেভাগেই জানিয়ে দেবেন,
(ii) পাঠের এক একটি অংশকে পর্যায় ক্রমে নির্দেশনা দেবেন,
(iii) পর্যায় বা ধাপগুলিকে যতটা সম্ভব ছোটো ছোটো করবেন,
(iv) পাঠ্যবিষয়বস্তুকে এমনভাবে সংগঠিত করবেন যাতে একটি অংশে দক্ষতা অর্জন সম্ভব হলে তবেই পরেরটিতে আসা যায়,
(v) জটিল বা দুর্বোধ্য অংশগুলিতে বেশি বেশি উদাহরণ দেবেন এবং উদাহরণ এর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে। উদাহরণগুলি হবে যতটা সম্ভব পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত।
(vi) পরবর্তী অংশে আসার পূর্বে প্রথমটির শেখানো অংশটিতে শিখনে দক্ষতা অর্জন হয়েছে কি না তা শিক্ষক পরীক্ষা করে দেখবেন অর্থাৎ ফরমেটিভ মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।

দ্বিতীয় ধাপ : শিক্ষণ কার্যের এই দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোনো নতুন বিষয়ের শুরুতে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক সহযোগিতার ভূমিকা পালন করেন। সহযোগিতার এই কাজ নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে–

(i) নতুন বিষয় অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করা,
(ii) শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি বা বোধ কতখানি হয়েছে তা জেনে নেওয়া, দুর্বলতার দিকগুলিকে চিহ্নিত করা খুঁজে নেওয়া, শিক্ষার্থীদের ধারণায় অস্পষ্টতা আছে কতখানি তা বুঝে নেওয়া,
(iii) শিক্ষার্থীদের ভুলগুলিকে সংশোধন করা,
(iv) শিখন সম্পন্ন হওয়ার পর অনুশীলনের ব্যবস্থা করা এবং সুযোগ দেওয়া।

শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য শিক্ষক যতখানি সম্ভব ঘন ঘন প্রশ্ন করবেন; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেখতে হবে প্রশ্নগুলি যেন বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কিত হয়। গবেষণায় (স্টালিং এবং কাসকোইজ-১৯৭৪, স্টালিং-১৯৭৯, কোকের-১৯৮০) দেখা গেছে শিক্ষক বেশি করে প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীদের শিখন ভালো হয়। শিক্ষক সাধারণত দুই ধরনের প্রশ্ন করেন— নির্দিষ্ট উত্তরধর্মী প্রশ্ন এবং আলোচনা ও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি কতটুকু হয়েছে তা জানার জন্য বেশি বেশি বা ঘন ঘন প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীর শিখনের ভুল জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা যায় এবং তার ভিত্তিতে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়,

শিক্ষার্থীদের ভুল **সংশোধন** করার জন্য যে সমস্ত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেন সেগুলি আগে থেকেই ঠিক করলে ভালো হয়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া দরকার :

(i) শিখন সম্পর্কিত নির্দেশ, পদ্ধতি এবং প্রধান অংশগুলিকে শিক্ষার্থীদের পুনরায় করতে বলবেন।
(ii) প্রধান অংশের উপর বেশি করে প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর চাইবেন।
(iii) শিক্ষার্থীদের লিখিত উত্তরগুলি দেখবেন।
(iv) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমস্ত উত্তরগুলি অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বলবেন।

এই সময় শিক্ষককে একটি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, সেটি হল– শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পেলেও ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পন্ন হয়েছে অথবা কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয় তবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে সবার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়েছে। এই কারণেই শিক্ষককে আগে থেকে অনেকগুলি প্রশ্ন তৈরি করে রাখতে হয়।

শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের পর যদি দেখা যায় সঠিক উত্তরদানের পর ও শিক্ষার্থী কিছু সন্দিহান তবে শিক্ষক সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তরদানের জন্য উৎসাহিত করবেন। এতে শিক্ষার্থী তার উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। প্রয়োজনে আরও বেশি বেশি প্রশ্ন করা যেতে পারে। এবং সঠিক উত্তরদানের পর প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহার করবেন তাতে শিখনের মান উন্নত হয়।

তৃতীয় ধাপ : আগেই বলা হয়েছে এই তৃতীয় ধাপের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিখনের জন্য সচেষ্ট করে তোলা এবং তাদের শিখন দক্ষতা বাড়ানো। এই কারণে এই তৃতীয় ধাপটি হল স্বাধীনভাবে অনুশীলন করা। কার্যকরী নির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্বাধীনভাবে অনুশীলন। শিক্ষার্থী যাতে স্বাধীনভাবে অনুশীলন করতে পারে, শিখনে বুৎপত্তি লাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষক অবশ্যই কিছু সময় বরাদ্দ করে রাখবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাধারণত দুটি উপস্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। প্রথমটি হল দক্ষতা একত্র করার স্তর। শিক্ষার্থী যে যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা এক্ষেত্রে কাজে লাগায়। অনুশীলনের পর শিক্ষার্থী যে দক্ষতা অর্জন করেছে তা এক্ষেত্রে কাজে লাগায়। অনুশীলনের পর শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই, সে দ্বিতীয় স্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপনীত হয়। স্যামুয়েলস (১৯৮১) এই দুটি স্তরের নাম দিয়েছেন 'একীকরণ' (unitization) স্তর এবং স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ংক্রিয় (automatic) স্তর। শিখনের এই স্তর আবার ভবিষ্যতে নতুন শিখনের পক্ষে কার্যকরী।

Scanned with CamScanner

• প্রতিবাদন পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Demonstratioin Method) :

(১) শিক্ষকের জন্য সামান্য এক সেট শিক্ষণ প্রদীপন, চক ও ব্ল্যাকবোর্ড এবং পাঠ-পরিকল্পনা নিয়ে সামান্য খরচে এই পদ্ধতি সহজেই ব্যবহার করা যায়।

(২) এই পদ্ধতিতে সময় কম লাগে। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই এই প্রতিপাদন পদ্ধতিকে শিক্ষক প্রয়োগ করতে পারেন।

(৩) এই পদ্ধতিতে 'মূর্ত থেকে বিমূর্ত' শিক্ষার এই নীতির প্রয়োগ করা যায়।

(৪) পরীক্ষা প্রদর্শন শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সঞ্চার যেমন করতে পারে তেমনই তাদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারে।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর দর্শন ও শ্রবণ অনুভূতিকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলে বোধ ও দক্ষতা অর্জন সহজ হয়, পাঠ্যবিষয়ের ধারণা স্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক হয়।

(৬) শিক্ষকের পাঠ পরিচালনার সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও সমানভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় বলে তারাও যথেষ্ট সক্রিয় শিখনে অভ্যস্থ হতে পারে এবং পুঁথিকেন্দ্রিক জ্ঞানকে বাস্তব পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

(৭) সব ধরনের শিক্ষার্থী যেমন উন্নত, মাঝারি এবং পিছিয়ে পড়া বা অল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও এই পদ্ধতিতে উপকৃত হয়, কার্যকরী শিখনের সুযোগ লাভ করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও মধুর হয়।

(৮) শিক্ষার্থীদের সৃজনী ক্ষমতারও বিকাশ ঘটে।

• প্রতিবাদন পদ্ধতির অসুবিধা (Demerits of Demonstration Method) :

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ পেলেও, নিজেরা সরাসরি হাতেকলমে করার সুযোগ পায় না। তাই 'কাজের মাধ্যমে শিখন' অর্থাৎ 'learning by doing' এর সুযোগ শিক্ষার্থীরা পায় না।

(২) শিক্ষক নিজে দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপাদন পদ্ধতিকে ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করলেও প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে শেখার সুযোগ পায় না। অনেকসময় শিক্ষকও প্রদর্শনের প্রতি মনোযোগ বেশি দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন না।

(৩) দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় এর ব্যবহার যথেষ্ট হলেও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ থাকে না বলে শিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে সুদৃঢ় হয় না। তা ছাড়া শিক্ষকের প্রদর্শন অনেকসময় বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে দূর থেকে দেখতে হয় এবং শুনতে হয়। এতে ধারণা লাভ অনেকসময় সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না।

(৪) শ্রেণিকক্ষের নির্দিষ্ট সময় মেনে প্রতিপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করলেও অনেকক্ষেত্রে উন্নত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে অল্প মেধাসম্পন্নরা উপকৃত হয় না,আবার অল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে উন্নত মেধাসম্পন্নরা হয় না যদিও মাঝারি মেধাসম্পন্নরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপকৃত হয়। পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করা শিক্ষকের পক্ষে বেশ অসুবিধা হয়।

(৫) শিক্ষার্থীদের লেবরেটরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে এই পদ্ধতিতে সাফল্য পায় না।

(৬) শিক্ষকের ব্যক্তিগত দক্ষতার অভাব থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়, শিক্ষার্থীদের মনোযোগও ব্যহত হয় এবং সামগ্রিক শিক্ষণকার্য ব্যর্থ হয়।

✪ ২.৪ আঞ্চলিক পদ্ধতি (Regional Method) :

স্থান বা ভৌগোলিক সীমারেখার নিরিখে ইতিহাসের শ্রেণি বিভাজন করলে ইতিহাসকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভাজন করা যায়। **এই বিভাগগুলি হল**—(a) World History (বিশ্বের ইতিহাস) (b) National History (জাতীয় ইতিহাস) (c) Regional History (আঞ্চলিক ইতিহাস) ও (d) Local History (স্থানীয় ইতিহাস)।

(১) Regional History-কে আমরা Provincial বা প্রাদেশিক ইতিহাসও বলে থাকি। ভৌগোলিক সীমারেখার বিচারে একটি দেশের বৃহত্তর বিভাজন সাধারণত রাজ্যের বা প্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে করতে হয়। প্রতিটি অঞ্চলের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য থাকে যা সামগ্রিকভাবে ইতিহাস রচনা করতে সহযোগিতা করে। কোনো একটি অঞ্চলের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ যে বইতে লিপিবদ্ধ আছে তাকে এক কথায় আঞ্চলিক ইতিহাস বলে। ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধপ্রদেশ, কেরালা ইত্যাদি হল ভারতের আঞ্চলিক ইতিহাসের উদাহরণ।

আঞ্চলিক ইতিহাস, ইতিহাস চর্চায় পূর্ণাঙ্গতা আনে। প্রতিটি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত অনুসন্ধান করা সম্ভবপর হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীকে উদার হওয়ার শিক্ষা দেয়। আবার অনেক সময় জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতি আঞ্চলিকতবাদ গড়ে ওঠে। সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন হয়। সুতরাং আঞ্চলিক ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক সচেতন হবেন এবং তথ্য পরিবেশনে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন। সমস্ত রাজ্য বা প্রদেশের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরবেন এবং ইতিহাস রচনার পুনঃলিখনে সচেষ্ট হবেন।

(২) Local History (স্থানীয় ইতিহাস) : ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্থানীয় ইতিহাস রচনা ও শিক্ষাদান একটি অতি আধুনিক প্রবণতা। শিক্ষার্থীরা যে

Scanned with CamScanner

পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশে ও তার আশেপাশের ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল Local History বা স্থানীয় ইতিহাস। শিশুর শিক্ষা শুরু হয় তার নিজের পরিবেশের পরিবৃত্তে। স্থানীয় মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদি স্থাপত্য ভাস্কর্য, কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনৈতিক পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণায় তার অধিক উৎসাহী। শিশুর নিজস্ব গ্রাম বা শহর বা জেলার ও তার আশেপাশের ইতিহাস হল স্থানীয় ইতিহাসের উদাহরণ।

Importance of Local History (স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্ব) : আমরা পূর্বেই জেনেছি ইতিহাস পাঠদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জানা থেকে অজানা (known to unknown) এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত (Concrete to Abstract) ধারণায় অগ্রসর হওয়া। Local History হল সেই ধারণার সহায়ক কৌশল। **স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্ব নিম্নরূপ—**

(a) স্থানীয় রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করায়।
(b) শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিষয় জানতে আগ্রহান্বিত ও উৎসাহিত হয়।
(c) ইতিহাস শিক্ষাদান বা পঠনপাঠন সহজ ও সরলতম হয়।
(d) শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
(e) স্থানীয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রবণতা গড়ে ওঠে।
(f) শিক্ষা সহায়ক উপকরণের (Resource) ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে।

স্থানীয় ইতিহাসে পাঠের গুরুত্ব প্রসঙ্গে **E. L. Hasluck** বলেছেন—"The study of Local History is of seal importance and should most certainly find some space, however small, in the school history syllabus. It help and brings home to the pupil, by everyday contact with historical scenes, names and buildings, the sense of the development which his country has undergone, and removes his thoughts fron time to time away from the present to the contemplation of the ages that are passed."

তবে মনে রাখতে হবে স্থানীয় ইতিহাসকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে সামগ্রিকভাবে দেশের বা বিশ্বের ইতিহাস অবহেলা বা অতিসংক্ষেপ করলে চলবে না। স্থানীয় ইতিহাস পাঠদান অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণির ক্লাসের পক্ষে বেশি কার্যকরী। উদ্ভিদশ্রেণিতেও গুরুত্ব থাকবে যদি তাদেরকে ভ্রমণমূলক ঐতিহাসিক বিবরণ বা গবেষণামূলক ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করতে বলা যায়।

সুতরাং Local History পাঠদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভ্রমণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা ও বিবর্তন তুলে ধরতে হবে। শিক্ষার্থীর পরিচিত বৃত্তে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরে ঘটনার সাদৃশ্য ও ব্যাখ্যার বিশ্লেষণে যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।

২.৫ আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method) :

ইতিহাস রচিত হয় তথ্যের উপর ভিত্তি করে। তথ্য সংগৃহীত হয় মূল উৎস থেকে। তথ্যের এই উৎসগুলি ইতিহাসের মূল উপাদান। এই উপাদানগুলিকে তুলনামূলক প্রমাণের আলোকে সংগ্রহ করতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে এবং পরিমাপ করতে হবে। তারপর শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে।

ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে উৎস পদ্ধতির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের উৎসের শ্রেণি বিভাগ করা প্রয়োজন।

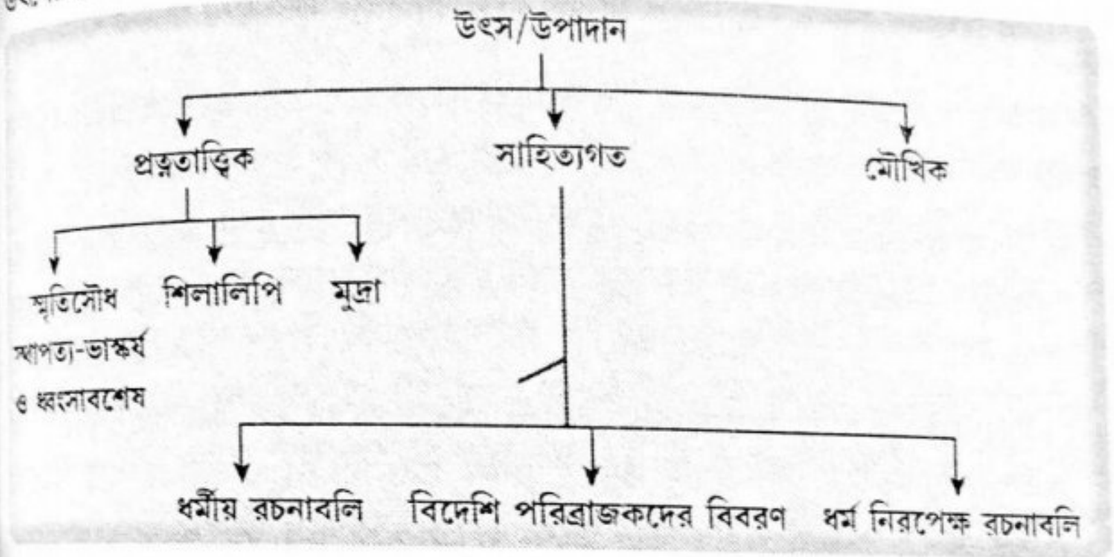

উপরিউক্ত এইসব উপাদানগুলিকে দু'ভাগে ভাগে করা যায়। যথা—

(i) প্রাথমিক উপাদান (Primary Source)
(ii) অপ্রাথমিক উপাদান (Secondary Source) বা গৌণ উৎস

কাজেই এইসব আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়—

ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারবিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাসের মূল উপাদানগুলির পরীক্ষা করা ও সত্য সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় উৎস পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিকে আবার মূল সন্ধান পদ্ধতি বা উপাদান ভিত্তিক বা উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি অথবা মৌলিক ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি বলেও অভিহিত করা যায়। বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস চর্চার চেতনাই উৎস পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

উৎস পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা :

(i) উৎস পদ্ধতি মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে ইতিহাস প্রবণ করে তুলতে সাহায্য করবে।
(ii) শিক্ষার্থীর অন্তরে বিশ্লেষণধর্মীবোধ জাগ্রত হবে।

Scanned with CamScanner

(iii) শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জন্মাবে; অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি আরও প্রসারী হবে।

(iv) বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মাবে এবং শ্রেণিক পঠনপাঠনে তা অত্যন্ত মূল্যবান।

(v) উপাদানগুলি অতীত যুগের পরিমণ্ডল বা আবহ (Creating atmosphere) করবে।

(vi) ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল মানসিক প্রশিক্ষণ (Mental Training)। উৎসগুলির ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক গুণগুলির বিকাশ সাধন

● **উৎস পদ্ধতির সুবিধা :** শ্রেণিকক্ষে ইতিহাস পঠনপাঠনে উৎস পদ্ধতির একান্ত কাম্য। কারণ—

(i) উৎস পদ্ধতির সাহায্যে অতীত ইতিহাস শিক্ষার্থীর কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে অতীত ইতিহাস শিক্ষার্থীদের কাছে তখন আর অবজ্ঞার বিষয় বলে মনে হ না।

(ii) পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনা ও শিক্ষকের মৌলিক বর্ণনার সঙ্গে মূল উপকরণগুলি সরা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করলে বর্ণনা মূর্ত, বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠে অতীতের অস্পষ্ট ও অবাস্তবতার ঊর্ধ্বে ইতিহাসকে দাঁড় করানো যাবে।

(iii) উৎস পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাস অধ্যায়ন শিক্ষার্থীকে কতকগুলি মানসিক শ অধিকারী করে তোলে। যথা— অনুসন্ধান ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও যুক্তি বিশ্লেষণী দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(iv) উৎস পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাস পাঠ করতে শিখলে শিক্ষার্থীরা সাধারণত প্রচার বা propaganda-এর দ্বারা প্রভাবিত হবে না বা বশীভূত হবে না। বি তথ্যের বা propaganda-এর অত্যাচার থেকে ছাত্রদের রক্ষা করা যেতে পা

(v) ঐতিহাসিক উৎসসমূহকে কেন্দ্র করে ইতিহাস অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষ ঘটনার সত্যানুসন্ধানে নিজেরাই ব্যাকুল হবে।

(vi) বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক উপাদানকে শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সময়ানুক্রমে সেগুলিকে সাজানোর দক্ষতা সৃষ্টি সম্ভব।

কাজেই, অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা উৎস পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে ইতিহাস চর্চার মৌ লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। তাই বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চশ্রেণিতে শি সাপেক্ষে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

● **উৎস পদ্ধতির অসুবিধা/সীমাবদ্ধতা :** বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির ব্যবহারে নানা অসুবিধা আছে। এগুলি হল—

(i) এই পদ্ধতির উৎসের উপকরণগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়।

(ii) শ্রেণিকক্ষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করাও সহজসাধ্য নয়।

(iii) এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দরকার। কিন্তু যে মননশীল শিক্ষক দরকার তা সহজসাধ্য নয়।

(iv) উপাদানগুলি উপযুক্তভাবে রাখার জন্য বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক কক্ষের দরকার— তাও সহজলভ্য নয়।

(v) উপাদানগুলি সংগ্রহের জন্য দেশভ্রমণ ও মডেল, ছবি প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য যে অর্থের দরকার— বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক। এ বিষয়ে সরকারি শিক্ষা বিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে।

(vi) শিক্ষার্থীরা যদি ভুল তথ্যকে আঁকড়ে ধরে তবে সমস্ত ইতিহাস চেতনাই বিকৃত হয়ে যাবে। উৎস সন্ধানে অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে পাঠ্য বই সম্বন্ধে অবহেলার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। বিদ্যালয় স্তরে এই ধরনের পরিস্থিতি বিপজ্জনক।

(vii) স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুব কার্যকর হবে না। তারা পাঠ্যবিষয়ে অমনোযোগী হয়ে পড়বে।

(viii) বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ঐতিহাসিক উপাদানের সমাবেশ, সুসজ্জিত গ্রন্থাগার এবং সহজলভ্য Reference বই ছাড়া এই পদ্ধতির প্রয়োগ অসম্ভব।

উপসংহার (Conclusion) : উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে উৎস পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় ইতিহাস চেতনা, সৃষ্টি হয় বিষয়বস্তুর উপর আধিপত্য, বাস্তব মূল্যবোধ বিকশিত হয়। যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণের দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে এই পদ্ধতি কেবলমাত্র শ্রেণির নিম্ন শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য নয়। উচ্চস্তরের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই পদ্ধতি সন্তোষজনক।

✪ ২.৬ প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) :

বর্তমানে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রকল্প পদ্ধতি। আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন **ডিউই**-এর প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে প্রকল্প পদ্ধতি। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন অধ্যাপক **উইলিয়াম এইচ. কিলপ্যাট্রিক** (Prof. William, H. Kilpatrick)। এই পদ্ধতিকে Problem Method বা সমস্যা পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জন ডিউই-এর শিষ্য অধ্যাপক কিল প্যাট্রিক ডিউই-এর Problem Method-এর কিছু পরিবর্তন সাধন করে প্রোজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের কোনো শিক্ষণীয়

Scanned with CamScanner

বিষয়কে সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং সমবেত আন্তরিক প্রচেষ্টায় দৈহিক ও মানসিক সক্রিয়তার দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সমস্যাটি সমাধান করে। সমস্যা (Problem) ও সক্রিয়তা (Activity) হল এই পদ্ধতির মূল উপাদান।

★ **প্রকল্পের** (Project) **ধারণা :**

- **ড. কিলপ্যাট্রিকের** মতে, (Kilpatrick) , "Project is a whole hearted purposeful activity proceeding in a social environment" অর্থাৎ প্রকল্প হল সামাজিক পরিবেশে সম্পাদিত একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ।
- **স্টিভেনশনের** (Stevension) মতে, "A Project is a problematic act carried to completion in its nature setting" অর্থাৎ প্রকল্প হল একটি সমস্যামূলক কাজ এটি স্বাভাবিক পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়।
- **ব্যালার্ড** (Ballard)-এর মতে, "A project is a bit of real life that has been imported into the school." অর্থাৎ প্রকল্প হল বাস্তব জীবনের সমস্যামূলক কিছু কাজ এবং বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে প্রকল্প হল বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি সমস্যামূলক উদ্দেশ্যমুখী কাজ এবং শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিম্বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশে এই কাজটি সম্পাদন করে থাকে। এর মাধ্যমে বাস্তব জীবনের নানারকম সমস্যার সমাধান ঘটে ও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে থাকে।

★ **প্রকল্প পদ্ধতির উদ্দেশ্য :**

(1) **কর্মদক্ষতার বিকাশ :** শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও সক্রিয়তার বিকাশ ঘটানো হল এই পদ্ধতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

(2) **সমন্বয় সাধন :** বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসের জ্ঞানের যথাযথ সমন্বয় সাধন করা।

(3) **ইতিহাস-শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি :** প্রত্যক্ষ বাস্তবের সংস্পর্শে এসে জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা।

(4) **শিক্ষার সমাজমুখীকরণ :** শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে না রেখে শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের উদ্দেশ্যমূলক যোগাযোগ ঘটানো।

(5) **সামাজিক গুণাবলির বিকাশ :** কাজের পরিকল্পনা ও সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট স্বাধীনতাদানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

(6) জীবনকেন্দ্রিক ও পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

★ **প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :**

(i) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

(ii) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়।

(iii) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।

(iv) ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি।

(v) এই পদ্ধতিতে সময় বেশি লাগে ফলে পাঠক্রম নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয় না।

(vi) বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ থাকে।

(vii) প্রোজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদন দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

(viii) ইতিহাসের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়গুলি এই পদ্ধতিতে শেখানো সম্ভব নয়।

(ix) এই পদ্ধতিতে অনুবন্ধের সুযোগ আছে।

(x) এই পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি দৈহিক সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

★ **প্রকল্প পদ্ধতির মূলনীতি** (Principles of project Method) :

(1) **উদ্দেশ্যের নীতি :** প্রকল্প হল উদ্দেশ্যমুখী কাজ। প্রকল্প মাত্রেই উদ্দেশ্যভিত্তিক কাজ। উদ্দেশ্যহীন কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ, মনোযোগ কিম্বা প্রেষণা সঞ্চার করে না।

(2) **সক্রিয়তার নীতি** (Principle of Activity) : সক্রিয়তা হল প্রকল্পের প্রাণ। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প সম্পাদন করে। এই আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করে।

(3) **বাস্তবতার নীতি** (Principle of Reality) : প্রকল্পটি বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। তাই ব্যালার্ড বলেছেন, "Project is a bit of real life imported into the school." অর্থাৎ বাস্তব সমস্যা বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা অনুশীলনের মাধ্যমে সমাধান করবে।

(4) **অভিজ্ঞতার নীতি** (Principle of Experience) : জন ডিউই-এর মতে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা, "Education is by experience, for experience and of experience." আত্মসক্রিয়তা দ্বারা কার্যসম্পাদনের তথা প্রকল্প সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে।

Scanned with CamScanner

(5) **উপযোগীতার নীতি** (Principle of Utility) : প্রয়োগবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে প্রকল্প পদ্ধতি। প্রয়োগবাদী দর্শন বিশ্বাস করে যে তাই সত্য যার বাস্তব উপযোগীতা আছে। প্রকল্পটি এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যার বাস্ত উপযোগিতা আছে এবং এই ধরনের প্রকল্প সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে জ্ঞা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে।

(6) **স্বাধীনতার নীতি** (Principle of Freedom) : প্রকল্প পদ্ধতির একটি অন্যত নীতি হল স্বাধীনতার নীতি। প্রকল্প নির্বাচন, কার্যসম্পাদন প্রভৃতি ব্যাপারে শিক্ষার্থীদে পূর্ণ স্বধীনতা দিতে হবে। বাইরে থেকে কোনো প্রকার শর্ত বা বাধা নিষেধ আরো করা হবে না। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

(7) **অনুবন্ধের নীতি** (Principle of Co-rilation) : প্রকল্প পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূ নীতি হল অনুবন্ধের নীতি। প্রকল্প সম্পাদনে করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সা অনুবন্ধ স্থাপিত হয়। ফলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সামগ্রিকতা বোধ জাগ্রত হয়।

★ **প্রকল্প পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর** : প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তর অনুস করতে হয়।

(ক) **প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা** : শিক্ষার্থীগণ যাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো এক কর্মোদ্যগে ব্রতী হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা করতে হবে। চিত্তাকর্ষক শিক্ষ উপকরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয় এরূপ পরিবেশ রচনা করবেন।

(খ) **প্রকল্প নির্বাচন** (Selection) : প্রকল্প পদ্ধতির একটি প্রধান বিষয় হল প্রক নির্বাচন। প্রকল্প অবশ্যই পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তবেই তারা কর্মে আগ্রহী হবে। এই নির্বাচনের ক্ষে শিক্ষকমহাশয় অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দেবেন। কিন্তু তাঁর পছন্দমতো কো প্রকল্প তাদের উপর চাপিয়ে দেবেন না।

(গ) **উদ্দেশ্য নিরূপণ** (Purposing) : প্রকল্প নির্বাচনের পর শিক্ষার্থীদের কাজ হ প্রকল্পের উদ্দেশ্যটি নির্ণয় করা। কারণ যে-কোনো কাজ সুচারু ভাবে সম্পাদন করতে হ উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হ তার কারণগুলি শিক্ষার্থীরা আলাপ-অলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে নেবে।

(ঘ) **পরিকল্পনা প্রণয়ন** (Planning) : কোনা প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য পরিকল্প প্রণয়ন অবশ্যই দরকার। শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ আলোচ করে একটি পরিকল্পনা স্থির করবে। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের কাজ হবে শিক্ষার্থী সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ পরামর্শ দানের সহায়তা করা। প্রকল্পটি রূপায়ণে শিক্ষার্থী

নিজেদের কয়েকটি দলে ভাগ করে নেবে। এবং প্রত্যেক দলের উপর অর্পিত থাকবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ভার।

(ঙ) **প্রকল্প রূপায়ণ বা কর্মসম্পাদন** (Executing) : নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য শিক্ষার্থীরা কর্মসম্পাদনে অগ্রসর হবে। শিক্ষার্থীগণ নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদন করবে। প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগীতা ও সহমর্মিতাবোধ। তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে অখণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। নিখুঁতভাবে কর্ম সম্পাদনই হবে এই স্তরের একমাত্র লক্ষ্য।

(চ) **মূল্যায়ন** (Evaluation) : কর্ম সম্পাদন শেষে শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে কর্মের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে বিচার বিবেচনা করবে। ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করার ব্যাপারেও তারা সচেষ্ট হবে। এইভাবে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করবে।

(ছ) **পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ** (Recording) : প্রকল্প পদ্ধতির সবশেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রকল্পের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখবে। এই বিবরণ প্রকৃতপক্ষে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার ফল। বিদ্যালয়ে এই বিবরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

★ **প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা** (Advantages and Disadvantages of Project Method) :

- **সুবিধা (Advantages)** :

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল—

(1) **মনোবিজ্ঞানসম্মত শিখন প্রক্রিয়া** : শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের চাহিদা অনুসারে প্রকল্প নির্বাচন করে (প্রস্তুতির সূত্র), পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে প্রকল্প সম্পাদন করে (অনুশীলনের সূত্র) এবং আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে কাজে সাফল্য লাভ করে (ফললাভের সূত্র)।

(2) **বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত** : প্রকল্পগুলি বাস্তবের সঙ্গে সংগতি রেখে নির্বাচন করা হয় বলে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী।

(3) **শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়** : এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে-কোনো কাজ সম্মানের সঙ্গে সম্পন্ন করতে শেখে।

(4) **স্বাধীনভাবে শিখনের সুযোগ** : এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে প্রকল্প নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকল্প সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়।

Scanned with CamScanner

(5) **বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন** : প্রকল্প পদ্ধতিতে কর্ম সম্পাদনের ম দিয়ে শিক্ষার্থীরা একাধিক বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়।

(6) **সামাজিক গুণাবলির বিকাশ** : এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্প সহযোগিতা, দলের প্রতি আনুগত্য, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান ইত্য গুণের বিকাশ ঘটে।

(7) **গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ** : এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক দা যৌথচেতনা, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

(8) **মুখস্থবিদ্যার পরিপন্থী** : এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা আত্মসক্রিয়তার দ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ফ মুখস্থবিদ্যার দ্বারা কোনো কিছু স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না।

(9) **সুসম্পর্ক গঠন** : এই পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজে মধ্যে এবং শিক্ষকের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(10) **ইতিহাস-শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন** : এই পদ্ধতিতে আত্মসক্রিয়তার দ্বারা স সমাধান করে এবং প্রয়োজনীয় চার্ট, মডেল তৈরি করে, ফলে বিজ্ঞান ভি বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক ও মনসঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয়।

- **অসুবিধা বা ত্রুটি** (Disadvantages or Limitations) :

বর্তমানে প্রকল্প পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন—

(1) **ব্যয়বাহুল্য** : প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি ও মূল্যবান উপক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ায় সেগুলি সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

(2) **পাঠক্রম-এর অসুবিধা** : ইতিহাসের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়গুলি প্র পদ্ধতিতে শেখানো সম্ভব নয়।

(3) **প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব** : এই পদ্ধতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

(4) **অধিক ছাত্রসংখ্যা** : বর্তমানে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষক পিছু ছাত্রসং অধিক হওয়ায় একজন শিক্ষকের পক্ষে প্রকল্পের কাজ পরিচালনা ক অসুবিধাজনক।

(5) **নিচু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে অসুবিধাজনক** : নীচু শ্রেণির শিক্ষার্থী পক্ষে প্রকল্প নির্বাচন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও যথাযথভাবে প্রকল্প সম্পাদন ক খুবই অসুবিধাজনক। এই পদ্ধতি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(6) **তাত্ত্বিক জ্ঞান অবহেলিত** : প্রকল্প পদ্ধতিতে ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাত্ত্বিক দিকগুলি অবহেলিত থাকে।

(7) **সময়সাপেক্ষ** : প্রকল্প নির্বাচন থেকে শুরু করে সম্পন্ন করা পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বিদ্যালয়ে সময়-তালিকা মেনে প্রকল্প পদ্ধতি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠক্রম সমাপ্ত করাও অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

(8) **উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব** : প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগী পাঠ্যপুস্তক না থাকায় শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(9) **পরিশ্রমসাধ্য** : এই পদ্ধতিতে পরিচালনার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়।

(10) **সবরকমের শিক্ষার সুযোগের অভাব** : প্রকল্প পরিকল্পনার স্তরে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দলভিত্তিক বিশেষ বিশেষ কাজ বণ্টন করে নেয়। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে নিজের কাজ ছাড়া অন্যের কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ থাকে না। ফলে প্রকল্প থেকে সবরকম শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে না।

উপরিউক্ত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও বাস্তব শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প পদ্ধতিটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

★ **প্রকল্প পদ্ধতির উন্নতিবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা** (Necessary Improvements Suggested for Project Method) :

(1) **শ্রেণিশিক্ষণের পরিপূরক** : তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ব্যবধান দূর করার জন্য প্রকল্প পদ্ধতিটিকে শ্রেণিশিক্ষণের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এরজন্য বিদ্যালয়ের একটি পঠনদিবসের প্রথমার্ধে শ্রেণিশিক্ষণ এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।

(2) **ব্যয়সংকোচ** : ব্যয়বহুল প্রকল্পের পরিবর্তে উৎপাদনশীল প্রকল্পগুলি গ্রহণ করলে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের ব্যয়সংকোচ করা যায় তেমনি অপরদিকে প্রকল্পজাত দ্রব্যগুলিকে অর্থসমাগমের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(3) **বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে এই পদ্ধতি গ্রহণ** : বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তর থেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বনে ইতিহাস-শিক্ষা পরিচালনা করলে শিশুশিক্ষার্থীরা প্রকল্প সম্পাদনের দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করে। ফলে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে তারা সাফল্যের সঙ্গে প্রকল্প সম্পাদন করতে পারে।

Scanned with CamScanner

(4) **প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ** : বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষণ-শিখন সহায়ক উপকরণের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ ব্যয় করে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ প্রদান করার দায়িত্ব নিতে হবে।

(5) **শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা** : প্রকল্প পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষাদপ্তরকে।

(6) **প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন** : প্রকল্প পদ্ধতির অনুসরণে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণ করা সম্ভব।

★ **শিক্ষকের ভূমিকা** (Role of Teacher) :

শিক্ষক মহাশয়—

(1) শিক্ষার্থীরা যৌথ উদ্যোগে স্বাধীনভাবে ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে প্রকল্প সম্পাদন করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবেন।

(2) শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে প্রকল্পের কাজ বণ্টন করবেন।

(3) বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রকল্প নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

(4) প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেবেন।

(5) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের জন্য উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের নাম সুপারিশ করবেন।

(6) প্রকল্পের কাজ যাতে ঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয় সেদিকে সতর্ক থাকবেন।

(7) প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীদের ভুলগুলি সহানুভূতির সঙ্গে সংশোধন করে দেবেন।

(8) প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী পাঠে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবেন।

★ **শিক্ষার্থীদের ভূমিকা** (Role of Students) :

(1) **প্রকল্প নির্বাচন** : শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রকল্প নির্বাচন করবে।

(2) **প্রকল্পের দায়িত্ববণ্টন** : বিভিন্ন দলের মধ্যে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের কাজ ও দায়িত্ব বণ্টন করবে।

(3) **তথ্যসংগ্রহ** : শিক্ষকের নির্দেশনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

(4) **পারস্পরিক সহযোগিতা** : প্রকল্পের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং বিবাদ-কলহ এড়িয়ে চলবে।

(5) **প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ** : প্রকল্পের শেষে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(6) **লিপিবদ্ধকরণ** : প্রকল্পের পরিকল্পনা, সংগৃহীত তথ্য ও ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকল্পের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(7) **চার্ট-মডেল প্রস্তুতি** : প্রকল্পের প্রয়োজনীয় চার্ট ও মডেল প্রস্তুত করবে।

✪ ২.৭ কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (CAI) :

বর্তমান শতকে মানব জীবনে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল কম্পিউটার। বস্তুত বর্তমান শতক হল কম্পিউটার বিজ্ঞানের যুগ। মানব জীবনের নানান দিকে তার ব্যবহার যোগ্যতা সুবিস্মৃত। একুশ শতকের এই প্রথমার্ধে কম্পিউটারের বিস্তৃত ব্যবহার এবং সাহায্যকারীর ভূমিকা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিছুকাল আগেও এই কম্পিউটার ছিল যন্ত্রগণক মাত্র। পরে তা হয়ে উঠল তথ্যবাহক, সঞ্চয়কারী, সংশ্লেষক এবং বিশ্লেষক। তারও পরে মিথস্ক্রিয় বহুধা মাধ্যমের আবিষ্কার এই কম্পিউটারকে করেছে শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের অতি নিকটজন। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রও তার থেকে বাদ যায়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের বিশেষ কিছু ভূমিকা সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করবো।

❖ **শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার** (General Uses of Computers in Education) :

শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে আজ কম্পিউটারের ব্যবহার সুবিদিত। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহারগুলির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(i) **উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন গণক যন্ত্র হিসেবে** : কম্পিউটার শব্দটি এসেছে কম্পিউট (Compute) শব্দ থেকে, যার অর্থ হল গণনা করা। সুতরাং কম্পিউটার হল একটি গণক যন্ত্র বিশেষ। বস্তুত, কম্পিউটার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গণক যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। একগুচ্ছ জটিল গণনা কম্পিউটার মাত্র কয়েক সেকেন্ডে করতে সক্ষম। এই গণনা হয় অতি দ্রুতগতিতে এবং সম্পূর্ণ সঠিকভাবে।

(ii) **শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান** : শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটারকে ব্যবহার করে শিখনের কাজকে অগ্রবর্তী করে তুলতে পারে, নিজের সাফল্য, অগ্রগতি বুঝতে পারে, একাগ্রচিত্তে অনুশীলন করতে পারে, ভুলগুলি সংশোধন করে তুলতে পারে, বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা গঠন করতে পারে।

Scanned with CamScanner

(iii) **তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে কম্পিউটার :** কোনো ঘটনা, কোনো সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক কোনো সংখ্যা বা কোনো ছবিকে ডেটা বা data হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যখন একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোনো ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় তখন সেটি তথ্য information হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কম্পিউটার এই তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সব দিক থেকে সমাজের চেহারাটাই পাল্টে দিয়েছে কম্পিউটার। এই ধরনের তথ্যভাণ্ডার বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কার্যত ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

(iv) **কম্পিউটার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন :** কম্পিউটার শিক্ষা বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যদিও বর্তমানে কম্পিউটার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল কম্পিউটার সাক্ষরতা, কম্পিউটার শুধুমাত্র বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্তরে আবদ্ধ নেই বরং সর্বস্তরেই কম্পিউটার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে।

❖ আধুনিক শিক্ষায় কম্পিউটারের বিশেষ ব্যবহার (Specific Uses of Computer in Modern Education) :

উন্নত দেশগুলিতে শ্রেণিকক্ষের নির্দেশনা (Classroom Instrution), ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা (individualised Instruction) এবং দূর শিক্ষার (Distance Education) জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ব্যবহারকে দুটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে—

(১) কম্পিউটার ভিত্তিক নির্দেশনা (Computer Based Instruction)

(২) কম্পিউটার পরিচালিত নির্দেশনা (Computer Managed Instruction)

❖ কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (Computer Assisted Instruction) :

ব্রিটেনে (UK) কম্পিউটার ভিত্তিক নির্দেশনাটি Computer Aided Learning অর্থাৎ কম্পিউটার সহায়ক শিখন নামে খুব বেশি পরিচিত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়টি কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা বা Computer Assisted Instruction নামে পরিচিত।

Bruner (1972)-এর মতানুসারে মানুষের হাতে যন্ত্র তার চিন্তন প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত করেছে এবং একই সঙ্গে তার আচরণেও এনেছে পরিবর্তন। কম্পিউটার মানুষের প্রশিক্ষণ (Training) এবং নির্দেশনা (Instruction) চিন্তায় এনেছে ব্যাপক রূপান্তর। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (CAI)-এর প্রবর্তন ঘটে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং মাইক্রো-কম্পিউটার আসে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। বস্তুত ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় CAI-এর সূচনা হয়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Patrick Suppes প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর গণিত শিখন এবং পঠনের ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করেন প্রথম। এরপর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে Atkinson প্রোগ্রাম

ভিত্তিক CAI গঠন করেন পঠন অনুশীলনের জন্য। বর্তমানে CAI শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিমের দেশগুলিতে কম্পিউটারকে বাদ দিয়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবতেই পারে না।

● (ক) **অর্থ ও সংজ্ঞা** (Meaning and Definition) : কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (Computer Assisted Instruction) বা সংক্ষেপে CAI বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের নির্দেশনা যা কম্পিউটারের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। শিক্ষণযন্ত্র (Teaching Machine) অপেক্ষা CAI এক ধাপ এগিয়ে আছে এবং সম্ভবত নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় স্ব-শিক্ষণ এবং ব্যক্তিগত শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের দু'টি ব্যবহারকে কাজে লাগানো হয়। শিক্ষণ-মেশিন অপেক্ষা এটি এগিয়ে আছে বলার কারণ হল CAI কাজ করার ক্ষমতা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম সম্পাদনার দ্বারা অসংখ্য শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে নির্দেশনা দায়িত্ব পালন করতে পারে যা শিক্ষণ যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। **Hilgard** এবং **Bower** (১৯৭৭) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "Computer Assisted Instruction has now taken as so many dimensions that it can no longer be considered as a simple derivative of the teaching machine or the kind of programmed learning that skinner introduced."

এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, কম্পিউটারের ব্যবহার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিককে বিশেষ করে শিক্ষণ বা নির্দেশনার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

Computer Assisted Instruction-এর প্রসঙ্গে যে সব সংজ্ঞা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দিয়েছেন অথবা অন্যান্য সূত্র থেকে যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(i) Britanirica Online Encyclopedia থেকে জানা যায় "CAI is a programme of instructional material presented by means of a computer or Computer system."

(ii) Glossary of Distance Education and Internet Termimology তে পাওয়া যায়— "Computer Assisted Instruction (CAI) is the teaching process in which a computer is used to enhance the education of a student."

(iii) International Dictionary of Education (১৯৮৫)-এর সূত্র ধরে জানতে পারা যায় Use of a computer to assist in the presentation of instructional materials to a student to monitor learning progress, or to select additional instructional material in accordance with the needs to individualised learners.

(iv) The Concise Dictionary of Education (১৯৮২) এই ভাবে উল্লেখ করেছে যে, "Instruction in which a computer is used to present substantial

Scanned with CamScanner

amounts of learning material to the student; it often represents a auto instructional technique enabling students to progress at their own individual rates."

(v) **Bhatt** এবং **Sharma** (১৯৯২) CAI-এর সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন, "CAI is an interaction between or student, a computer controlled display and a responce entry device for the purpose of achieving educational outcomes."

● (খ) **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার মৌলিক ধারণা** (Basic Assumption of Computer Assisted Instruction) : কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা গড়ে উঠেছে কতকগুলি মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। সেগুলি হল :

(১) একই সময়ে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশনা (Instruction for a number of learners at a time)

(২) শিক্ষার্থীদের কাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারণ (Automatic recording of the learners performance)

(৩) পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যাবহারের বৈচিত্র্য (Variety in the use of methods and techniques)

উপরোক্ত নীতিগুলি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) **একই সময়ে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশনা** (Instruction for a number of learners at a time) : CAI একই সময়ে এক সঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ বা নির্দেশনার পথ বেয়ে শেখানোর কাজ করতে সক্ষম। কোনো বিশেষ বিষয়ে বা বিশেষ কোনো পাঠ এককে শিক্ষার্থী তার চাহিদা ও আগ্রহ অনুসারে শিখতে পারে। সেই অনুসারে কম্পিউটার থেকে শিক্ষার্থী তার পাঠ্য বিষয়বস্তু (materials) এবং প্রাসঙ্গিক সহায়তা লাভ করে। এই ধরনের ব্যক্তিভিত্তিক শিখন গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় দিক থেকে খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(২) **শিক্ষার্থীদের কাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারণ** (Automatic recording of the learners performance) : উপস্থাপিত নির্দেশনার বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষার্থী কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া করে? তার প্রশ্নগুলি কী কী? তার অসুবিধাই বা কোথায় কোথায়? তার কাজের সাফল্য কতখানি? এই সমস্ত কিছুই খুব নিখুঁত এবং সার্থকভাবে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরে রাখা যায়। ব্যক্তি শিখনের পরবর্তী পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীকে প্রয়োজন মতো সাহায্য করা সম্ভব হয়।

ebook.dascoaching.in

(৩) **পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যাবহারের বৈচিত্র্য** (Variety in the use of methods and techniques) : CAI এই ধারণায় বিশ্বাস রাখে যে, কোনো একটি পদ্ধতি দ্বারা সমস্ত শিক্ষার্থীই সুবিধা পেতে পারে না। সমস্ত বিষয়, সমস্ত পাঠ একক কোনো একটি সাধারণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্য ভাবে শিখন সার্থকতা পায় না। ব্যক্তি বৈষম্য অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষার্থী নিজের নিজের ক্ষমতা, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী এক একটি পদ্ধতিতে শিখতে পারে।

● (গ) **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার কার্যপ্রণালী** (Modes of Computer Assisted Instruction) : কম্পিউটার বিভিন্ন উপায়ে নির্দেশনায় তার কার্য সম্পাদন করে। এগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

(১) **তথ্য সংক্রান্ত নির্দেশনা** (Informational instruction) : শিক্ষার্থী তার শিখন সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্যগুলি চায়, যেগুলি তার বিশেষভাবে প্রয়োজন, কম্পিউটার সেগুলিকে শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহ করে। কম্পিউটারের সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে শিক্ষার্থী সহজেই তথ্যগুলিকে সংগ্রহ করে তার শিখনে প্রয়োজন মতো কাজে লাগাতে পারে।

(২) **প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনমূলক কর্ম পরিকল্পনা** (Drill and practice programmes) : কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের বিশেষ পাঠ এককের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কিংবা অনুশীলনমূলক কাজের পরিকল্পনায় CAI বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে থাকে, যেমন— গণিতের গুণন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে CAI এমনভাবে সহায়তা করে যে, সমস্যাটি উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থী তার প্রক্রিয়ায় যদি ভুল করে উত্তর দেয়, তাহলে কম্পিউটার তাকে জানিয়ে দেয় যে সেটি ভুল। সেই সময় feed back-এর মাধ্যমে তার শেখার দরকার হয় না।

(৩) **গৃহশিক্ষকের ভূমিকা পালন** (Tutorial mode of CAI) : যথার্থ পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে নির্দেশনাদানে প্রকৃত শিক্ষণকার্য সম্পন্ন করে। CAI এখানে শিক্ষার্থীর নিকট গৃহশিক্ষক স্বরূপ। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দিক থেকে তথ্য প্রদান, পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রদর্শন, পরীক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে CAI। শিক্ষার্থী যদি অগ্রবর্তী হতে হতে নির্দিষ্ট বিষয়টিতে পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে তাকে পরবর্তী উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে, আর যদি পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে পড়ে তাহলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার শিখনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করে।

Scanned with CamScanner

(৪) **শিখনে উৎসাহ প্রদান** (Reinforcement of learning) : শিক্ষার্থীকে ক্রমাগত অনুশীলনমূলক কর্ম প্রচেষ্টায় কম্পিউটার কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, বিরক্ত কম্পিউটার হতাশাগ্রস্ত এবং উদ্ধত হয়ে যায় না। শিক্ষার্থী যখন তার অনুশীলনমূলক প্রোগ্রামড্ আইটেম গুলিতে সঠিক উত্তর প্রদান করে তখন কম্পিউটার তার স্ক্রিনে হাসিমুখ প্রদর্শন করে, এতে শিক্ষার্থী নিজে আরও উৎসাহিত বোধ করে এবং অনুশীলন চালিয়ে যেতে কর্মোদ্যম লাভ করে।

(৫) **শিক্ষামূলক খেলা সম্পাদন** (Mode of educational games) : অনেক ক্ষেত্রে কম্পিউটার শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত ও যথাযথ নক্‌শাকৃত এবং পরিকল্পিত খেলা সম্পাদন করে। এই ধরনের খেলাগুলি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগত বিকাশ, বুদ্ধিগত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ, শিক্ষামূলক আগ্রহের উদ্দীপনা সঞ্চার তথা প্রেষণা সঞ্চারে শিক্ষার্থীকে প্রভূত সহায়তা করে। কার্যত এই ধরনের নির্দেশনা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে খেলার মাধ্যমে শিক্ষালাভ শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়।

(৬) **ভূমিকায়ন নির্দেশনা** (Simulation instruction) : শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ বা Training-এর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হল ভূমিকায়নের ব্যবহার। এই ধরনের নির্দেশনায় কর্মপদ্ধতি শিক্ষার্থীকে ক্ষমতাশালী শিখনযন্ত্রের সামনে উপস্থিত করে। এখানে খুব যত্ন সহকারে প্রস্তুত প্রোগ্রামের দ্বারা শিক্ষার্থীকে বাস্তবধর্মী অথবা আদর্শায়িত পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়। শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে পরিস্থিতির ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যেমন— যুদ্ধ ক্ষেত্রে একজন সৈনিককে শত্রুপক্ষের দিকগুলি বর্ধন করে এগিয়ে যেতে হয় অথবা শিক্ষার্থীর ঘন জঙ্গলে হিংস্র জন্তুদের মোকাবিলা করার ঘটনা শিক্ষার্থীকে বাস্তবধর্মী করে তার প্রশিক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৭) **সমস্যা সমাধানমূলক নির্দেশনা** (Problem solving mode of instruction) : এই ধরনের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীকে কোনো একটি সমস্যার সমাধানটি না দিয়ে বরং তার সামনে সমস্যার উত্তর বা সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। শিক্ষার্থীকে এক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে হয়। শিক্ষাথী CAI-এর সাহায্যে সমস্যাকে বিভক্ত করতে, বা বিশ্লেষণ করতে পারে, সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারে এবং একটি প্রস্তাবিত পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে। বস্তুত পূর্বে প্রদর্শিত একটি সমস্যার সমাধানের পথ ধরে শিক্ষার্থীকে অনুরূপ বিকল্প একটি সমস্যার সমাধান করতে হয়। Feed back-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার সমস্যা সমাধানের যথার্থ উপলব্ধি প্রদান করতে হয়।

(৮) **ব্যবহারিক কার্য-সম্পাদনমূলক নির্দেশনা** (Practical work oriented instruction) : CAI নির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত প্রোগ্রামে ল্যাবরেটারি এবং অন্যান্য ব্যবহারিক কর্মসম্পাদন-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান সহায়তা দান করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ব্যবহারিক কাজের আগে একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞানে পরীক্ষণের সম্পর্কে বহু কিছু স্বচ্ছন্দে শিখতে পারে কম্পিউটারের পূর্ব নির্দিষ্ট প্রোগ্রামটির মাধ্যমে। একইভবে সে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং অভিজ্ঞতালাভ করতে পারে কম্পিউটারে পূর্বোক্ত ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বারা।

(৯) **শিখন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাধর্মী নির্দেশনা** (Learning affairs managing type) : এই ধরনের নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে CAI শিক্ষার্থীদের শিখন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন সংক্রান্ত ব্যাপারে মূল্যবান সহায়তা দান করতে সমর্থ। শিক্ষার্থীরা শিখন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ব্যক্তিগত সুবিধা ও অসুবিধাগুলি, সর্বোপরি তাদের দুর্বলতাগুলিকে খুঁজে চিহ্নিত করতে পারে। শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রোগ্রাম যা CAI তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলি শিক্ষার্থীদের বিশেষভবে সহায়তা করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবক তাদের সন্তান বা শিক্ষার্থীদের কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব, আত্মশিখনে সহায়তা দান, গ্রন্থাগার পঠন, দলগত কার্যসম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেন CAI-এর মাধ্যমে। ছোট্ট একটি কম্পিউটার অনায়াসেই বিশাল গণনাকারী যন্ত্র বা Calculating machine-এর ব্যাপক পরিমাণ কাজকে সম্পন্ন করতে সক্ষম। সামান্য পরিশ্রমের দ্বারা মূক ও বধির শিশু-শিক্ষার্থীদের কাছে কম্পিউটার এক বিরাট ক্ষমতা নিয়ে তাদের শিক্ষার সাহায্যে এগিয়ে আসতে সক্ষম।

(১০) **ব্যক্তিগত চাহিদার ভিত্তিতে শিখন** (Learning based on individual needs) : প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ক্ষমতার এবং চাহিদার ভিত্তিতে শিখনে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয় CAI তে। একই সময়ে অপর কোনো শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার স্তর বা অগ্রসরতার ভিত্তিতে কোনো শিক্ষার্থীকে অপেক্ষা করতে বা ছুটতে বাধ্য করা হয় না। প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব চাহিদা অনুসারে নিজের আগ্রহ ও ক্ষমতাকে অতিক্রম না করে, সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ পরিস্থিতিতে শিখনে অগ্রসর ও পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পায় এখানে।

● **(খ) কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার ক্রিয়াশীলতা** (Operationof Computer Assisted Instruction) : CAI-এ বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর আছে, যেমন— হার্ডওয়্যার, সফ্‌টওয়্যার, কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ এবং কারিকিউলাম বা পাঠ্যক্রম পর্যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞান অনুসন্ধান করে তার সঞ্চয় এবং পুনরুদ্ধার করার বিশাল ক্ষমতা

Scanned with CamScanner

থাকার কারণে CAI বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের বি
দারুণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। Atkinson-এর মডেলের CAI তে তিনটি পর্যায় আছে। প্র
পর্যায়ে শিশুরা রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরের সাহায্যে একক বর্ণ উচ্চারণ করতে শেখে। দ্বি
পর্যায়ে শিশুরা একজোড়া বর্ণের ব্যবহার শেখে, তৃতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি বর্ণের সম
ব্যবহার শেখে। কম্পিউটার শিক্ষার্থীদের শিখন সংক্রান্ত নানা বিষয় ধারণ করে রাখতে প
এবং শিক্ষার্থীরা যখনই অসুবিধার মুখোমুখি হয়, তখন শিক্ষকের সহায়তা পায় খুব সহজে

Stolurow এবং **Davis** (১৯৬৫)-এর মতানুসারে, একটি শিখনযন্ত্র বা teaching machine এ তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে—

(i) এটি অবশ্যই শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক পর্যায়ের আচরণ, সাধারণ মানসিক ক্ষমতা, বাঁ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যবহার করবে।

(ii) এটি অবশ্যই নির্দেশনা চলাকালীন সময়ে প্রোগ্রামকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হ

উপরোক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র কম্পিউটার নামক যন্ত্রেরই থাকে। প্র কম্পিউটারের প্রধান কার্যাবলিকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়—

(i) তথ্যের সঞ্চয় ভাণ্ডার গঠন

(ii) সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে তথ্য বহন

(iii) দুরদেশ থকে প্রাপ্ত তথ্যকে ছাপানো অবস্থায় প্রদান

(iv) একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রস্তুতিকরণ

ফ্রেমের বিন্যাস অনুসারে কোনো একজন ব্যক্তি CAI কৌশলকে ব্যবহার করে রৈখি শাখা বিভাজিত, শিফ্-রৈখিক, অবরোহী, আরোহী এবং সমস্যা সমাধানমূলক ক্ষেত্রে ক লাগাতে পারে। অন্যান্য প্রোগ্রাম-এর তুলনায় CAI-এ ধীরগতি কিংবা স্বাভাবিক গতিস সব ধরনের শিক্ষার্থীদের সংশোধনমূলক বিন্যাসকে কাজে লাগানা সম্ভব। কারণ C বিশাল ও বহু রকমের প্রোগ্রাম সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

● (ঙ) **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য** (Features of Comput Assisted Instruction) : কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার বিশেষ কতকগুলি বৈ আছে। সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **প্রস্তুতির একক** (Unit of preparation) : সবচেয়ে নিম্নস্তরে CAI হতে প রৈখিক অথবা শাখা বিভাজিত ধরনের এবং এরপর চাহিদা অনুসারে পরিবর্তি হতে পারে।

(ii) **ধাপের আকার ও সংখ্যা** (Size and mumber of steps) : শিখনের অনুসারে ধাপের আকার এবং সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে।

(iii) **ভুলের মাত্রা** (Error rate) : বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ব্যবহার হয় ভুলের হার বা মাত্রা বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন রকম হয়।

(iv) **পুনঃশক্তি সঞ্চয়** (Re-inforcement) : CAI তে শিক্ষার্থী তার প্রতিক্রিয়া সম্পাদনে সঠিক উত্তর প্রদানের মাধ্যমে পুনঃশক্তি সঞ্চার ঘটে বা Re-inforcement লাভ করে।

(v) **বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা** (Subject matter suitability) : CAI তে যে-কোনো স্তরের যে-কোনো বিষয়বস্তুর ব্যবহার সম্ভব।

● (চ) **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার সুবিধাসমূহ** (Advantages of Computer Assisted Instruction) : কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার যে সমস্ত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে আমরা নিম্নলিখিতভবে উপস্থাপিত করতে পারি :

(১) শিক্ষার্থী তার নিজের স্থানে অবস্থান করে সহজেই নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে।

(২) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যেমন যেমন নির্দেশনা লাভ করে তেমন ধারাবাহিকভাবে গৃহীত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দানের কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

(৩) প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজের ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী নির্দেশনা গ্রহণ করে নিজের অগ্রগতিকে বজায় রাখতে পারে।

(৪) নিজের প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের ধারা অনুযায়ী শিক্ষার্থী সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবার্তা বা ফিডব্যাক লাভ করে।

(৫) যেহেতু শিখনে সমগ্র উপাদানকে ধাপে ধাপে ছোটো ছোটো এককে শিক্ষার্থী নির্দেশনা পায় সেই কারণে সব ধরনের শিক্ষার্থীই সহজেই শিখন সম্পন্ন করতে পারে।

(৬) প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব স্টাইল অনুযায়ী শিখন লাভে সমর্থ হয়। তারা শেখে উদাহরণ এর মাধ্যমে, পাঠের মাধ্যমে অথবা সমস্যা সমাধানের দ্বারা।

(৭) শিখনের প্রক্রিয়া চলাকালে শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলেই যে-কোনো সময়ে তাদের শেখার অগ্রগতি তারা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারে।

(৮) শিক্ষার্থীরা শেখে আপন আপন পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম পদ্ধতি বা উপায়ে। যেমন উপস্থাপিত পাঠের দ্বারা, টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে, অনুশীলনের মাধ্যমে অথবা ভূমিকায়নের উপায় অবলম্বন করে।

(৯) এই ধরনের নির্দেশনার দ্বারা শিক্ষার্থীরা দ্রুত অথচ বিরাট এক তথ্য ভাণ্ডারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে তথ্য সমৃদ্ধ হতে পারে।

(১০) ব্যক্তিবৈষম্য অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষার্থী শিখনের সুযোগলাভ করে এই ধরনের নির্দেশনায়।

● (ছ) **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার অসুবিধাসমূহ** (Disadvantages of Computer Assisted Instruction) : CAI-এর কতকগুলি অসুবিধাও আছে। সেগুলি হল নিম্নরূপ—

Scanned with CamScanner

(১) শিক্ষার্থী তার ভাবনাকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারে না।
(২) কোনো কিছুকে সংক্ষেপে অল্প কথায় তুলে ধরার জন্য প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে পায় না।
(৩) এই ধরনের নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে না।
(৪) শিক্ষার্থী তার সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ এই নির্দেশনায় পায় না।
(৫) শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ খুব একটা পায় না। কম্পিউটার শিক্ষার্থীর আবেগকে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে মানবীয় সম্পর্কের দ্বারা শিখন অনেকখানিই ব্যর্থ হয়।
(৬) শিক্ষার্থীর ভাষামূলক দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ এক্ষেত্রে থাকে না।
(৭) শিক্ষার্থীর কল্পনা, চিন্তন, শিল্পচেতনা বৃদ্ধির সুযোগ খুব কম।

Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 2

১। একটি ভালো বক্তৃতার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of a good lecture?)
২। বক্তৃতা পদ্ধতির চারটি সুবিধা উল্লেখ করুন। (State the four merits of Lecture Method.)
৩। বক্তৃতা পদ্ধতির চারটি অসুবিধা উল্লেখ করুন। (State the four demerits of Lecture Method.)
৪। পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতির কৌশলগুলি কী কী? (What are the strategies of Interactive Method?)
৫। প্রতিপাদন পদ্ধতির সুবিধাগুলি কী কী? (What are the merits of Demonstration method?)
৬। প্রতিপাদন পদ্ধতির অসুবিধাগুলি কী কী? (What are the demerits of Demonstration Method?)
৭। আবিষ্কার পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? (What is Heuristic Method or Discovery Method?)
৮। আবিষ্কার পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the objectives of Heuristic Method?)
৯। প্রোজেক্ট পদ্ধতির চারটি মূল নীতি উল্লেখ করুন। (State the four main principles of project Method.)
১০। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার মৌলিক নীতিগুলি কী কী? (What are the basic assumptions of computer assisted Instruction?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাগুলি লিখুন। (Write the merits of Lecture Method.)
২। বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাগুলি লিখুন। (Write the demerits of Lecture Method.)
৩। ভালো বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the characteristics of a good Lecture.)
৪। সহযোগিতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়া কাকে বলে? (What is Co-operative Interaction?)

Scanned with CamScanner

৫। প্রতিপাদন পদ্ধতির ধাপগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। (State the steps of Demonstration Method.)

৬. প্রতিপাদন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন। (Write the merits and demerits of Demonstration Method.)

৭। প্রোজেক্ট পদ্ধতির মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (Discuss in brief the main principles of Project Method.)

৮। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার ক্রিয়াশীলতা উল্লেখ করুন। (State the operation of Computer Assisted Instruction.)

❑ রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি (Essay type questions) :

Marks - 10

১। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতিকে বিবেচনা করা হয় কেন? (Why lecture method is considered as most effcetive method in classroom teaching.)

২। প্রতিপাদন পদ্ধতির প্রধান ধাপগুলি বর্ণনা করুন। (Discuss the main principles of Demosnstration method.)

৩। আবিষ্কার পদ্ধতির লক্ষ্যগুলি বর্ণনা করুন। (Explain the aims of Discovery method/Heuristic method.)

৪। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন। (Discuss the modes of Computer Assisted Instruction.)

৫। শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়ার বিবরণ দিন। (Give the description of Interaction in the class.)

অধ্যায় ৩

সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) শিখন সম্পদ

(Learning Resource in Social Science Teaching)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৩.১ **শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব (Meaning, type and importance of Learning Resources)**

- ৩.১.১ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Resoures)
- ৩.১.২ শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources)
- ৩.১.৩ শিখন সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Learning Resources)
- ৩.১.৪ শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Learning Resources)
- ৩.১.৫ ইতিহাস শিক্ষণে শিখন সম্পদ

৩.২ **সমাজ বিজ্ঞানের (ইতিহাস) ভালো পাঠ্যবই-এর গুণাবলি (Quality of good social science text book)**

- ৩.২.১ ভূমিকা (Introduction)
- ৩.২.২ পাঠ্য পুস্তক (Text Book)
- ৩.২.৩ পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance of text book)
- ৩.২.৪ ভালো সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good Social Science Text book)
- ৩.২.৫ ভালো ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good History Text book)

৩.৩ **সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) শিখন সহায়ক উপকরণ (Teaching aids in Social Science)**

- ৩.৩.১ শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণের ধারণা (Concept of Teaching Aids and Appliances)
- ৩.৩.২ শিক্ষণ প্রদীপনের সংজ্ঞা (Definitions of Teaching Aids)
- ৩.৩.৩ শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা (Utility of Teaching Aids)

Scanned with CamScanner

৩.৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি (Essential Qualities of Teaching Aids)
৩.৩.৫ শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা (Limitation in the uses of Teaching Aids)
৩.৩.৬ শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Teaching Aids)

৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন (Improvisation of Teaching Aids)
৩.৪.১ ভূমিকা (Introduction)
৩.৪.২ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Improvised Teaching Aids)
৩.৪.৩ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ পদ্ধতি (Process of Developing Improvised Teaching Aids)
৩.৪.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষণ প্রদীপন তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের গুরুত্ব (Importance of Improvised Teaching Aids in Teaching Education)
৩.৪.৫ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণ ও কার্যকরী ব্যবহারে সমস্যা (Problems in the Development and Effective use of Improvised Teaching Aid)
৩.৪.৬ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের দৃষ্টান্ত (Improvisation of Teaching Aids Example)

৩.৫ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) গবেষণাগারের পরিকল্পনা (Planning and organization of Social Science Laboratory)
৩.৫.১ ইতিহাস ল্যাবরেটারির অর্থ (Meaning of Education Laboratory)
৩.৫.২ ইতিহাস ল্যাবরেটারির প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব (Need and Importance of Education Laboratory)
৩.৫.৩ ইতিহাস ল্যাবরেটারির পরিকল্পনা (Designing of Education Laboratory)
৩.৫.৪ ইতিহাস ল্যাবরেটারিতে যে সমস্ত শিক্ষামূলক সামগ্রী ও উপকরণ রাখা যেতে পারে (Type of Material and Equipment to be kept in a History Laboratory)

৩.১ শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব (Meaning, type and importance of Learning Resources) :

৩.১.১ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Resoures) :

আমরা সাধারণভাবে 'সম্পদ' বলতে বুঝি 'ঐশ্বর্য' বা 'ধনসম্পত্তি'। কিন্তু অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলতে বোঝায় সেই উপাদনকে যার (i) উপযোগিতা আছে, (ii) চাহিদার তুলনায় জোগান কম, (iii) যার বিক্রয় মূল্য আছে এবং (iv) যার উৎপাদন অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক। অর্থনৈতিক ভূগোলে সম্পদ কিন্তু কোনো বস্তু বা উপাদান মাত্র নয়। বস্তুর কার্যকারিতাই হল সম্পদ। সেক্ষেত্রে সম্পদের দু'টি উল্লেখযোগ্য গুণ থাকবে— (i) উপযোগিতা, (ii) কার্যকারিতা। বিশিষ্ট সম্পদ শাস্ত্রকার E.W. Zimmermann (১৯৫১)-এর ভাষায় "সম্পদ হল লক্ষ্যপূরণের একটি মাধ্যম, যে লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত চাহিদাপূরণ বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন।" Encyclopedia of Social Sciences মতানুসারে সম্পদ হল মানুষের পার্থিব ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপাদান। সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে সম্পদ বলা হবে যেগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে এবং সামাজিক লক্ষ্য পূরণের অনুকূল। সম্পদের মূল লক্ষ্যই হল মানুষের কল্যাণ সাধন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন তার কর্মক্ষমতা দিয়ে প্রাকৃতিক উপাদানগুলিতে উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা আরোপ করে মানব সমাজে কল্যাণকামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তখনই সেগুলি সম্পদে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে, 'কয়লা' নামক প্রাকৃতিক উপাদানটি যখন মাটির সুগভীর অংশে নিহীত থাকে তখন সেটি সাধারণ একটি পদার্থ মাত্র। কিন্তু যখন সেই কয়লাকে মাটির সুগভীর অংশ থেকে তুলে এনে কাঁচামাল হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানো হচ্ছে তখনই তা উপকরণ বা সম্পদে পরিণত হচ্ছে।

সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে সম্পদের সংজ্ঞাও বদলায় **কোলারস** এবং **নাইস্টুয়েনের** (Kolars and Nystuen, 1975) মতানুসারে সম্পদকে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করে সংস্কৃতির উপর, যেমন মানুষের কাছে কয়লা একটি সাধারণ কালো রঙের পাথর হলেও, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী যুগে মানুষের কাছে কয়লা একটি অতীব মূল্যবান বস্তু। স্থান ও কাল ভেদে সম্পদের সংজ্ঞা বদলে যায়।

জীবমণ্ডল এবং সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এজন্য ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলনে সম্পদের যে নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যাতে বলা হয়েছে— "পরিবেশের যা কিছু বস্তু তার কার্যকারিতার মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবকুলের সংরক্ষণকেও সুনিশ্চিত করে তাকেই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।"

Scanned with CamScanner

উপলব্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের অর্থ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার সংস্কৃতি (Culture)-এর সাহায্যে প্রকৃতির বিশাল ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত উপাদান সমূহের বিচার করে, পরীক্ষানিরীক্ষা করে কোন্‌টি সম্পদ তা স্থির করে, যেমন এক সময় কীটনাশক বস্তু হিসেবে DDT সম্পদ হিসেবে মান্যতা পেলেও পরবর্তীকালে তা জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, ফলে তা আর সম্পদ নয়। বস্তুত, 'জ্ঞান হল সম্পদের প্রকৃত জননী।' শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ হিসেবে জ্ঞান সম্পদের জন্ম দেয়। প্রাচীনকাল থেকে ধীরে ধীরে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে নতুন নতুন সম্পদের সৃষ্টি করে চলেছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক চেতনা ও বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে মানুষ সম্পদ সম্পর্কে তার উপলব্ধিকে পরিবর্তিত করে নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং শিক্ষাই হল প্রকৃত উপায় যার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রয়োগকে বিস্তৃত করে এবং সামগ্রিকভাবে উপলব্ধির জগৎকে সমৃদ্ধ করে। সেদিক থেকে মানুষ নিজেই সম্পদে পরিণত হতে পারে এই শিক্ষার মাধ্যমে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত ধারণা পেতে পারি :

(১) সম্পদ পরিবেশের উপাদান।

(২) সম্পদ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত অথবা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে।

(৩) সম্পদ মানুষের চাহিদা পূরণ করে।

(৪) সম্পদ মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

(৫) সম্পদ অসীম বা সীমাহীন নয়।

(৬) কিছু সম্পদ বারে বারে ব্যবহার করা যায়।

(৭) সম্পদের কার্যকারিতা একমুখী ও বহুমুখী উভয়ই হতে পারে।

(৮) সম্পদের ধারণা স্থান ও কাল-এর উপর নির্ভর করে।

(৯) মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা, দক্ষতা, বিচারবোধ হল সম্পদ।

(১০) সম্পদ সর্বদা গতিশীল। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে নিরপেক্ষ সামগ্রী সম্পদে পরিণত হয় এবং কোনো সম্পদ আরো উন্নত থেকে উন্নততর সম্পদে বিকশিত হয়।

(১১) প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ায় সম্পদ সৃষ্টি হয়।

(১২) সম্পদ জীবমণ্ডলের সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে।

❑ ৩.১.২ শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources) :

শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে সেই পরিবর্তনের ধারায় বিকাশলাভ করেছে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার। এই শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার বিবর্তনের সূত্র ধরে কয়েক দশক পরে এসেছে একটি নতুন ধারণা যা শিখন সম্পদ বা Learning Resource নামে অভিহিত। শিক্ষা জগতের সঙ্গে সম্পদের ধারণায় এটি একটি নতুন প্রত্যয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর সমার্থ হল শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ায় একটি অভিনব কৌশল প্রয়োগ করা, যাতে সমস্ত রকম শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যায়। সম্পদের অর্থ আলোচনায় আমরা দেখেছি অবস্তুগত সম্পদ হিসেবে 'জ্ঞান' মানুষের জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জ্ঞান অর্জন তথা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর। বস্তুত, আমাদের অভিজ্ঞতা লাভ বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভূমিকা সর্বাধিক। জ্ঞানের ৮৩ শতাংশ অর্জিত হয় চক্ষু বা দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এবং ১১ শতাংশ অর্জিত হয় কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টি ও শ্রবণ নির্ভর মাধ্যমগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত মাধ্যমগুলি বস্তুগত সম্পদ হিসেবে মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন চাহিদা পূরণ করে তেমনই সামগ্রিকভাবে তার কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবে এগুলির বিশেষ স্বীকৃতি আজ সর্বজনগ্রাহ্য। আবার জ্ঞান যেমন মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তেমনই মানুষ নিজেও এই জ্ঞানের দ্বারাই মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে। আবার একথাও আজ সর্বজনস্বীকৃত যে গ্রন্থ এবং অগ্রন্থ (বিভিন্ন প্রকার শিখন সহায়ক সামগ্রী) উভয় প্রকার সম্পদ পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। সুতরাং মানুষের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও অগ্রন্থ উভয় প্রকার সামগ্রীই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা বলতে পারি অক্ষরযুক্ত গ্রন্থ এবং শিখনে সহায়ক অন্যান্য বিভিন্ন অগ্রন্থ সামগ্রী যা কিছু মানুষের শিখনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি সবই শিখন সম্পদ (Learning Resource) হিসেবে পরিচিত। এইসব শিখন সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— পাঠ্যপুস্তক, আকরগ্রন্থ, অভিধান, অনুশীলনমূলক বই, প্রশ্নভাণ্ডার, ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ঝাড়ন, রেডিয়ো বা বেতারযন্ত্র, দূরদর্শন, টেপ রেকর্ডার, গ্রামোফোন, মানচিত্র, চার্ট, পোস্টার, মডেল, বাস্তববস্তু, স্লাইড, ট্রান্সপারেন্সি ফিল্‌ম্ স্ট্রিপ, চলচ্চিত্র, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন, বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থী।

❑ ৩.১.৩ শিখন সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Learning Resources) :

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা যেমন বেশি তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বাক্ষরতার আওতার বাইরে অবস্থান করে। এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির অনুন্নত ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে শিখন সম্পদকেন্দ্র বা বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন দেখাই যায় না, তেমনি থাকলেও সেই সমস্ত কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিখন সম্পদের ব্যবহার ও চাহিদা

Scanned with CamScanner

উভয়ই বেশ নগণ্য ও অবহেলিত। অথচ এই সমস্ত শিখন সম্পদগুলি (গ্রন্থ এবং অগ্রন্থ সামগ্রী)র প্রয়োজন আর উপযোগিতা অনেকখানি। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও বিনোদনের পরিবেশের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদগুলির প্রয়োজন অনেকখানি অথচ ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলিতে তুলনামূলকভাবে তার সুযোগ বেশ কম। শিখন সম্পদকেন্দ্রগুলি অথবা বিদ্যালয়গুলি যদি যথার্থভাবে মানুষের শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসতে চায় তাহলে গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রন্থকেও অনেক বেশি ব্যবহার করে সাফল্য পেতে পারে। বিভিন্ন প্রকার শিখন সম্পদ-কেন্দ্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত হচ্ছে শিখন সম্পদগুলির সহযোগিতায় সাক্ষরতার ভারসাম্যকে সার্থক করে তোলা। সেদিক থেকে উনয়নশীল দেশগুলিতে শিখন সম্পদের প্রয়োজনীয়তও গুরুত্ব অপরিসীম।

❑ ৩.১.৪ শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Learning Resources) :

ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

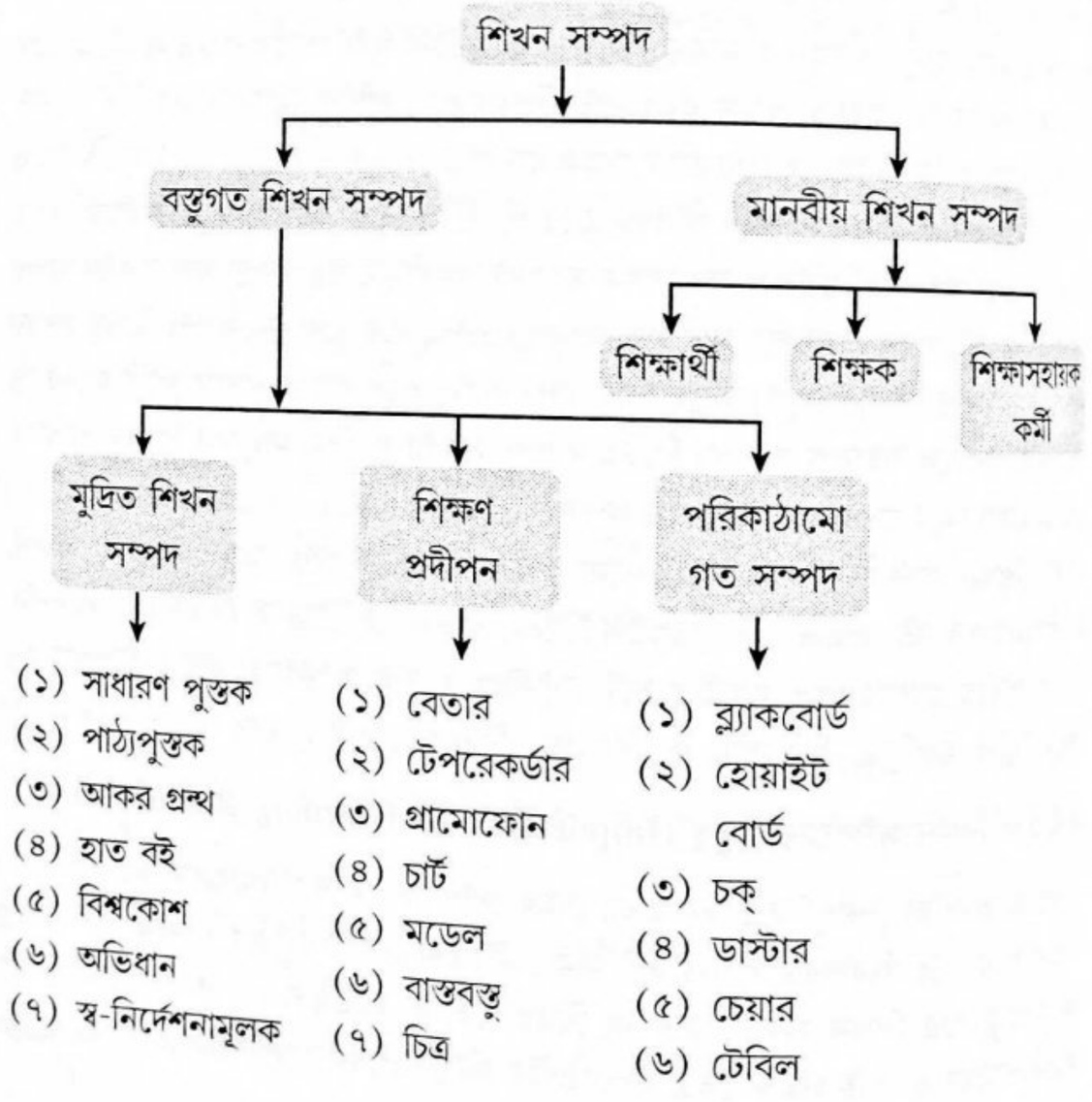

(৮) প্রোগ্রামড্ লার্নিং মেটেরিয়াল
(৯) অনুশীলন বই
(১০) প্রশ্নভান্ডার
(১১) কর্মপত্র
(৮) মানচিত্র
(৯) স্লাইড
(১০) রেখাচিত্র
(১১) লেখাচিত্র
(১২) গ্লোব
(১৩) ফিল্ম স্ট্রিপ
(১৪) চলচ্চিত্র
(১৫) দূরদর্শন
(১৬) কম্পিউটার
(৭) বেঞ্চ
(৮) জ্যামিতি বক্স
(৯) শ্রেণিকক্ষ
(১০) লাইট
(১১) ফ্যান
(১২) জলের কল
(১৩) ইউরিন্যাল ও ল্যাট্রিন
(১৪) গ্রন্থাগার
(১৫) খেলার মাঠ

❑ ৩.১.৫ ইতিহাস শিক্ষণে শিখন সম্পদ :

(ক) শিখন সম্পদরূপে সময়রেখা (Time Line as a Learning Resource) :

ভূমিকা : কালচেতনা ইতিহাস পঠন পাঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। মানব সভ্যতার কালানুক্রমিক নিরবচ্ছিন্ন ধারাই হল ইতিহাস। স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে উপস্থাপন করা হয়। কালের সঙ্গে জীবন ও কর্মের যোগসূত্র রচিত হলে বিষয়টিই ইতিহাসে গুরুত্ব অর্জন করে (The Conception of time pregnant with life and action in very important to history)। মানব সভ্যতার উত্থান, ক্রম অগ্রগতি, পতন কালক্রমের সঙ্গে জড়িত। কোনো যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা, ইতিহাসের ভাঙাগড়া, কোনো বিশেষ সভ্যতার উত্থান পতনকালের ক্রমগতির সঙ্গে জড়িত। কালক্রমে বুঝতে না পারলে ইতিহাস চেতনা সঠিকভাবে জাগ্রত হয় না। কালচেতনা ইতিহাস চর্চার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই ইতিহাস শিক্ষণ প্রসঙ্গে কাল চেতনার মূল্য অপরিসীম। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাল চেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে সময় রেখার (Time Line)-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

● **সময় চেতনার বিভিন্ন দিক :** কাল বা সময় চেতনার তিনটি দিক সংস্থাপনা (Location), দূরত্ব (Distance) ও ব্যাপ্তি (Duration) ঘটনার সংস্থাপন দ্বারা নির্ণয় করা হয়। সময় চেতনার প্রাথমিক উপাদান সংস্থাপনা দ্বারা ঘটনার কাল নির্ণয় করা হয়। ঘটনাকে সঠিক তারিখে স্থাপিত করাই হল সময় চেতনা সম্পর্কিত সংস্থাপনা (Location of Time) অর্থাৎ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা কখন ঘটেছে (পলাশীর যুদ্ধ কবে সংগঠিত হয়েছিল?) সেটি শিক্ষার্থীর কাছে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় সংস্থাপনা দ্বারা। সময় চেতনা সৃষ্টির দ্বিতীয় উপাদান হল সময়ের দূরত্ব। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বর্তমান থেকে কতকাল আগে ঘটেছিল? কিম্বা দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেকার দূরত্ব নির্ণয় করা যায় এবং এই দূরত্ব থেকে দুটি ঘটনার সম্পর্ক বোঝা যায়। কাল চেতনার তৃতীয় উপাদান হল সময়ের

Scanned with CamScanner

ব্যাপ্তি (Duration)। কোনো ঘটনা কত সময় ধরে ঘটেছে তার পরিমাপ হল ব্যাপ্তি প্রকাশ। বিশ্বযুদ্ধ চার বছর ধরে হয়েছিল (১৯১৪-১৯১৮), সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ কত বছর ধরে ঘটেছিল (১৭৫৬-৬৩ সাত বছর ধরে)—এটি হল সময়ের ব্যাপ্তি। সময়ের ব্যাপ্তি দ্বারা ঘটনার আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইতিহাস শিক্ষণের বড়ো কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কালচেতনা গড়ে তোলা। কালের ধারণা বিমূর্ত বিষয়। কাল অবিনশ্বর, অনাদি ও অনন্ত। এমনকি কাল বা সময় ইতিহাস সৃষ্টির আগেও ছিল, আজও অনন্তকাল ধরে থাকবে, এমন কালকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা যায় না। কাল চোখ দিয়ে দেখা যায় না। সময় সম্পর্কে ধারণা কোনো স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি থেকে আসে না। কালচেতনা এক ধরনের অনুমিতি। কোনো বিন্দুর উপর ভিত্তি করে এই ধারণা গড়ে তুলতে হয়।

● **সময় চেতনা সৃষ্টির উপায় :** নানা উপায়ে শিশুদের মনে সময় চেতনা সৃষ্টি করা যায়। এদের মধ্যে সময় রেখা হল কালচেতনা সৃষ্টির সর্ব উৎকৃষ্ট উপায়। সময় রেখা দু প্রকারের হতে পারে—উলম্ব সময় রেখা (Vertical Time Line) এবং অনুভূমিক সময় রেখা (Horizontal Time Line)। প্রথমটির ক্ষেত্রে উপরের প্রান্তকে অতীত এবং নিম্নপ্রান্তকে বর্তমান ধরা হয়। অনুভূমিক সময় রেখা ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় অঙ্কিত। ঐ রেখার বামপ্রান্তকে অতীত এবং দক্ষিণ প্রান্তকে বর্তমান ধরা হয়।

এই উভয় প্রকার সময় রেখাকে আবার অগ্রগামী (Progressive) এবং পশ্চাদগামী (Regressive)—এই ভাগে ভাগ করা যায়। অগ্রগামী সময়রেখা অতীত থেকে বর্তমানের দিকে সময়ের ক্রমকে অনুসরণ করে। এর সাহায্যে ক্রমশ বর্তমানকালের দিকে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে থাকে। এই রেখা বর্তমানের সঙ্গে পরিপূর্ণ যোগসূত্র রচনা করে না, কিন্তু পঠন-পাঠন বর্তমানের দিকে অগ্রসর হয়। পশ্চাদগামী সময়রেখা বর্তমান থেকে অতীতের দিকে পিছিয়ে যায়। কিন্তু খ্রিস্টাব্দের আরম্ভ বিন্দুতে যোগসূত্র রচনা করে না।

কলাচেতনা প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সময় কখনও স্তব্ধ হয়ে যায় না, চলতে থাকবে। 'ঘটনার কাল'-এর পূর্বে সময় ছিল এবং পরেও সময় আছে। সুতরাং সময় রেখা এমনভাবে অঙ্কন করতে হবে যেন উক্ত ধারণাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উলম্ব এবং অনুভূমিক সময়রেখার সমান্তরাল অন্যান্য রেখার মাধ্যমে একই দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় জীবন অথবা ভিন্ন দুটি দেশের দুটি বা ততোধিক ঘটনাকে বাস্তবায়িত করা যায়। এইরূপ একটি অনুভূমিক সময়রেখার সমান্তরাল অনেকগুলি রেখা অঙ্কন করে সমসাময়িক ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ধারাগুলিকে সুস্পষ্ট করা যায়।

(খ) শিখন সম্পদ রূপে মানচিত্র (Map as a Learning Resource) :

ভূমিকা : দৃষ্টি নির্ভর শিক্ষণ প্রদীপনগুলির মধ্যে মানচিত্র অন্যতম। ইতিহাসের পঠন-পাঠনে মানচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানচিত্র ছাড়া ইতিহাস পঠন-পাঠনের অকল্পনীয়। ইতিহাসের

দুটি চোখ হল স্থান ও কাল। ইতিহাসের ঘটনা কখনোই শূন্যে সংঘটিত হয় না। একটি জাতির ইতিহাস কখনো স্থান নিরপেক্ষ হতে পারে না। প্রাবন্ধিক **প্রমথ চৌধুরীর** মতে, ইতিহাসের ছবি আঁকতে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনো একটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ করতে না পারলে সেকালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিয়োগ্রাফি নেই। অনন্তকালেরও হিস্টরি নেই। বস্তুত ইতিহাস হল স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। সুতরাং স্থান চেতনা ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থান চেতনা বিকাশে মানচিত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

● **স্থানচেতনার বিভিন্ন দিক :** ইতিহাসে স্থান চেতনার তিনটি দিক—প্রথমত : যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে সেই স্থান নির্ণয় (Localisation), দ্বিতীয়ত : নির্ধারিত স্থানটির পরিধি নির্ণয় (Area), তৃতীয় হল : স্থানের ব্যাপকতা নির্ণয় (Extent) অর্থাৎ ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে? কতটুকু স্থানের মধ্যে ঘটেছিল? স্থানটির পরিধি কতটুকু ছিল? —এগুলি জানতে মানচিত্র অপরিহার্য। মানচিত্র নানা প্রকারের হয়। প্রাকৃতিক মানচিত্র, রাজনৈতিক মানচিত্র, ঐতিহাসিক মানচিত্র, রেখামানচিত্র ইত্যাদি। ইতিহাসে স্থান চেতনা বিকাশের জন্য মুখ্যত ঐতিহাসিক মানচিত্র, অ্যাটলাস প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন মতো রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক মানচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

● **স্থানচেতনা সৃষ্টির উপায় :** কোনো রাজ্যের অবস্থান, ওই রাজ্যটি অপর রাজ্য থেকে কতটা দূরে এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কী কী রয়েছে প্রভৃতি জানতে মানচিত্রের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। কোনো পর্বতের অবস্থান, নদীর গতিপথ, রেলপথের বিস্তার প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনে মানচিত্রের ব্যবহার অপরিসীম। কোনো রাজ্য, নদী, সাগর পর্বতমালা ইত্যাদি দেখানোর জন্য প্রাকৃতিক মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। কোনো শাসকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, কোনো যুদ্ধ বা বিদ্রোহের কেন্দ্র, রেলপথের বিস্তার, শিল্পকেন্দ্র বা বাণিজ্য কেন্দ্র, বন্দর প্রভৃতি দেখানোর জন্য রাজনৈতিক মানচিত্র বা বহিঃরেখামানচিত্র (Outline Map) ব্যবহৃত হয়। মানচিত্র ব্যবহারের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা অবশ্যই মানচিত্র নির্দেশক ছড়ি (Map Pointer) ব্যবহার করবেন।

(গ) শিখন সম্পদরূপে ইতিহাস কক্ষ (History Room) :

ভূমিকা : বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পাঠদানের জন্য যেমন– পরীক্ষাগার বা Laboratory-এর প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ইতিহাস শিক্ষার জন্য পৃথক ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজন। কেননা বর্তমানে ইতিহাস হল সমালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক V.D. Ghate বলেছেন, "ইতিহাস তো আজ বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।" বিদ্যালয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠন সার্থক করে তুলতে, বিশেষত উচ্চতর শ্রেণিগুলির জন্য পৃথক ইতিহাস কক্ষ রাখা বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

• ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজনীয়তা :

(i) ইতিহাস শিক্ষার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিই হবে ক্রমকেন্দ্রিক বিজ্ঞান নির্ভর এবং ইতিহাসের মূল সমস্যাগুলির অনুধাবন ও বিচার বিশ্লেষণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব ক্রিয়াগুলি সক্রিয় করে তোলার জন্য ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজন।

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা সৃষ্টি ইতিহাস শিক্ষণের মূল কথা। এর জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ, প্রেরণামূলক পরিবেশ গঠনের জন্য ইতিহাসের পৃথক কক্ষ অত্যাবশ্যক।

(iii) ইতিহাস শিক্ষণের যে-কোনো পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য চাই শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী – ব্ল্যাকবোর্ড, গ্রাফবোর্ড, রেডিয়ো, গ্রামোফোন, এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, মানচিত্র, গ্লোব, নক্সা, ছবি, চার্ট, গ্রাফ, সংগৃহীত সামগ্রী অথবা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টায় তৈরি ঐতিহাসিক সামগ্রীর মডেল প্রভৃতি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য পৃথক ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজন।

(iv) সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম ইতিহাস শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী অতীত যুগের নিদর্শন, মডেল, মুদ্রা, তৈলচিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করতে পারে। এগুলিকে আর্ট গ্যালারিতে রেখে অথবা জাদুঘরের প্রদর্শনীর ন্যায় সুসজ্জিত করে শিক্ষা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। এর জন্য দরকার পৃথক কক্ষ।

(v) সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, এপিডায়াস্কোপ ও ম্যাজিক ল্যান্টার্ন ব্যবহারের জন্য চাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। বর্ণনামূলক, উৎস সন্ধানী ও অন্যান্য কর্মভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য পৃথক প্রশস্ত কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(vi) শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির মূল উৎস হলেন শিক্ষক। দূর অতীতকে শিক্ষার্থীর কাছে বাস্তবায়িত করতে হলে শিক্ষককে পূর্ব থেকে তৈরি হতে হয়। পঠন-পাঠন পরিচালনার পূর্বে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। এরজন্য যদি তাঁকে কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ছোটাছুটি করতে হয় তাহলে সীমিত সময় অকারণে নষ্ট হবে ও পরিকল্পিত পাঠ-পরিবেশ আকর্ষণীয় ও সু-শৃঙ্খল হবে না। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য ইতিহাসের পৃথক কক্ষ প্রয়োজন।

(vii) আবার পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে এমন সব পুস্তকাদি ও উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ শ্রেণিকক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। ইতিহাস কক্ষে যাবতীয় ইতিহাসের পুস্তক ও উপকরণাদি সযত্নে রক্ষিত থাকে বলে যে-কোনো প্রশ্নের বা যে-কোনো সমস্যার সমাধান শিক্ষক অনায়াসে করতে পারেন। ফলতঃ শিক্ষক পাঠদান করে তৃপ্ত হন। শিক্ষার্থীরা মনের দ্বিধা কাটাতে পারে তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে।

অবশেষে বলা যায়, ইতিহাসের কক্ষ হল শিক্ষার্থীদের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্র। এই কক্ষে শিক্ষার্থীরা উপকরণাদি ব্যবহার করবে, নতুন উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে। এখানে তারা প্রয়োজনীয় রেফারেন্স পুস্তকাদি ও পত্র-পত্রিকা পড়ে তথ্য চয়ন করে ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। উপরন্তু ঐতিহাসিক মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, মডেল ইত্যাদি তৈরি করে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। কক্ষের পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তুলবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব, স্থান ও কাল চেতনা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস চেতনা। তাই ইতিহাসের পৃথক কক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে অপরিহার্য।

☆ ইতিহাস কক্ষ সজ্জিতকরণ (How to Equip the History Room) :

ইতিহাসের জন্য শুধু একটি কক্ষ থাকলে হবে না, সেটি সুসজ্জিত ও ব্যবহারের উপযোগী হওয়া চাই। তাই ইতিহাস কক্ষের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যথা—

(i) কক্ষটি হবে সাধারণ শ্রেণিকক্ষ অপেক্ষা বৃহদাকারের এবং আলো বাতাসপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষের পিছনের দিকে দেয়ালে চুন দিয়ে সাদা করে রাখতে হবে, যাতে দেয়ালে চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। অন্য দু-দিকের দেয়ালে পেরেকে ছবি, মানচিত্র, চার্ট, সময়রেখা, প্রভৃতি টাঙানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সামনের দেয়ালে বুলেটিন বোর্ড ও ব্ল্যাকবোর্ড টাঙাবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এবার কক্ষের যেদিকে শিক্ষকের বসবার স্থান সেদিকের দেয়ালে আলমারি সহ উপযুক্ত শেলফ রাখা প্রয়োজন।

(ii) এবার ইতিহাস কক্ষটি সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য প্রথম প্রয়োজন আসবাবপত্র। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চেয়ার, টেবিল, শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো ব্যবহারের জন্য আলমারি, ম্যাপ, র‍্যাক ও স্ট্যান্ড, বুলেটিন বোর্ড প্রভৃতি প্রয়োজন। শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট ড্রয়ার যুক্ত টেবিল ও চেয়ার যেন 'Revolving' বা আবর্তনশীল হয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক হালকা ধরনের চেয়ার টেবিল থাকবে।

(iii) এছাড়া ইতিহাস কক্ষে প্রয়োজনীয় আলমারিতে থাকবে শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য Reference Book, পত্রপত্রিকা, ঐতিহাসিক গল্প, উপন্যাস, মুদ্রা, ছবি। আবার মানচিত্র, চার্ট প্রভৃতি রাখার জন্য Map stand থাকবে।

(iv) এপিডায়াস্কোপ, film strip, projecter মেশিন রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

(v) ইতিহাস কক্ষটি প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, সভাগৃহ, প্রভৃতির মতো সুসজ্জিত থাকে যার ফলে ইতিহাস কক্ষটিতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেন সেখানে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মৃত অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

তবে সবশেষে একথা বলতে পারি– ইতিহাস কক্ষ গড়ে তোলা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য, শ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং ইতিহাসের জন্য পৃথক ঘর তৈরি করা ক্ষেত্রে শিক্ষকের অগ্রণী ভূমিকা বেশি থাকলেও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ঐতিহাসিক **Ghate** বলেছেন, "A well equipped History Room will help to foster a historical attitude of mind among the students."

(ঘ) শিখন সম্পদরূপে ইতিহাস গ্রন্থাগার (History Library) :

E.A. Pires (পায়ার্স) বলেছেন যে, "গ্রন্থাগার হল কোনো সার্থক বিদ্যায়তনের জ্ঞানদীপ্ত স্নায়ুকেন্দ্র এবং শিক্ষাভিত্তিক জীবনধারার প্রাণশক্তি। অসংখ্য পুঁথি, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা নিয়ে গড়া জ্ঞানভাণ্ডারটির নাম হল গ্রন্থাগার। মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মিলনসেতু হল এই গ্রন্থাগার। এটি জ্ঞানপিপাসু মানুষদের তীর্থক্ষেত্র এবং জ্ঞান অর্জনের একটি মূলকেন্দ্র। তাই আজ একথা সর্বজন সম্মত যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার থাকলেও প্রতিটি বিদ্যালয়ে ইতিহাস কক্ষে একটি পৃথক গ্রন্থাগার থাকা অপরিহার্য। এই গ্রন্থাগারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুস্তক থাকবে। শিক্ষকদের জন্য ইতিহাস গ্রন্থ ছাড়াও থাকবে সমধর্মী ইতিহাস পুস্তক (Collateral Reading Book), খ্যাতনামা লেখকদের বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তক, শিক্ষাদান সংক্রান্ত পুস্তক, প্রসিদ্ধ লেখকদের আত্মজীবনী ও জীবনীগ্রন্থ। আর শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে ইতিহাসের পাঠোপযোগী একাধিক লেখকের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক, জীবনী, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, ঐতিহাসিক নাটক, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক গল্প ও কাহিনি, যুগবৈষম্য অনুসারে বিশেষ বিশেষ পুস্তক, ঐতিহাসিক ছবির বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, বিভিন্ন Source Book এবং বিভিন্ন Reference Book, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূগোল, পৌরনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্য ইত্যাদি অন্যান্য পুস্তকও থাকবে।

ইতিহাস কক্ষেই ইতিহাস গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই গ্রন্থাগার নানাভাবে ইতিহাস শিখনে সহায়তা করে—

(i) **আত্মশিখন :** প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী গ্রন্থাগারে ব্যক্তিগতভাবে তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ইতিহাস পাঠের সুযোগ পায়। এই ধরনের পাঠের মাধ্যমে তার জ্ঞানের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। তার ফলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বস্তুত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মশিখনের পথ প্রশস্ত হয়।

(ii) **জ্ঞানের পরিতৃপ্তি :** এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তার জ্ঞানমূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে। এছাড়া তার জানার কৌতূহলকে আরও প্রজ্বলিত করে।

(iii) **পাঠাভ্যাস গঠন :** ইতিহাস যেহেতু শোনা কথা ও গল্প কথা কাহিনি। তাই পাঠাভ্যাসের অভাবে ইতিহাস অন্যান্য বিষয় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু ইতিহাস কক্ষে পৃথক গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস সহজে গড়ে তোলা যায়। তাছাড়া কীভাবে গ্রন্থাগারে বই ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করা যায়।

(iv) **অবসর যাপন :** অবসর সময়ে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস কক্ষটিকে পাঠাগার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

(v) **শৃঙ্খলাবোধ :** পরোক্ষভাবে এই গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের এখানে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস গঠন হয়। পরবর্তীকালে এই অভ্যাস তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উন্নত করে।

(vi) **সহপাঠক্রমিক কাজের সহায়ক :** বিদ্যালয়ে সহ পাঠক্রমিক কাজের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজ, যেমন— ইতিহাস চর্চা, বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা ইত্যাদি হয়। এক্ষেত্রে ইতিহাসের গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ঘটায়।

সুতরাং আমাদের দেশে শ্রেণিগ্রন্থাগার বা পৃথক ইতিহাস গ্রন্থাগার স্থাপন করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বর্তমানে ইতিহাসের শিক্ষককে বিদ্যালয়ে অন্যান্য গ্রন্থাগারের মতো ইতিহাস গ্রন্থাগার স্থাপন করার উদ্যোগ নিতে হবে। যাইহোক সরকার, জনসাধারণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথক ইতিহাস গ্রন্থাগার স্থাপন করা সম্ভব হবে।

(ঙ) শিখন সম্পদরূপে জাদুঘর (Museum as a learning Resource) :

মিউজিয়াম বা জাদুঘর হল ইতিহাস শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণভাবে জাদুঘর (Museum) বলতে ঐতিহাসিক বা প্রত্নসামগ্রীর সংগ্রহশালাকে বোঝায়। বাংলা জাদুঘর শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Museum। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির 'আকাডেমি' বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান অনুসারে, যে ঘরে নানা অতি আশ্চর্য্য জিনিস বা প্রাচীন জিনিস সংরক্ষিত থাকে তাই হল জাদুঘর (Museum)। International Council of Museum (ICOM) এর মতে, 'জাদুঘর' বা সংগ্রহশালা হল একটি অলাভজনক, জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত এবং স্থানীয় সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষালাভ, জ্ঞানচর্চা ও আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে মানব ঐতিহ্যের স্পর্শ-যোগ্য ও স্পর্শ-অযোগ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে, সংরক্ষণ করে, প্রদর্শন করে এবং সেগুলি নিয়ে গবেষণা করে।

International Council of Museum (ICOM) এর মতে, পৃথিবীর ২০২ টি দেশে ৫৫ হাজারেরও বেশি জাদুঘর রয়েছে। জাদুঘরকে নানাভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্নতাত্ত্বিক

Scanned with CamScanner

জাদুঘর, ঐতিহাসিক গৃহ জাদুঘর, জীবন্ত যাদুঘর, শিল্প জাদুঘর, বিশ্বকোষ জাদুঘর, সম্পদ জাদুঘর, সামরিক যাদুঘর, প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর, চলমান জাদুঘর, স্থানীয় জাদুঘর, ব্যক্তিগত জাদুঘর, বিশেষ জাদুঘর, নেট জাদুঘর ইত্যাদি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক যুগের বাস্তব নিদর্শন, ভাস্কর্যের চিহ্ন, স্থাপত্য শিল্পের নমুনা এবং শিল্প সৌন্দর্য্যের নিদর্শন, পাতা, কাঠ, মাটি, তাল কিম্বা পাথরে খোদাই করা লিপি স্তম্ভ, সিংহদ্বার, প্রাচীরের ক্ষুদ্র সংস্করণ, অস্ত্রশস্ত্র এবং উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত অলংকার, পোষাক পরিচ্ছদ, যানবাহন, ধাতব কিম্বা অন্য ধরনের শিল্পকর্ম, নানা ধরনের মুদ্রা, আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জা, নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র, পুঁথিপত্র, দানপত্র, হুকুমনামা, ব্যক্তিগত দলিল, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, লিখবার সামগ্রী, বিভিন্ন ঐতিহাসিক বস্তুর মডেল, বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র, সংরক্ষিত খাদ্য ও পানীয় বস্তু এবং খাদ্যাধার কিম্বা পানপাত্র প্রভৃতি।

★ মিউজিয়াম বা জাদুঘরের শিক্ষামূলক উপযোগীতা :

মিউজিয়াম বা জাদুঘরের শিক্ষামূলক তাৎপর্য অপরিসীম। জাদুঘর বা সংগ্রহশালা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার শিক্ষা ও সাধনার পীঠস্থান। দেশ, প্রদেশ, অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয় এই জাদুঘরে। জাদুঘর হল জ্ঞান ও ঐতিহ্যের ভাণ্ডার। এটা জনগণের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে। নীচে যাদুঘরের শিক্ষামূলক তাৎপর্য আলোচনা করা হল–

(1) জাদুঘর দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন দুর্লভ ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ খুঁজে বের করে ও সংগ্রহ করে। সংগৃহিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংরক্ষণ করে। এই সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি ইতিহাস রচনা কিম্বা ইতিহাস চর্চার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(2) বিবর্তনের ধারায় মানবসমাজ ও সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটেছে তার বিভিন্ন প্রমাণ ও স্মৃতিচিহ্ন জাদুঘরের উপাদানগুলিতে পাওয়া যায়। জাদুঘর সেইসব দুর্লভ ঐতিহাসিক বস্তুসামগ্রী সাধারণদর্শক, পাঠক, গবেষক প্রভৃতি সব ধরনের মানুষের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দেয়। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ জ্ঞানলাভের পাশাপাশি আনন্দ লাভ করে।

(3) জাদুঘরের একটি অন্যতম কাজ হল গবেষণা সংক্রান্ত কাজ। জাদুঘরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত থাকে। এই সমস্ত নিদর্শন ইতিহাস চর্চা বা ইতিহাসের গবেষণার নির্ভরযোগ্য উৎস। তাই জাদুঘর গবেষণার কাছে ভীষণভাবে সহায়তা করে। এছাড়া জাদুঘর স্কলারশিপ বা বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার কাজে উৎসাহিত করে।

(4) প্রকাশনা (Publication) জাদুঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জাদুঘর গবেষণা লব্ধ তথ্যসমূহকে একত্রিত করে পত্রিকা শিক্ষা পুস্তকারে প্রকাশ করে থাকে।

(5) জাদুঘরের একটি অন্যতম কাজ হল জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তারা স্বাধীনতা দিবস, বিশ্বমানব অধিকার দিবস, হিরোসিমা দিবস, চিত্র প্রদর্শনী, বইমেলা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

(6) মানুষের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে জাদুঘরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাদুঘরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ থাকে। এগুলি শিশুদের বিস্ময় ও কৌতুহলের আকর। শিক্ষাবিদ্, গবেষক কিম্বা যে-কোনো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের জ্ঞানের চাহিদা পরিতৃপ্ত করে জাদুঘর। জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের অপূর্ণতা দূরীভূত হয় ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী হয়।

(7) জাদুঘর ইতিহাসকে জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলে। ইতিহাসের কারবার বিমূর্ত অতীতকে নিয়ে যাকে ধরা বা ছোঁওয়া যায় না। এই অতীতকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তোলা কঠিন কাজ। এটি করা সম্ভব অতীতের কোনো বাস্তব নির্দশন শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের দ্বারা। "The most effective appeal to the sense of reality of course, through reality itself। আর এক্ষেত্রে জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(8) জাদুঘরগুলি বিভিন্ন প্রাচীন ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রতিকৃতি বা মডেল (Replica) তৈরি করে। মূলত দুটি উদ্দেশ্যে এগুলি তৈরি করা হত। প্রথমত : যে ঐতিহাসিক নিদর্শন জাদুঘরের সংগ্রহে নেই, সেই নিদর্শন সম্পর্কে দর্শকদের একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিদর্শনের মডেল তৈরি করা হয়। দ্বিতীয়ত ঃ জাদুঘরে এমন কিছু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য জিনিস থাকতে পারে যেগুলি নিরাপত্তা বা অন্য কোনো কারণে সাধারণ দর্শকদের প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এমন নিদর্শনগুলির প্রতিকৃতি (Model) তৈরি করে দর্শকদের কৌতুহল মেটানোর চেষ্টা করা হয়।

✪ ৩.২ সমাজ বিজ্ঞানের (ইতিহাস) ভালো পাঠ্যবই-এর গুণাবলি (Quality of good social science text book) :

ebook.dascoaching.in

❑ ৩.২.১ ভূমিকা (Introduction) :

ছাপানো কাগজে পরপর সাজিয়ে একত্রে বেঁধে সংরক্ষিত করা বস্তুই হল বই। প্রাচীনকালে পোড়ানো মাটির ফলক পরপর সাজিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে যে লেখা হত তাকেও বলা হত বই। বই-এর অন্যান্য বাংলা প্রতিশব্দগুলি হল গ্রন্থ, পুস্তক প্রভৃতি। 'গ্রন্থ' শব্দটি হল সংস্কৃত শব্দ। শব্দটি এসেছে 'গ্রন্থন' থেকে যার অর্থ একসাথে গ্রন্থিত। 'পুস্তক' শব্দটি এসেছে পারসিক 'পুস্ত' থেকে যার অর্থ চামড়া দিয়ে বাঁধা সমষ্টি। আবার 'বই' শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'বহি' থেকে!

Scanned with CamScanner

'The World Book Dictionary'-তে গ্রন্থের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : "Written as printed sheets of paper bound together between covers." অর্থাৎ গ্রন্থ হল দুটি কভারের মধ্যে একত্রে কিছু কাগজের লিখিত বা মুদ্রিত সিট যা বাঁধাই করা হয়।

UNESCO গ্রন্থের সংজ্ঞায় বলেছে "a non-periodical printed publication of at least 49 pages excluding covers" অর্থাৎ কভার ছাড়াই কমপক্ষে ৪৯ পৃষ্ঠার প্রকাশন যা সাময়িকী নয়, তা-ই হল গ্রন্থ।

সাধারণভাবে আমরা দুই পাশে দুই মলাটের মধ্যে মুদ্রিত বা অমুদ্রিত সামগ্রীকেই গ্রন্থ বা বই বলি। কত পৃষ্ঠার সমষ্টি হলে সেটি গ্রন্থের মর্যাদা পাবে তার হিসেবে একেক দেশে একেক রকম।

মানুষ তার চিন্তাধারা ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বই-কে ব্যবহার করে। মানুষের মনের ভাব, তার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে মুদ্রিত আকারে অন্যদের নিকট উপস্থাপিত হয়ে থাকে। গ্রন্থ হল সভ্যতা সংস্কৃতি ও যোগাযোগের অন্যতম বাহন। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনে গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুদূর প্রাচীনকালে মাটিরফলক, প্যাপিরাস রোল, পাথর, পার্চমেন্ট, কাঠের ফলক, তালপাতা, ভূর্জপত্র, ধাতুপাত ইত্যাদি লিখন সামগ্রীর উপর গ্রন্থ লেখা হত। পরবর্তীকালে লিখন সামগ্রীর প্রভূত উন্নতি ঘটে। উদ্ভব হয় কাগজের। বস্তুত কাগজ আর ছাপাখানার আবিষ্কারের ফলে গ্রন্থপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে আরও উন্নতি সাধন হয়। বই বা গ্রন্থের বড় বিষয় হল পরপর সারিবদ্ধ ও ধারাবাহিক লেখা, যেখানে হয় পৃষ্ঠা সংখ্যা অথবা কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা থেকে এর ধারাবাহিকতা বোঝা যায়। বই-এর একটি শুরু এবং শেষ থাকে যা ক্রম অনুসারে লেখা হয়। এসব পাঠ করে তার পারম্পর্য উপলব্ধি করা যায়। বই-এর মূল্যমান ও গুণমান নির্ভর করে প্রধানত তার বিষয়বস্তুর উপর।

বই নিয়েই গড়ে ওঠে বই-এর ভাণ্ডার। বই-এর যে এই বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে তার খবর যথাস্থানে যথাসময়ে জানানো এবং সেই ভাণ্ডারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। শিশু, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সকলকে বই পড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলা এবং সেইসঙ্গে শিশুদের ভাষা উন্নয়নের জন্য বই-এর জগতের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো অত্যন্ত জরুরি বিষয়। বই পড়ার অভ্যাস মানুষের পড়ার দক্ষতাকে শুধু টিকিয়ে রাখে না বরং তাদের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করে যার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে একটি শিখন প্রবণ সমাজ গড়ে ওঠে।

❑ ৩.২.২ পাঠ্যপুস্তক (Text Book) :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বইকে আমরা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) টেক্সট বই, (২) সাহিত্যের বই। **টেক্সট বই বা পাঠ্যপুস্তক বলতে কী বোঝায়-এর উপযোগিতামূলক আলোচনা নীচে করা হল—**

সাধারণ অর্থে পড়ার উপযোগী বইকে পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। ব্যবহারিক অর্থে পাঠ্যপুস্তক হল পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম (পাঠ্যক্রম) ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য স্তর ও শ্রেণি ভিত্তিক রচিত পুস্তক। প্রথাগত, প্রথামুক্ত অথবা অন্যান্য শিক্ষার জন্যও নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে পারে। যেহেতু পুস্তক মাত্রই পাঠের জন্য। সেই অর্থে সব পুস্তকই পাঠ্য বা পাঠ্যপুস্তক বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেসব পুস্তক পরীক্ষাপাস, পদোন্নতি, পেশায় দক্ষতা অর্জন, প্রশিক্ষণ বা পাঠসহায়ক গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয় সেইগুলিই মূলত পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়, ভাষা রীতি, ও উপস্থাপন নীতি কৌশল নির্ধারিত হয়। বিষয়ের চাহিদা এবং শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পিত ভাবে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয় বলে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা এতে থেকে যায়। পাঠ্যপুস্তকে রাষ্ট্রের আদর্শ, সংবিধান, শিক্ষার আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নীতি প্রতিফলিত হয়।

পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা সব সময়েই অন্য পুস্তকের তুলনায় বেশি। দেশে যত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা বাড়তে থাকে ততই পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা ও বিক্রি বাড়তে থাকে। যেহেতু বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা, তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রবণতা বেশি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই এখনও বহুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক ভাষাগুলিতে লেখা হয়ে থাকে। এর কারণ হল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখা সম্ভব হলেও তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। বহু বিষয়ে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক রচনার বাধা হিসেবে পরিভাষা এবং দক্ষ লেখকের অভাবকে দায়ী করা হয়।

❑ ৩.২.৩ পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance of text book) :

পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance of text book) : বর্তমান এই সংকটকালে শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ শ্রেণির বিশেষ বিষয়ের যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও সুপারিশ করা হয়, দেখা যাচ্ছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে ভিত্তি করে কোনো শ্রেণিতে কী পড়ানো হবে, কী শেখানো হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে কী লিখিত আছে। পাঠ্যপুস্তকের প্রথম ও শেষ কথা হল নির্ধারিত পাঠ্যবিষয়। শিক্ষক তাঁর পাঠ পরিকল্পনা, পাঠদান, প্রকল্প গঠন ও ব্যবহারিক কর্মসম্পাদন, গৃহকাজ প্রদান সবকিছুই করেন পাঠ্যপুস্তক থেকেই। পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ প্রতিটি শব্দ, লাইন, কার্যাবলিকে প্রশ্নাতীত, যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকই শিক্ষকের শিক্ষণকার্য, শিক্ষার্থীর শিখন এবং পরীক্ষকের

Scanned with CamScanner

পরীক্ষণ কার্য সম্পাদন স্থির করে দেয়। কার্যত, শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষণ, শিখন ও পরীক্ষণ তথা মূল্যায়ন কোনো কিছুই পাঠ্যপুস্তক ছাড়া হয় না। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা পাঠ্যপুস্তকের উপর অতি পরিমাণে নির্ভরশীল বলা যায়।

যথার্থ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন একটি বড় কাজ। উন্নত গুণমানের পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষণ বা মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই উপকৃত হতে পারেন। সুতরাং এই ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান হওয়ার দরকার আছে। এই প্রসঙ্গে **L.D. Crow** এবং **Alice Crow** (1964)দের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন, "Neither the textbook nor the teacher alone constitute the best medium for education. A combination of well chosen text books and a well trained teacher is needed if young people are to be trained to meet the responsibilities." অর্থাৎ না শিক্ষক না পাঠ্যপুস্তক কারো পক্ষেই এককভাবে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গঠন করা সম্ভব নয়। সুনির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক এবং সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক মিলিত ভাবে এই কাজ করতে পারেন, যদি নবীনরা প্রশিক্ষিত হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন।

◆ **শিক্ষকের নিকট পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক উপযোগিতা** (Usefulness of textbook for the teacher) :

শিক্ষকের নিকট পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অনেকখানি। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হল—

(১) পাঠ্যক্রমভিত্তিক পাঠ্যবিষয়বস্তুর ধারণা, প্রাসঙ্গিক তথ্য, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকে প্রস্তুত থাকে। শিক্ষক পাঠপুস্তক থেকে তা সংগ্রহ করে স্বচ্ছন্দে, পাঠদান করতে পারেন।

(২) বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যের উৎস, জ্ঞান ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে পাঠ্যপুস্তক। এই সমস্ত তথ্য, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসমূহ সুসংগঠিত ভাবে বিন্যস্ত থাকে। এ ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে এগুলি যৌক্তিক ও মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে বিন্যস্ত থাকে। শিক্ষক এই পাঠ্যপুস্তককে সহজেই তার নির্দেশনায় কাজে লাগাতে পারেন।

(৩) পাঠ্যপুস্তক সাধারণত রচিত হয় অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। পাঠ্যপুস্তকে এইসব অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের প্রজ্ঞা, পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার ফসলকে পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ করেন। শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ কার্যে এগুলিকেই সহজেই কাজে লাগাতে পারেন।

(৪) শুধু পাঠ্য বিষয়বস্তুই নয়, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন পাঠপরিকল্পনা তৈরি, শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার এবং শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করতে সহযোগিতা লাভ করেন।

(৫) ব্যবহারিক ও প্রকল্পভিত্তিক কার্য সম্পাদনে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষককে সহায়তা দেয়।

(৬) পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিয়ে শিক্ষক পাঠের পুনারাবৃত্তি মূলক পর্যালোচনা করতে পারেন, প্রশ্ন-উত্তর মিথষ্ক্রিয়া সম্পাদন এবং বিভিন্ন ঘটনা ও নীতিগুলির প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। গৃহকাজ প্রদানের কাজও তিনি সম্পন্ন করেন।

(৭) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষককে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সীমানা সংক্রান্ত ধারণা দিয়ে পাঠ্যবিষয়কে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক একক ও উপএককে ভাঙতে সাহায্য করে। এতে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান সহজ হয়।

◆ **শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক উপযোগিতা** (Usefulness of text book for the students) :

পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকের কাছে যেমন উপযোগী তেমনি শিক্ষার্থীদের কাছেও সমান উপযোগী। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে সাহায্য করে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন রেখে অধ্যয়নে নিবদ্ধ রাখে। শিক্ষার্থীকে পাঠে আগ্রহী করে তোলে।

(২) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু অনুধাবনে প্রস্তুত করে তোলে। বাড়িতে শিক্ষার্থী তার নিজের চেষ্টায় অধীত পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে বোধমূলক স্তরে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি পরের দিন শ্রেণির পাঠ অথবা ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে বিষয়জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়।

(৩) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীকে সবকিছু তথ্য, ব্যাখ্যা, নীতি, দৃষ্টান্তসমূহ কিংবা রেখাচিত্র প্রভৃতি তাৎক্ষণিকভাবে লিখে রাখতে হয় না, এর ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের পাঠদানে নিজের মনোনিবেশ ঘটাতে সক্ষম হয় অনেকখানি।

(৪) শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের সময় পাঠ অনুধাবন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না, আবার অনেক সময় তা স্মৃতিতে থাকে না, সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু অনুধাবন, সংশোধন করতে সাহায্য করে।

(৫) পাঠ্যপুস্তক নিয়মিত পাঠের অভ্যাস শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি তথ্য সমৃদ্ধ, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সচেতন হতে এবং সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও নীতিগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে সহায়তা করে।

(৬) অবসর সময় যাপনের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে পাঠ্যপুস্তক।

(৭) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে স্ব-শিখনে এবং মুক্ত চিন্তনে অভ্যস্ত করে তোলে।

❑ ৩.২.৪ ভালো সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good Social Science Text book) :

মুদ্রিত শিখন সম্পদগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল পাঠ্যপুস্তক বা Text book। শিক্ষার আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের এই গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা স্বীকৃত। সুতরাং শিক্ষা

Scanned with CamScanner

ব্যাবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, শিক্ষাপ্রশাসক, শিক্ষাবিশেষজ্ঞ সকলের কাছেই উন্নত গুণমানের পাঠ্যপুস্তকের প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি। সেজন্য শিক্ষকের এই পাঠপুস্তক নির্বাচনের বিষয়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বা শর্তগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(২) পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ প্রতিফলন
(৩) শিখনের উদ্দেশ্যগুলির উপলব্ধি
(৪) বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন
(৫) ভাষা ও উপস্থাপনা রীতি
(৬) পুস্তকের আকার ও সামগ্রিক রূপ
(৭) মুদ্রণ ও বাঁধাই-এর মান
(৮) ভূমিকা ও বিষয়বস্তুর তালিকা
(৯) সংযোজন ও নির্ঘন্ট
(১০) শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার
(১১) মূল্য ও সহজলভ্যতা
(১২) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

উন্নতগুণমানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তগুলি এবার নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) **লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা** (Academic and Professional Qualification) :

(i) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য পুস্তক প্রণেতা বা লেখকের যথেষ্ট শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা থাকা দরকার।

(ii) বিষয় সম্পর্কে লেখকের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(iii) লেখকের স্বাধীন কাজকর্ম এবং লেখার ক্ষমতা থাকা দরকার এবং সেই ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।

(iv) শিক্ষক, গবেষক অথবা লেখক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি থাকা দরকার।

(২) **পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ প্রতিফলন** (Coverage of the syllabus) :

(i) যে পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পাঠপুস্তকটি রচিত হয়েছে, সেই পাঠ্যসূচিকে সম্পূর্ণ করে লেখা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার।

(ii) পাঠ্যসূচির সমস্ত দিক সঠিক বা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) **শিখনের উদ্দেশ্যগুলির উপলব্ধি** (Realization of learning objectives) :

(i) যে স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠপুস্তকটি রচিত হয়েছে সেই স্তরে পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলিকে পূরণ করার বিষয়টি উপলব্ধি করা হয়েছে কি না তা দেখতে হবে।

(ii) উদ্দেশ্যপুরণের উপলব্ধির জন্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা রীতি মেনে চলা হয়েছে কি না তা বিচার করে দেখা দরকার।

(৪) **বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন** (Selection and organization of the contents) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর অনুসারে রচিত হয়েছে কি না তা দেখা দরকার।

(ii) বিষয় পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং কৌতুহল বৃদ্ধিতে পাঠ্যপুস্তকটির সহায়তা করা ক্ষমতা থাকতে হবে অবশ্যই

(iii) শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাকৃতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং সংযোগ সাধন করার ক্ষমতা পাঠ্যপুস্তকটির আছে কি না তাও বিচার্য বিষয়।

(iv) পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত তারিখ, ঘটনা, এবং তথ্যাবলি, মানচিত্র, রেখাচিত্র, লেখচিত্র প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং সর্বাধুনিক হওয়া প্রয়োজন।

(v) পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তুর সামাজিক সংশক্তি, প্রাক্ষোভিক এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকার।

(vi) পাঠ্যপুস্তকটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(৫) **ভাষা ও উপস্থাপন রীতি** (Language and style of the presentation) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিণমন উপযোগী হতে হবে।

(ii) ভাষার অন্তর্গত বাক্যবিন্যাস ও শব্দের ব্যাকরণগত শুদ্ধতা থাকতে হবে এবং তা যথার্থ হতে হবে।

(iii) বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শিখনের নীতি ও তত্ত্ব অনুসৃত হয়েছে কি না তা বিচার করে দেখতে হবে। উপস্থাপনার রীতি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও প্রেষণা সঞ্চারকারী হতে হবে।

Scanned with CamScanner

(iv) পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এবং ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার শিক্ষার্থীদের নিকট সহজে বোধগম্য হতে হবে।

(৬) **পুস্তকের আকার ও সামগ্রিকরূপ** (Size and overall book) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির আকার ও আয়তন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী কি না তা দেখতে হবে। সামগ্রিকভাবে পাঠপুস্তকটি দেখতে আকর্ষণীয় হতে হবে।

(ii) পাঠ্যপুস্তকটির কভার পৃষ্ঠার লেখকের নাম এবং পিছনের পৃষ্ঠায় লেখক ও পুস্তক সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা দরকার।

(iii) পাঠ্যপুস্তকটির নাম (title), পাঠ্যপুস্তকটির রচনার উদ্দেশ্য ও অর্থ বহন করতে সমর্থ হবে।

(৭) **মুদ্রণ ও বাঁধাই** (Printing and binding) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির মুদ্রণ হতে হবে স্পষ্ট, ত্রুটিমুক্ত এবং সন্তোষজনক।

(ii) ছাপার অক্ষরের আকার এবং পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত অনুচ্ছেদে শিরোনাম, শিক্ষার্থীদের বয়স এবং শিক্ষার স্তর অনুযায়ী সন্তোষজনক হতে হবে।

(iii) পুস্তকটির কাগজ এবং কালির মান উন্নত হতে হবে।

(iv) পাঠ্যপুস্তকটির বঁধাই টেকসই এবং সন্তোষজনক হওয়া দরকার।

(৮) **মুখবন্ধ ও বিষয়বস্তুর তালিকা** (Preface and table of contents) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে লেখকের একটি মুখবন্ধ বা পূর্বভাষণ থাকা উচিত এবং মুখবন্ধে পুস্তকটি লেখার উদ্দেশ্য এবং তার অধ্যায়গুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকতে হবে।

(ii) বিভিন্ন অধ্যায়গুলির একটি বিন্যাস তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে পাঠকের উপলব্ধি সহজ হয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সন্নিবেশের উল্লেখ নির্ধারিত পৃষ্ঠায় থাকতে হবে।

(৯) **সংযোজন এবং নির্ঘণ্ট** (Appendix and index) :

(i) পুস্তকটিতে সন্তোষজনক সংযোজন এবং নির্ঘণ্ট থাকা দরকার।

(১০) **শিক্ষণ-প্রদীপনের ব্যবহার** (Use of teaching aids) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির অধ্যায়-এর প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত চিত্র, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চার্ট, সারণি ইত্যাদি থাকা দরকার এবং সেগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হতে হবে।

(ii) সন্নিবেশিত চিত্র, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চার্ট বা সারণি ইত্যাদিগুলি বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক কি না তা দেখতে হবে।

(১১) **মূল্য ও সহজলভ্যতা** (Price And availability) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির মূল্য শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যভিত্তিক হওয়া দরকার।

(ii) পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও লাইব্রেরির নিকট সহজলভ্য হতে হবে।

(১২) **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য** (Other features) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিটি অধ্যায়-এর শেষে অনুশীলনীতে বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশ্ন সন্নিবেশিত থাকা দরকার। প্রশ্নগুলি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া অবশ্যই দরকার।

(ii) প্রদত্ত প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ও প্রয়োগধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iii) প্রতিটি অধ্যায়-এর শেষে সারসংক্ষেপ থাকলে ভালো হয়।

(iv) পাঠ্যপুস্তকটির শেষে একটি গ্রন্থপরিচয় তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জি থাকা দরকার।

(v) পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থাটির খ্যাতি ও পরিচিতি থাকা দরকার।

❑ ৩.২.৫ ভালো ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good History Text book) :

সাম্প্রতিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য কিনা, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন প্রায়শই উচ্চারিত হতে শোনা যায়। ফ্রয়েবল, ডিউই, গান্ধী শিক্ষাবিদগণের চিন্তাধারা প্রকৃতপক্ষে এধরনের প্রশ্ন-উত্থাপনে ইন্ধন যুগিয়েছে। চলমান শতকের প্রথমার্ধে এই প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণও হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক বর্জনের পক্ষে তেমন শক্তিশালী মতবাদ গড়ে ওঠেনি। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদও এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছে, "A modern educational system without text books is as difficult to imagine as Hamlet without the Prince of Denmark."

ইতিহাসের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক তো খুবই জরুরি। অধ্যাপক হান্ট বলেছেন, "In school-work in history, the text book remains after the teachier, the learner's chief aid and support."

কিন্তু ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন খুব সহজ বিষয় নয়। এর জন্য কতগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি মেনে চলতে হয়।

- **প্রথমত :** পাঠ্যপুস্তক যেহেতু মূলতঃ রচিত হবে শিক্ষার্থীদের জন্য, সেই হেতু তাদের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পুস্তক রচিত হওয়া উচিত। তাই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকালে প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা।
- **দ্বিতীয়ত :** পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপক হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেন ইতিহাসের কার্যকারণ সূত্রটি অনুধাবন করতে পারে,

Scanned with CamScanner

ইতিহাসের চলমানতার মূল সুরটিকে অনুভব করতে পারে। এই অনুধাবন ও অনুভব শিক্ষার্থীর ভেতর জাগ্রত করে জ্ঞানতৃষ্ণা, আর সেই জ্ঞানতৃষ্ণাই তাকে ক্রমশঃ সত্যানুসন্ধানী করে তুলবে।

- **তৃতীয়ত :** পাঠ্যপুস্তককে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে বিবিধ মানচিত্র, চার্ট, সময়রেখা, বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রাবলি দিয়ে পাঠ্যপুস্তককে সুসজ্জিত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরের চমকেই শিক্ষার্থী প্রথম আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া, এইসব চিত্রাবলি ইতিহাসকে বহুলাংশে জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করে।
- **চতুর্থত :** পাঠ্যপুস্তক কখনোই অন্ধ মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে না। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক পরিণত হয় প্রচারধর্মী পুস্তিকায়। এ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা রক্ষা করে চলতে হবে।
- **পঞ্চমত :** পাঠ্যপুস্তকের রচনাশৈলী যেন শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার সহায়ক হয়। ইতিহাস হলেও বিষয়বস্তু বর্ণনার সাবলীলতা পাঠ্য বিষয়কে অনেক প্রাণবন্ত করে তোলে। কেননা, "History is more than a literature."
- **ষষ্ঠত :** চলমানতাই ইতিহাস, তাই ইতিহাসে গবেষণাও নিরবচ্ছিন্ন। তাই আবিষ্কৃত হয় নিত্যনতুন তথ্য। এইসব নবাবিষ্কৃত তথ্যের স্থান যেন পাঠ্যপুস্তকে থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- **সপ্তমত :** পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনী সমধর্মী পুস্তকের তালিকা, উচ্চমানের বইয়ের তালিকা, সুবিন্যস্ত সূচিপত্র প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকতে হবে।
- **অষ্টমত :** ইতিহাসের বিস্তৃত তথ্যের পরিবেশনায় পাঠ্যপুস্তক যেন "Condensed summary of too may facts"-এ পরিণত না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। যথাসম্ভব বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট এবং মূর্তভাবে প্রকাশ করতে হবে।
  ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে হ্যাসলাক মন্তব্য করেছেন, "In the youngest forms, text book should be one that is filled with charts, descriptive and brightly coloured details. The same applies to the text book for the middle forms of secondary schools."
- **নবমত :** পাঠ্য বই-এর বৈষম্যমূলক কোনো ভাষা, কোনা উদাহরণ থাকবে না। নারী জাতির পক্ষে অবমাননাকর কোনো বিষয় থাকবে না।
- **দশমত :** পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু অবশ্যই বিভক্ত সম্মত অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে।
- **একাদশ :** কোনো জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের প্রতি যেন নেতিবাচক ও বিতর্কিত তথ্য পাঠ্য বই এর মাধ্যমে পরিবেশিত না হয়।

৩.৩ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Teaching aids in Social Science) :

◆ **ভূমিকা :** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণকার্যকে যথার্থভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে অবশ্যই শিক্ষকের বক্তৃতাদান বা ব্যাখ্যাদান করতেই হয়। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষক যদি ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে এমন কিছু উপকরণ বা সামগ্রী ব্যবহার করেন যাতে শিক্ষার্থীদের পাঠ বোঝার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়, তবে সেটাই শিক্ষকের করা দরকার। এই সামগ্রীগুলিকে বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপন বা উপকরণ। অর্থাৎ শিখন শেখানো কার্যক্রমে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক যে সমস্ত উপকরণ বা সামগ্রী ব্যবহার করেন সেগুলিই হল শিক্ষণ প্রদীপন বা উপকরণ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই সমস্ত শিক্ষামূলক উপকরণগুলির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে **কোঠারি কমিশনের** (১৯৬৪-৬৬) বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে----"The supply of teaching aids to every school is essential for the improvement of the quality of teaching. It would indeed bring about an educational revolution in the country."

বস্তুত, আজকের এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাতেই নয়, বহু বছর পূর্বে **গ্রিক** এবং রোমানরা যাদের চিন্তাভাবনা ও তথ্যকে কথার মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে, প্রতীকের মাধ্যমে পৌঁছে দিতেন ব্যক্তিদের নিকট। **রুশো** শিক্ষাক্ষেত্রে বহু শব্দ ব্যবহারের দ্বারা অনুৎসাহিত করতেন। তিনি মনে করতেন যে, শিশুর দেহ ও মনের প্রকৃতি হল চারপাশের বস্তুজগৎ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন। **ফ্রয়বেলও** মনে করতেন শিশুর পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু সামগ্রী থেকে শিক্ষালাভ করা উচিত। মন্তেসরির বক্তব্যতে সেই কথাই ধ্বনিত হয় যে, শিশু হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিখবে।

সুতরাং বহু বছর আগে থেকে আজ এই আধুনিককাল পর্যন্ত শিক্ষণ প্রদীপন বা উপকরণগুলির উপযোগিতার কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা পদ্ধতি ও মনস্তত্ত্ব সব কিছুর বিচারে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। **Rulon, Charters** প্রমুখ শিক্ষাবিজ্ঞানীদের গবেষণাও এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

❑ ৩.৩.১ শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণের ধারণা (Concept of Teaching Aids and Appliances) :

শিক্ষণকার্যকে যথার্থভাবে কার্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী ব্যবহার করেন। এই সামগ্রীগুলিকে বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণ। কিন্তু শিক্ষণ প্রদীপন এবং শিক্ষামূলক উপকরণ একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। শিক্ষামূলক উপকরণ হল শিক্ষণকার্যে সহায়ক এমন কতকগুলি সামগ্রী যেগুলি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য। অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

বলা যেতে পারে যে, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য অপরিহার্য সামগ্রী হল শিক্ষণমূলক উপকরণ, যেমন—পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক, ডাস্টার বা ঝাড়ন, স্কেল ইত্যাদি। এগুলি শিক্ষকের পাঠদানের ক্ষেত্রে জরুরি সামগ্রী বা আবশ্যিক সামগ্রী। কিন্তু অন্য দিকে শিক্ষণ প্রদীপন হল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বা শিক্ষার্থীর শিখনের গুণগত মান বৃদ্ধি করে এমন কিছু শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী। শিক্ষণ প্রদীপন শিক্ষকের নিকট অপরিহার্য বা আবশ্যিক নয়। এই সামগ্রীটি হলে ভালো হয়, কিন্তু না হলেও চলে। কিন্তু শিক্ষামূলক উপকরণ অবশ্যই শিক্ষকের প্রয়োজন। ভূগোলের পাঠ বোঝাবার জন্য শিক্ষকের চক, ডাস্টার, বোর্ড লাগেই, কিন্তু গ্লোব, মানচিত্র হলে ভালো কিন্তু না হলেও চলে। এই গ্লোব, মানচিত্র ইত্যাদিগুলি হল শিক্ষণ প্রদীপন।

যাইহোক শ্রেণি শিক্ষণকে কার্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষামূলক প্রদীপন এবং শিক্ষামূলক উপকরণ উভয়রই প্রয়োজন আছে। এদের পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তিতেই পাঠদানের কার্য সার্থকতা লাভ করতে পারে।

শিক্ষামূলক সামগ্রী

শিক্ষামূলক উপকরণ :	শিক্ষণ প্রদীপন :
ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ঝাড়ন, পাঠ্যপুস্তক নির্দেশক দণ্ড (Pointer) ফ্ল্যানেল বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড	রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোন, হেডফোন, চার্ট, মডেল, স্লাইড, গ্লোব, মানচিত্র, রেখাচিত্র, বাস্তব নমুনাবস্তু প্রাকৃতিক নমুনাবস্তু, ছবি, নকশা, পোস্টার, স্থিরচিত্র, সবাকচিত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, তথ্যচিত্র, অভিনয়, সংগীত, আবৃত্তি, মুকাভিনয়, কথোপকথন, শিক্ষণ মেশিন, মাইক্রোফিল্ম, কম্পিউটার, ভিডিয়ো টেপ, অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স, ডিজিট্যাল মুভিস, প্রোজেকটর, OHP, এপিডায়াস্কোপ ইত্যাদি।

❑ ৩.৩.২ শিক্ষণ প্রদীপনের সংজ্ঞা (Definitions of Teaching Aids) :

বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষণ-প্রদীপনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

(i) **Burton** শিক্ষণ প্রদীপন-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে : "those sensory objects or images which initiate or stimulate and reinforce learning". অর্থাৎ সেইসমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু অথবা প্রতিচ্ছবি যেগুলি শিখনকে উদ্দীপিত এবং উৎসাহিত করে।

(ii) **Cater. V. Good** বলেছেন যে: "those aids which help in completing the triangular process of learning i. e., motivation, classification and stimulation as audiovisual aids." অর্থাৎ সেই সমস্ত প্রদীপন যেগুলি শিখনের ত্রিমুখী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করে, যেমন—প্রেষণা, শ্রেণিবিন্যাস এবং উদ্দীপনা সঞ্চার, সেগুলিকে বলা হয় শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন।

(iii) **Kinder. S. James** বলেছেন যে: "audiovisual aids are those devices which make learning experiences more concrete, more realistic and more dynamic." অর্থাৎ শ্রবণদৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন হল সেই সমস্ত উপকরণ যেগুলি শিখনের অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি মূর্ত, বাস্তবধর্মী এবং গতিশীল করে তোলে।

❑ ৩.৩.৩ শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা (Utility of Teaching Aids) :

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও একটি শিক্ষণমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা বা গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে সফল করার জন্য আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই শিক্ষণ প্রদীপনকে ব্যবহার করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে **ভারতীয় শিক্ষাকমিশন** বা **কোঠারি কমিশন** (১৯৬৪-৬৬) এই শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে মন্তব্য করেছেন।

শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতার প্রধান দিকগুলি হল :

(i) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগের সঞ্চার ঘটানো,
(ii) জটিল পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে সহজ করে তোলা,
(iii) বিমূর্ত ধারণাকে সহজবোধ্যভাবে মূর্ত করে তোলা,
(iv) বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা,
(v) পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান, বোধ ও প্ররোগের বিকাশসাধন,
(vi) কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি ঘটানো,

Scanned with CamScanner

(vii) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অনুবন্ধ ঘটানো,

(viii) বাচনভঙ্গি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো,

(ix) জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার সূচনা।

উপযোগিতার বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

(i) **শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগের সঞ্চার ঘটানো :** শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কালে শিক্ষকের নিকট দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ। মৌখিকভাবে শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বর্ণনাদান, বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যবহার গ্রহণ করলেও সর্বাংশে সফল হয় না। শ্রেণিকক্ষে কিছু শিক্ষার্থী অন্তত এই আগ্রহ ও মনোযোগ তেমনভাবে দেয় না। সেক্ষেত্রে শিক্ষক যদি তার পাঠদানের বর্ণনার সময় শিক্ষামূলক কিছু প্রদীপন ব্যবহার করেন তাহলে সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ যেমন আকৃষ্ট হয় তেমনই তাদের আগ্রহের সঞ্চার হয়। তাদের প্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

(ii) **জটিল পাঠ্যবিষয়বস্তুকে সহজ করে তোলা :** শিক্ষকের কাজ বা দায়িত্ব হল যে-কোনো ধরনের পাঠ্য-বিষয়বস্তু তা সে জটিলই হোক আর সরলই হোক শিক্ষার্থীর নিকট স্বচ্ছন্দে পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্য করে তোলা। মৌখিক ব্যাখ্যার সময় শুধুমাত্র ভাষার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয় না। কিন্তু শিক্ষণ প্রদীপনের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সাধন হয়। যেমন মানুষের শিক্ষায় অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভূমিকা জটিল বিষয় হলেও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চিত্র ও রেখাচিত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করে তোলা সম্ভব। নদীর গতিপথকে বোঝাতে চিত্র বা তথ্যচিত্রকে ব্যবহার করা যায়।

(iii) **বিমূর্ত ধারণাকে সহজবোধ্যভাবে মূর্ত করে তোলা :** শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত এমন বহু বিষয়বস্তু আছে যেগুলি প্রকৃতিতে বিমূর্ত ধরনের, এই বিমূর্ত ধারণাগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট সার্থকভাবে তাদের উপলব্ধিতে আনা অনেক সময়েই বেশ কষ্টকর হয় শিক্ষকের পক্ষে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিমূর্ত ধারণাটিকে অবলম্বন করে পরিকল্পিত চার্ট, তথ্যচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে মূর্ত করে তোলা যায়। শিক্ষার্থীর ভাবনার জগতে প্রবেশ করা যায়। বিমূর্ত ধারণাটিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী তখন সহজেই বিমূর্ত ধারণা গঠনে সক্ষম হয়। যেমন, জাতীয় বিকাশ বোঝাতে গিয়ে কিংবা সংস্কৃতির ধারণা দিতে গিয়ে পূর্বে উল্লিখিত প্রদীপন যেমন চার্ট, তথ্যচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষক সার্থকতা পেতে পারেন।

(iv) **বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা :** আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি। এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এক এক ধরনের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে, যেমন—চোখ দর্শনমূলক অভিজ্ঞতা অর্জন, কান শব্দমূলক অভিজ্ঞতা, নাক ঘ্রাণমূলক অভিজ্ঞতা, জিহ্বা স্বাদমূলক এবং ত্বক স্পর্শমূলক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞান শিক্ষার্থীরা অর্জন

করে, সেগুলি যদি সম্পূর্ণতা পেতে চায় তবে বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় দরকার। শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রদীপন ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞানের এই সমন্বয় সাধনের কাজটি সহজে সম্পন্ন করতে পারেন শিক্ষক। যেমন পার্বত্য প্রবাহে নদীর গতিপথের বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্র বা তথ্য চিত্রের মাধ্যমে সহজবোধ্য করা যায় সমন্বয়ের দ্বারা।

(v) **পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগের বিকাশসাধন :** শিক্ষার্থী প্রাথমিকভাবে যে জ্ঞান লাভ করে তা শুধুই জ্ঞানের স্তরে থাকে, কিন্তু যখন তা শিক্ষার্থীর উপলব্ধির স্তরে এসে পৌঁছোয় তখন তা বোধের উন্মেষ ঘটায়, আবার বোধের প্রকৃত উন্মেষ ঘটলেই শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। এই যে জ্ঞান অর্জন থেকে বোধের উন্মেষ এবং বোধের উন্মেষ থেকে প্রয়োগ করা ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, এদের প্রতিটি স্তরে শিক্ষণ প্রদীপন যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(vi) **কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি ঘটানো :** শিক্ষার্থীকে কোনো বস্তুগত ধারণা দেওয়ার সময় অনেকক্ষেত্রে শিক্ষক প্রকৃত বস্তুটি শিক্ষার্থীকে দেখাবার সুযোগ পান না, তার অভাব মেটাবার জন্য তখন প্রকৃত বস্তুটির অনুরূপ একটি মডেল ব্যবহার করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীকে তার নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে মডেলটি প্রকৃত বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হয়। অর্থাৎ নির্জীব মডেলটিতে অনেক সময় সজীব বস্তুর কল্পনা শক্তি আরোপ করে শিক্ষার্থীকে চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে হয়। আবার, প্রকৃত বস্তু ও বিকল্প মডেলটির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর বিচারশক্তিও বৃদ্ধি পায়। মডেল-এর পরিবর্তে চিত্র, চার্ট প্রভৃতিরও ব্যবহার করা যায়।

(vii) **বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অনুবন্ধ ঘটানো :** আধুনিক শিক্ষায় কোনো একটি বিষয়কে (subject) একক বা বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয় না। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে না। তাই বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শিক্ষা অনেকখানি সম্পূর্ণতা পায়। যেমন, একটি মাটির বুদ্ধমূর্তি দিয়ে যেমন শিল্পকে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি তার সঙ্গে সম্পর্কিত ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলির সঙ্গে বুদ্ধমূর্তিটির সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন বিষয়-এর মধ্যে অনুবন্ধ রচিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কাঠের তৈরি পুতুল, ব্লক বা আরও অন্য কোনো বস্তু দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উপলব্ধির জগতের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়।

(viii) **বাচনভঙ্গি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো :** শিক্ষণ প্রদীপন শিক্ষার্থীর বাচনভঙ্গি বা কথা বলার ধরন, ভাষার বিকাশকেও ত্বরান্বিত করে। শিক্ষার্থীর সামনে যদি কোনো চিত্র বা মূর্তি বা কোনো প্রকৃত বস্তুর নমুনা দেখানো যায় তাহলে ওই প্রদীপনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীকে অনেক প্রশ্ন করে শিক্ষক অনেকগুলি উত্তর জানতে পারেন। শিক্ষার্থী এই সমস্ত উত্তর প্রদান

Scanned with CamScanner

করতে গিয়ে যে বাচনভঙ্গির সে আশ্রয় নেয় এবং যে ভাষায় তাকে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিতে হয়, তাতে শিক্ষক অনায়াসে তার ওই বৈশিষ্ট্য দুটি চিহ্নিত করতে পারেন। এইভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর ভাষাগত বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া যায়।

(ix) **জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার সূচনা :** শিক্ষণ প্রদীপনগুলির সাহায্যে পাঠদান পর্যায়ের দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে মনকে অনেক বেশি যুক্তি নির্ভর করে তোলেন। পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর না করে বস্তুকেন্দ্রিক এবং বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষার্থী পাঠের বিষয়-বস্তুকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, ফলে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তির মুক্তি ঘটে। এই শিক্ষাগ্রহণে তার যেমন আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ে তেমনই শিক্ষাকে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করে, শিক্ষকের মৌখিক ব্যাখ্যাদানের উপর নির্ভর করে না। শিক্ষার্থীদের নিজেদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি দিয়ে জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগের বিকাশ সাধন ঘটায়। বাস্তব জীবনে তাদের শিক্ষার যোগসূত্র রচিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষণ প্রদীপন জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার সূচনা করে।

❑ ৩.৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি (Essential Qualities of Teaching Aids) :

শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত শিক্ষণ প্রদীপনের কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় গুণ থাকা দরকার। **শিক্ষণ প্রদীপনের সেই গুণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—**

(i) **নির্ভুলতা** (Accuracy) : শিক্ষণ প্রদীপনের কখনো অনুপযুক্ত চিত্র বা ধারণাকে উপস্থাপন করা উচিত নয়। একটি চার্টে বা মানচিত্রে যদি স্কেল না দেওয়া থাকে তাহলে ওই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র বা মানচিত্রটির আপেক্ষিক আকার শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা দিতে পারে। সেটি কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়।

(ii) **প্রাসঙ্গিকতা** (Relevancy) : ব্যবহৃত প্রদীপনগুলিকে অবশ্যই topic বা বিষয়বস্তু বা ধারণাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রাসঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত হতে হবে।

(iii) **বোধগম্যতা** (Comprehensibility) : শিক্ষণ প্রদীপনগুলির শিক্ষার্থীদের বোধ বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির কিংবা খুব বেশি জটিল প্রকৃতির হওয়া উচিত নয়। প্রদীপনগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয়ভাবে মূলত শিখনকে সহজ করে তুলবে।

(iv) **আগ্রহ সঞ্চারকারী** (Interesting) : শিক্ষণ প্রদীপনগুলি যত বেশি আকর্ষণীয় হবে শিক্ষার্থীদের শিখনে তত বেশি আগ্রহের সঞ্চার করতে পারবে। সুতরাং প্রদীপনগুলির আগ্রহসঞ্চারকারী ক্ষমতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

(v) **মূল্যমান** (Cost-Effective) : প্রদীপনগুলিকে সাধারণ এবং কার্যকরী হতে হবে এবং উপযুক্ত মূল্যের হতে হবে।

(vi) **সহজলভ্যতা** (Availability) : সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদীপনগুলিকে সহজলভ্য হতে হবে, যাতে বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা সহজেই সেগুলি সংগ্রহ করতে পারে।

(vii) **পরিবহন যোগ্যতা** (Transportability) : একস্থান থেকে যাতে অন্য স্থানে সহজে আনা-নেওয়া যায় তার জন্য প্রদীপনগুলির সহজ পরিবহনযোগ্যতা থাকতে হবে।

(viii) **উপযুক্ততা** (Appropriateness) : শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর বয়স, পরিণমন, অভিজ্ঞতা এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা উপযোগী হতে হবে।

❑ ৩.৩.৫ শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা (Limitation in the uses of Teaching Aids) :

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষণ প্রদীপনগুলির ব্যবহারে গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আবার জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। **কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রদীপনগুলি ব্যবহারে কিছু অসুবিধা দেখা যায়। সেগুলি হল—**

(১) **শিক্ষকের উদাসীনতা** (Apathy of teacher) : মানুষ তার নিজস্ব রক্ষণশীল প্রবণতার কারণে নতুন কোনো চিন্তাধারাকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না, পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারে না। শিক্ষকও তার ব্যতিক্রম নয়। একটি বড়ো অংশের শিক্ষক এখনও চিরাচরিত চক-ডাস্টার নিয়ে চক-টক (chalk-talk) পদ্ধতিতে শেখানোর কাজকে চালিয়ে যেতে চান, ঠিক যেভাবে তাঁরা নিজেরা শিক্ষালাভ করে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এইসমস্ত শিক্ষকরা পরিবর্তন বিরোধী এবং উদাসীন প্রকৃতির।

(২) **শিক্ষার্থীদের উদাসীনতা** (Indifference of students) : এ কথা ঠিক যে, শিক্ষণ প্রদীপনকে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা যায়। কিন্তু তা না হলে, শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বিরক্তি বা ক্লান্তিকর অবস্থাকে বৃদ্ধি করে তোলে। এতে শিক্ষণের কাজ ব্যাহত হয়।

(৩) **অর্থনৈতিক সমস্যা** (Financial problem) : শিক্ষণে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে কিনতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে এককালীন অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়। বহু বিদ্যালয়ের পক্ষে এই খরচ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকে না।

(৪) **উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব** (Absence of proper infrastructure) : আজও বহু বিদ্যালয়ে দেখা যায় তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক কাঠামোটুকু নেই। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, চেয়ার, টেবিল ও সাজসরঞ্জামের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। বহুস্থানের বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-এর সুব্যবস্থা নেই। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন (projected teaching

Scanned with CamScanner

aid) ব্যবহার করাও বেশ কঠিন। সুতরাং উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে শিক্ষণ প্রদীপনকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

(৫) **ভাষাগত বাধা** (Language barrier) : বিভিন্ন সফট্ওয়ারগুলি শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত সফট্ওয়ারগুলি, যেমন—বিভিন্ন ফিল্ম, সি.ডি. এবং অডিয়ো ক্যাসেটে প্রধানত ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ওই সমস্ত শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে ব্যবহার করা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

☐ ৩.৩.৬ শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Teaching Aids) :

শিক্ষণ প্রদীপনের চিরাচরিত শ্রেণিবিভাগ (Classification Traditional type of Teaching Aids) : আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ প্রদীপনকে আমরা ব্যবহারযোগ্য করে তুলি। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চক্ষু এবং কর্ণ। **এই চক্ষু এবং কর্ণ-এর ব্যবহারের ভিত্তিতে শিক্ষণ প্রদীপনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন :** (১) শ্রবণনির্ভর প্রদীপন, (২) দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন এবং (৩) শ্রবণ ও দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন।

(১) শিক্ষণ প্রদীপনের এই শ্রেণিবিভাগকে চিরাচরিত শ্রেণিবিভাগ বলা হয়। এই ধরনের **চিরাচরিত শিক্ষণ প্রদীপনকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি।**

☛ শ্রবণনির্ভর প্রদীপন :

১. রেডিয়ো
২. টেপরেকর্ডার
৩. লিঙ্গুফোন
৪. সি.ডি
৫. মাইক্রোফোন
৬. ডিক্টাফোন
৭. হেডফোন
৮. গ্রামোফোন

☛ দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন :

১. চকবোর্ড
২. বুলেটিন বোর্ড
৩. চার্ট
৪. চিত্র
৫. পোস্টার
৬. ফটোগ্রাফ
৭. ফ্ল্যাশকার্ড
৮. ফ্লানেলবোর্ড
৯. ফ্লিপবই
১০. অ্যালবাম/স্ক্র্যাপ বই
১১. ম্যাগনেটিক বোর্ড
১২. মানচিত্র
১৩. গ্রাফ বা লেখাচিত্র
১৪. নির্বাক চিত্র

১৫. স্লাইড
১৬. মডেল বা প্রতিরূপ
১৭. এপিডায়াস্কোপ
১৮. ম্যাজিক ল্যান্টার্ন
১৯. ওভারহেড প্রজেক্টর

☛ শ্রবণ-দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন :

১. সবাক চলচ্চিত্র
২. শব্দযুক্ত ফিল্ম স্ট্রিপ
৩. টেলিভিশন
৪. ভিডিয়ো টেপ
৫. কম্পিউটার
৬. ভি.সি.ডি
৭. ডি.ভি.ডি
৮. এল. সি. ডি.

শ্রবণনির্ভর প্রদীপন : শ্রবণ অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের প্রদীপনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করে।

দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন : দর্শন অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের প্রদীপনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করে।

শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন : শিক্ষার্থীরা যখন শ্রবণ ও দর্শন অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান অর্জন করে, তখন সেই সমস্ত প্রদীপনকে বলা হয় শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন।

(২) প্রক্ষেপণের উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ প্রদীপনকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(i) প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন বা Projected teaching aid

(ii) প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন বা Non-projected teaching aid

নিম্নে টেবিলে প্রক্ষেপণযোগ্য এবং প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপনগুলি দেখানো হল :

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন	প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন
১. নির্বাক চলচ্চিত্র। ২. ফিল্ম স্ট্রিপ। ৩. ম্যাজিক ল্যান্টার্ন বা ম্যাজিক লণ্ঠন। ৪. মাইক্রপ্রোজেকশন। ৫. স্লাইড প্রোজেকশন। ৬. ওপেক এবং ওভারহেড প্রোজেক্টর।	১. বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, যেমন—ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লানেলবোর্ড, ম্যাগনেটিকবোর্ড বা চৌম্বক বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, পেগবোর্ড ইত্যাদি। ২. প্রদর্শনযোগ্য সামগ্রী, ফটোগ্রাফ, পোস্টার, মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ বা লেখাচিত্র, রেখাচিত্র, সময় সারণি ইত্যাদি। ৩. মডেল বা প্রতিরূপ, বাস্তববস্তু বা স্পেসিমেন। ৪. বই, ইলাস্ট্রেশন।

Scanned with CamScanner

(৩) **গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায় :**

(i) স্থিতিশীল প্রদীপন (Static Aids)

(ii) গতিশীল প্রদীপন (Dynamic Aids)

(i) স্থিতিশীল প্রদীপন : শ্রেণিশিক্ষণ চলাকালীন যে সমস্ত প্রদীপনগুলি কোনোরকম সঞ্চালন করে না অর্থাৎ প্রদীপনগুলি স্থির অবস্থায় থাকে, সেই সমস্ত প্রদীপনকে বলা হয় স্থিতিশীল প্রদীপন।

(ii) গতিশীল প্রদীপন : শ্রেণি শিক্ষণ চলাকালীন যে সমস্ত প্রদীপনগুলি সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ প্রদীপনগুলি গতিশীল অবস্থায় থাকে, সেই সমস্ত প্রদীপনকে বলা হয় গতিশীল প্রদীপন।

স্থিতিশীল প্রদীপন	গতিশীল প্রদীপন
১. ফ্ল্যাশ কার্ড ২. চার্ট ৩. স্লাইড্ ৪. OHP, এপিডায়াস্কোপ ৫. মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র	১. ওয়ার্কিং মডেল ২. চলচ্চিত্র ৩. টেলিভিশন বা দূরদর্শন ৪. কম্পিউটার

.স্থিতিশীল ও গতিশীল প্রদীপনের তালিকা :

(৪) বস্তুর মাত্রার উপর নির্ভর করে শিক্ষণ-প্রদীপনকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় :

(i) দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন (Two Dimensional Aids)

(ii) ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন (Three Dimensional Aids)

(i) দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন : যে সমস্ত শিক্ষণ প্রদীপন দুটি মাত্রা বিশিষ্ট যেমন—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট অথবা দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা দৃষ্টিগ্রাহ্য, সেইসমস্ত প্রদীপনগুলিকে বলা হয় দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন।

(ii) ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন : যে সমস্ত শিক্ষণ প্রদীপনের তিনটি মাত্রাই দেখা যায় যেমন—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা; তাদের ত্রিমাত্রিক প্রদীপন বলা হয়।

দ্বি-মাত্রাবিশিষ্ট ও ত্রি-মাত্রাবিশিষ্ট প্রদীপনের তালিকা :

দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন	ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন
চার্ট, চিত্র, ফটোগ্রাফ, গ্রাফ, মানচিত্র, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড	মডেল, গ্লোব, বাস্তব বস্তু, পুতুল, স্পেসিমেন

(৫) **এন. সি. ই. আর. টি নির্ধারিত শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ**—ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সংক্ষেপে NCERT তাদের বুলেটিনে শিক্ষণ প্রদীপনকে দু-টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল—

(i) প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন (Projected Aids)
(ii) গ্রাফিক বা চিত্রণ সম্বন্ধীয় প্রদীপন (Graphic Aids)
(iii) প্রদর্শনী বোর্ডস (Display Boards)
(iv) ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন (3-Dimensional Aids)
(v) শ্রবণ-নির্ভর প্রদীপন (Audio Aids)
(vi) সক্রিয়তাধর্মী প্রদীপন (Activity Aids)

→ প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন (Non Projected Aids)

নিম্নে NCERT নির্ধারিত শ্রেণিবিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে দেখানো হল :

NCERT নির্ধারিত শ্রেণিবিভাগে তালিকা বদ্ধ প্রদীপন

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন	প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন				
	চিত্রণ সম্বন্ধীয় বা গ্রাফিক প্রদীপন	প্রদর্শণীবোর্ড ডিস্‌প্লেবোর্ড	ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন	শ্রবণ নির্ভর প্রদীপন	সক্রিয়তা ধর্মী প্রদীপন
১. ফিল্‌ম	১. কার্টুন	১. ব্ল্যাকবোর্ড	১. প্রতিরূপ বা মডেল	১. রেডিয়ো বা বেতার	১. প্রদর্শন বা ডেমনস্ট্রেশন
২. ফিল্‌ম স্ট্রিপ	২. চার্ট	২. বুলেটিন বোর্ড	২. প্রকল্পিত যন্ত্রাদির মডেল	২. টেপ-রেকর্ডার	২. নাটকীয়-ভঙ্গি বা ড্রামাটিক্‌স
৩. ওপেক প্রোজেক্টর	৩. কমিক্‌স	৩. ফ্লানেল বোর্ড	৩. বস্তু	৩. দূরদর্শন	৩. পরীক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্ট
৪. ওভারহেড প্রোজেক্টর (O.H.P)	৪. রেখাচিত্র বা ডায়াগ্রাম	৪. চৌম্বক বোর্ড বা ম্যাগনেটিক বোর্ড	৪.নমুনাবস্তু বা স্পেসিমেন	৪. ফিলম্-ট্রিপস	৪. কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (CAI)
৫. স্লাইড	৫. ফ্ল্যাশকার্ড	৫. পেগবোর্ড	৫. পুতুল		৫. পরিকল্পিত নির্দেশনা বা

Scanned with CamScanner

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন	প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন				
	চিত্রণ সম্বন্ধীয় বা গ্রাফিক প্রদীপন	প্রদর্শণীবোর্ড ডিস্প্লেবোর্ড	ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন	শ্রবণ নির্ভর প্রদীপন	সক্রিয়তা ভিত্তি প্রদীপন
	৬. লেখচিত্র বা গ্রাফ ৭. মানচিত্র ৮. ফটোগ্রাফ ৯. ছবি ১০. পোস্টার				প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশন ৬. শিক্ষণ যন্ত্র বা টিচিং মেশিন

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন এবং প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপনের পার্থক্য

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন	প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন
১. এই ধরনের প্রদীপন দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে স্ক্রিন বা পর্দার উপর প্রক্ষেপিত করে।	১. এই ধরনের প্রদীপনগুলির দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে প্রক্ষেপিত করার দরকার হয় না।
২. দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে প্রক্ষেপিত করার জন্য অন্ধকার কক্ষ, বিদ্যুৎশক্তি, স্ক্রিন বা পর্দা ইত্যাদি অতিরিক্ত বস্তুর প্রয়োজন হয়।	২. বিদ্যুৎশক্তি, স্ক্রিন বা পর্দা, অন্ধকার কক্ষ প্রভৃতি কোনো অতিরিক্ত কিছুর দরকার হয় না।
৩. এই ধরনের প্রদীপন বেশ শক্তপোক্ত এবং সহজে স্থানান্তরিত করা যায়।	৩. এই ধরনের প্রদীপন নরম ও দুর্বল প্রকৃতির। কিছু সূক্ষ্মও হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। স্থানান্তরিত করতে অসুবিধা হয়।
৪. এগুলিকে ব্যবহার করতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন হয়।	৪. এগুলি ব্যবহার করতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার দরকার হয় না। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকলেই হয়।
৫. শুধুমাত্র দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন যেগুলি দ্বি-মাত্রিক প্রকৃতির সেগুলি প্রক্ষেপিত হয়।	৫. দ্বি-মাত্রিক এবং ত্রি-মাত্রিক উভয় প্রকার শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহার করা যায়।
৬. এই প্রদীপনগুলি তুলনামূলকভাবে বেশ দামি এবং তৈরি করা খুব কঠিন। সুতরাং এই প্রদীপনগুলি ব্যবহার করা বেশ খরচ সাপেক্ষ।	৬. তুলনামূলকভাবে কম দামি বা সস্তা এবং কেনা সম্ভব। এগুলিকে নিজের হাতে তৈরি করা সম্ভব।

ebook.dascoaching.in

◆ শ্রবণনির্ভর প্রদীপন (Auditory Aids) :

শ্রবণ অনুভূতি (sense of hearing)-কে ব্যবহার করার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণের উপর নির্ভর করে যখন শিক্ষামূলক প্রদীপনকে শিক্ষণকার্যে কাজে লাগানো হয় তখন সেই ধরনের শিক্ষণমূলক প্রদীপনকে বলা হয় শ্রবণনির্ভর প্রদীপন বা Auditory Aids. **শ্রবণ নির্ভর প্রদীপনগুলির অন্তর্গত হল :** (১) বেতার (রেডিয়ো), (২) গ্রামোফোন, (৩) টেপরেকর্ডার।

(১) বেতার : বেতার যেমন জনসমাজে গণমাধ্যম, তেমনই শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে সেটি শ্রবণনির্ভর একটি উল্লেখযোগ্য প্রদীপন। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে **পিট্‌স বার্গ** শহরে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে **২ নভেম্বর** প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু হয়। ভারতে বেতার সম্প্রচার শুরু হয় **বোম্বাইতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে**। বোম্বাইতে প্রথম বেতারকেন্দ্র চালু হয় **১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি** কলকাতায় চালু করেন তাদের দ্বিতীয় কেন্দ্রটির ১৯২৭ খ্রিস্টাদের **২৬ আগস্ট**। সরকারি পরিচালনায় পরে এই কোম্পানিটির নাম হয় **ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস**। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। এর **পরেও নাম পরিবর্তন হয় এবং নাম হয় অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো** (AIR)। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২০টি ভাষায় এবং ১৪৬টি উপভাষায় দৈনিক ১৬০০ ঘণ্টা বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

বেতার বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। সামাজিক শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সর্বত্র তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রথাহীন, প্রথাগত ও প্রথামুক্ত সব ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় তার বিচরণ। বেতারের এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে **জর্জ ওয়াটসন** (George Watson) বলেন, "Radio is not an addition to education, Radio is not something to be placed on top of education, Rather, radio is education."

রেনল্ডস, আর. জি. (Renolds, R.G.) লিখেছেন, "Radio is the most significant medium for education in its broadest sense that has been introduced since the begining of the 20th century. As a supplement to class teaching, its possibilities are almost unlimited. ....."

(ক) বেতারের সাধারণ গুরুত্ব (General Importance of Radio) :

(i) **সাম্প্রতিক ঘটনার সম্প্রচার :** বেতার আমাদের সারা পৃথিবীর সাম্প্রতিক সংবাদকে এনে হাজির করে। বেতারের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি মানুষকে যেমন সাম্প্রতিক ঘটনার পরিচিতি দান করে তেমনই মানুষের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়ে সারা পৃথিবীর নানা দেশ বিদেশের ভালোমন্দ সম্পর্কে অবহিত করে বিচারবুদ্ধিকে সজাগ করে তোলে। বেতার সম্প্রচারে মন দিলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের পৌঁছে দেয় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

Scanned with CamScanner

(ii) **বাস্তব সম্মত অনুষ্ঠান সম্প্রচার :** বেতারের মাধ্যমে যে সব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়, তা অতীব বাস্তবসম্মত। মানুষের অন্তরের সঙ্গে সহজেই তা সংযোগ ঘটাতে সক্ষম। বেতারের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি শুনতে শুনতে শ্রোতার মধ্যে বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। পারিবারিক জীবন থেকে জীবনের বহু ক্ষেত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পায় বলে মানুষের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

(iii) **সমাজ সচেতনকারী অনুষ্ঠান সম্প্রচার :** বেতার-এর মাধ্যমে এমন কিছু অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয় যেগুলি ব্যক্তিকে সমাজ সচেতন হতে সহায়তা করে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য দরকারি বিষয়গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে মানুষকে উৎসাহিত করে। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে বিভিন্ন কথিকা, সমীক্ষা, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতি সম্প্রচারিত হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি অংশগ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ।

(iv) **চিত্ত বিনোদন :** বেতার চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আবার এই বিনোদনের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের বার্তাকে সাধারণ জন-জীবনের নিকট স্বচ্ছন্দে পৌঁছে দেওয়া যায়। বিভিন্ন লোক সংগীত, যাত্রাপালা, কবিগান, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনই উন্নয়ন-এর সম্পর্কে অবহিত করে।

(খ) বেতারের শিক্ষামূলক গুরুত্ব (Educational Importance of Radio) :

(i) বেতারের মাধ্যমে অনেক সময় বক্তৃতা, কথোপকথন, আলোচনা, সেমিনার প্রভৃতি সম্প্রচারিত হয়। এইসব অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অংশ নিয়ে থাকেন বিভিন্ন বিখ্যাত সব লেখক, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। শিক্ষার্থীদের নিকট উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলির যেমন শিক্ষাগত গুরুত্ব যথেষ্ট তেমনই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সেগুলি অনেকখানি মূল্যবান।

(ii) নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনার দ্বারা বেতারের সম্প্রচার শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময়ও যথেষ্ট কার্যকরী। বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়বস্তু (topic) প্রথিতযশা সব শিক্ষকদের দ্বারা যখন সম্প্রচারিত হয়, তখন তার প্রভাবে বহু শিক্ষার্থী অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত হয়। এতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

(iii) বেতারের সম্প্রচারিত বহু অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে বাস্তবজীবনের একটি সমন্বয় গড়ে তোলে। এতে শিক্ষার্থীদের নিকট যেমন বাস্তবধর্মী শিক্ষালাভের সুযোগ হয় তেমনই সুস্থ চিত্তবিনোদন তাদের আনন্দ দান করে। বেতারের মাধ্যমে তখন বাস্তবধর্মী শিক্ষাদান যথার্থভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের নিকট।

(iv) বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষার্থীরা প্রথাহীন, প্রথাগত এবং প্রথামুক্ত শিক্ষার সুযোগ পায়। প্রথাহীন শিক্ষা পাওয়া যায় বিভিন্ন আলোচনা, বক্তৃতা, কথিকা প্রভৃতি থেকে। প্রথাগত শিক্ষা পাওয়া যায়, কোনো একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকেই। বর্তমানে স্টুডিয়োতে বিখ্যাত শিক্ষকের সঙ্গে দু-তিনজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে প্রথাগত শিক্ষার কোনো বিষয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয় আলোচনা করা হয়। এইসব আলোচনা যখন শিক্ষার্থীরা শোনে তখন তাদের প্রথাগত শিক্ষার পাঠও অর্জিত হয়ে যায়। আবার এমন কিছু অনুষ্ঠান আছে যেগুলি প্রথামুক্ত শিক্ষার অঙ্গ, যেমন কম্পিউটারের ওপর কোনো আলোচনা শিক্ষার্থীর কম্পিউটারের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে তোলে।

(v) আধুনিক চাহিদা নির্ভর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রেও বেতারের সম্প্রচার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জগতে যে সব নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, প্রথামুক্ত শিক্ষায় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি শিক্ষার্থীদের সামাজিক চাহিদা নির্ভর কিছু কিছু প্রশিক্ষণও প্রথামুক্ত শিক্ষায় দেওয়া হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে বেতার সম্প্রচারের দ্বারা সম্ভব হয়।

(vi) একথা ঠিক যে ভালো পাঠ্যবই, সুপরিকল্পিত নির্দেশনা প্রোগ্রাম, উপযুক্ত নির্দেশনামূলক যন্ত্র ও উপকরণের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি দক্ষ শিক্ষকের অভাব আজকের দিনে আছে। অথচ শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্দেশনার কোর্স ক্রমশ বিস্তারলাভ করেই চলেছে। এই অবস্থায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের ক্ষমতা ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করতে পারে বেতার সম্প্রচারের মতো আধুনিক ব্যবস্থাই।

(গ) শ্রেণিকক্ষে বেতার সম্প্রচারকে ব্যবহার :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা নির্দেশনায় AIR বা **অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো** এবং অন্যান্য বেতার চ্যানেল শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনার ক্ষেত্রে মূল্যবান সহায়তা দান করতে পারে। প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী সেগুলিকে যত্ন সহকারে শ্রেণিকক্ষে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা আছে। সংক্ষেপে সেগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(i) বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে প্রসাঙ্গিক যে বিষয়টি সম্প্রচারিত হবে তার ভাষা, কথা, বিষয়-বিন্যাস এবং সম্প্রচারের সময় ও অনুশীলনসূচি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(ii) শিক্ষক অবশ্যই তাঁর শ্রেণি শিক্ষণের সঙ্গে নির্ধারিত বেতার সম্প্রচারের অনুষ্ঠানের সমন্বয় ঘটাবার জন্য চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করবেন।

(iii) বেতার সম্প্রচারের যে অনুষ্ঠান শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক বিকাশ তথা অভিজ্ঞতা প্রদানের কমিটি করবে, সেই অনুষ্ঠানে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের

Scanned with CamScanner

পরিচিতি ঘটানো দরকার। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত দিক থেকে প্রয়োজন এবং মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কতটা উপযুক্ত তাও শিক্ষককে ভেবে দেখতে হবে এবং সেই অনুসারে তাদের শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি তৈরি করবেন। যে পরিবেশে বেতার সম্প্রচার করা হবে, সেই পরিবেশ পরিস্থিতিতে শিক্ষকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। শ্রেণিকক্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবস্থা, শিখন উপযোগী পরিবেশ এমন হওয়া দরকার যেখানে বেতার সম্প্রচারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। রেডিয়ো সেটটি এমন স্থানে রাখতে হবে যেখান থেকে উৎপন্ন শব্দ, কথা প্রভৃতি শ্রেণিকক্ষের সমস্ত শিক্ষার্থীরাই স্বচ্ছন্দে এবং পরিষ্কারভাবে শুনতে পায়। শ্রেণিকক্ষের বাইরের চারপাশের পরিবেশ যেন কোনোভাবেই অসুবিধা সৃষ্টি না করে তার প্রতি লক্ষ রাখা শিক্ষকের অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

(২) **টেপ-রেকর্ডার** (Tape Recorder) : শ্রুতিনির্ভর অন্য আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রদীপন হল টেপ-রেকর্ডার। টেপ-রেকর্ডার মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। মাইক্রোফোন, অ্যাম্প্লিফায়ার এবং রিপ্রোডিউসার। দুটি প্রধান প্রক্রিয়ায় এটি কার্য করে, যেমন— রেকর্ডিং এবং শব্দ উৎপাদন। এই টেপ-রেকর্ডারকে শিক্ষক শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

(i) সংগীত, নাটক, আবৃত্তি, ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে টেপ-রেকর্ডার-এর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতা আছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্যলাভ করে।

(ii) যে সমস্ত শিক্ষার্থীর খুব কম কথা বলার অভ্যাস থাকে তাদের কথা বলার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আনা এবং কথা বলার অভ্যাসটিতে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া যায়। আবার কিছু শিক্ষার্থী আছে যাদের কথা বলার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে, ঠিকমতো কথা বলতে পারে না অথবা উচ্চারণে বেশ কিছু ত্রুটি থাকে। এই সমস্ত ত্রুটি দূর করার ক্ষেত্রে টেপ-রেকর্ডারকে কাজে লাগাতে পারেন শিক্ষক।

(iii) নাটকের মতো বিষয় কথাবার্তার দক্ষতা, প্রকাশ ক্ষমতা, কথা বলার কৌশল ও ধরনের বিকাশ ঘটাতে টেপ-রেকর্ডার যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(iv) কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির একটি বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা কিংবা আলোচনা রেকর্ড করে পরে সেটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করে প্রয়োজন মতো শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন শিক্ষক। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষই সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

(v) রেকর্ড করা কোনো বিষয় যেমন শিক্ষার্থীদের সামনে বারংবার উপস্থাপন করে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের গভীরে যেতে সাহায্য করে তেমনই আলোচিত অংশগুলিকে

ফিরে ফিরে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে শিক্ষক পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন।

(vi) শিক্ষার্থীদের নিজেদের বক্তব্যের কথা, শব্দ ব্যবহার, উপকরণ রীতি, মুদ্রাদোষ সবকিছু বিশ্লেষণ করে সংশোধনের সুযোগ পায়।

(vii) অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কোনো সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স-এ হাজির করানো হয় কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন সবকিছু তাদের উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না; পরবর্তীকালে সেগুলির রেকর্ড শিক্ষার্থীদের শোনার সুযোগ দিলে তারা যেমন উৎসাহিত হয়, তেমনই পুনরাবৃত্তিতে আলোচনার সুযোগ পায়।

(viii) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ ধারাকে অনেক সময় রেকর্ড করে তাদের আচরণ ধারা বিশ্লেষণ ও সংশোধন-এর সুযোগ থাকে।

(ix) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যেভাবে শিক্ষণের কার্য-পরিচালনা করলেন তার রেকর্ডিং করা থাকলে শিক্ষক নিজের কাজের বিচারবিশ্লেষণ করে মূল্যায়নের সুযোগ পান, যা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদেরই উপকারে আসে।

(৩) **গ্রামোফোন** (Gramophone) : শ্রবণমূলক শিক্ষণপ্রদীপণ হিসেবে অন্যতম উল্লেখযোগ্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি হল গ্রামোফোন। গ্রামোফোনে ব্যবহার হয় একটি পরিপূরক উপাদান হিসেবে 'রেকর্ড' নামে বস্তুটি। শিক্ষাক্ষেত্রে এটিও যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা রাখে। শিক্ষণীয় বিষয় এর উপর বেশ কিছু রেকর্ড প্রস্তুত করা হলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর, শিল্পীকণ্ঠের সঙ্গীত, আবৃত্তিকারের আবৃত্তি, বক্তৃতাদানকারী খ্যাতনামা ব্যক্তির বক্তৃতাকে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রাসঙ্গিক ও পরিস্থিতি অনুসারে উপস্থাপিত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের নিকট শিখনের বিষয়বস্তু সহজ ও স্পষ্ট হয় উঠতে পারে। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে এবং তাঁদের জীবন ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। গ্রামোফোনের সাহায্যে এইভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চার করা যায়। যেমন--- স্বামী বিবেকানন্দের নিজের কণ্ঠস্বর এ শিক্ষার তাৎপর্য, শিক্ষাসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরে যদি শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরা যায় তাহলে তার গুরুত্ব অনেকখানি। এইভাবে গ্রামোফোনকে শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষক ব্যবহার করে শিক্ষণের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে গ্রামোফোনকে ভাষা শিক্ষায় উচ্চারণভঙ্গি, সঙ্গীত শিক্ষায় সঙ্গীতের সুর, তাল কিংবা সাহিত্য শিক্ষায় রসবোধ, হাস্যরস, করুনরস, বীররস সঞ্চার করে শিক্ষণকার্যকে যথার্থ সফল করে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষণ প্রদীপন হিসাবে গ্রামোফোনের ব্যবহার কম। তাছাড়া পর্যাপ্ত শিক্ষামূলক রেকর্ড এর অভাবও আছে।

(ক) গ্রামোফোন কী এবং কেন (What and why Gramophone) :

প্রকৃতপক্ষে গ্রামোফোন একটি বাণিজ্যিক নাম। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি রেকর্ড বাজানোর জন্য যন্ত্র। ১৮৮৭ সনের ৮ই নভেম্বর এমিল বারলাইনার প্রথম গ্রামোফোন পেটেন্ট করেন।

Scanned with CamScanner

তিনিই প্রথম সিলিণ্ডারের বদলে পাতলা ডিস্কের উপর রেকর্ড করার পদ্ধতি বার করেন। প্রথম রেকর্ড করা হয় কাঁচের উপর; পরবর্তীকালে দস্তা এবং বর্তমানে প্লাস্টিকের উপর রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা সাহায্যকারী উপাদান হিসাবে গ্রামোফোন কতটা ব্যবহার করা যায় তা আলোচনার আগে জানা দরকার শিক্ষা সাহায্যকারী উপাদান ব্যবহারের নীতি ও কৌশল। মরিশ, পি. মোকার্ট একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি যে নীতিগুলি উল্লেখ করেছেন তা হল :

উদ্দেশ্যের নীতি— অর্থাৎ কী কাজে ব্যবহার হবে। গ্রামোফোন এক্ষেত্রে শোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারে।

উপায়ের নীতি— অর্থাৎ কী উপায়ে ব্যবহার করা যাবে। গ্রামোফোনের মাধ্যমে ব্যবহৃত বিষয় একাধিকবার ব্যবহার করে শেখানো যেতে পারে।

নির্বাচনের নীতি— অনেকগুলি শিখন সাহায্যকারী উপাদানের মধ্যে গ্রামোফোন নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা কম, খরচ কম এবং ব্যবহার সহজ।

কার্যকারীতার নীতি— অনেক মাধ্যমের মত গ্রামোফোনও শিক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের নীতি— গ্রামোফোন একটি উদ্দীপক হিসাবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাজেই ঐ সমস্ত দিক বিবেচনা করে গ্রামোফোনকে একটি শিক্ষণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে; ফলে গ্রামোফোনের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। তবে নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামোফোনেরও নানা পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

(খ) **গ্রামোফোন ব্যবহারের সুবিধা :** গ্রামোফোন নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় :

- সঙ্গীত, নাটক এবং ভাষাশিক্ষা মত বিষয় শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায়;
- ভাষার উচ্চারণের ত্রুটি বা সঙ্গীত শিক্ষার ত্রুটি দূর করার জন্যও ব্যবহার করা যায়;
- কথা বার্তা বলার দক্ষতা বারানোর জন্য এটি ব্যবহার করা যায়;
- এমন কি শিক্ষণ শিখন মূল্যায়ণের জন্যও ব্যবহার করা যায়;
- বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির সংগঠন এবং মূল্যায়ন করার জন্যও গ্রামোফোন ব্যবহার করা যায়;
- শিক্ষামূলক বিষয়কে রেকর্ড করে শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায়;
- রেডিও, টেলিভিশণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোনকেও শিক্ষণেরকাজে ব্যবহার করা যাবে;
- আচরণ পরিবর্তনের জন্য শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন মত বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা যেতে পারে।

- **দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন (Visual Aids) :**

দর্শন অনুভূতিকে ব্যবহার করার জন্য দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষুর ওপর নির্ভর করে যখন শিক্ষণ প্রদীপনকে শিক্ষণকার্যে প্রয়োগ করা হয় তখন সেই ধরনের শিক্ষণ প্রদীপনকে বলা হয় দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন বা Visual Aids । দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপনগুলি বিভিন্ন রকম হতে পারে; যেমন—চার্ট, মডেল, প্রকৃত বস্তু, স্লাইড, ছবি বা ফটোগ্রাফ, মানচিত্র, রেখাচিত্র, গ্লোব, ফিল্ম স্ট্রিপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, পোস্টার ও সংবাদপত্র।

উপরোক্ত প্রদীপনগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) **চার্ট** (Chart) : শ্রেণিশিক্ষণে চার্ট একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন। এডগার ডেলের মতে, পাঠের বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যকে শিক্ষার্থীর নিকট স্পষ্ট করে তোলার জন্য দৃষ্টিমূলক যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে চার্ট বলা যায়। **Wittich** এবং **Schuller**, ১৯৫৩ চার্টকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "As a combination of graphic and pictorial media designed for the orderly and logical visualizing of relationship between key facts or ideas."

- **শিক্ষাক্ষেত্রে চার্টের গুরুত্ব (Important of Chart in education) :**

(i) বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বোঝাতে যেমন তুলনা, আপেক্ষিক পরিমাণ, উন্নয়ন, পদ্ধতিসমূহ, শ্রেণিবিন্যাস এবং ঘটনা, ছক, পরিসংখ্যান প্রভৃতি উপলব্ধি করাতে চার্ট ব্যবহৃত হয়।

(ii) সংক্ষেপে তথ্য পরিবেশনে চার্ট সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

(iii) বিমূর্ত ভাব বা ধারণাকে পরিবেশন করতে অনেক সময় চার্টের সাহায্য নিতে হয়।

(iv) কোনো জটিল শব্দ বা বাক্যের দ্রুত অর্থ উপলব্ধিতে বা ব্যাখ্যাকরণে চার্ট বিশেষভাবে সহায়ক।

(v) চিন্তন প্রক্রিয়াকে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে অগ্রসর করতে এবং বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধির ক্ষেত্রে চার্ট সহযোগিতা করে।

(vi) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং প্রেষণা সঞ্চারের ক্ষেত্রেও চার্ট বিশেষভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

চার্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন বৃক্ষচার্ট (tree chart), সময় চার্ট (time chart), প্রবাহ বা ধারাবাহিক চার্ট (flow chart), তালিকা চার্ট (table chart), বিষয় বা সমস্যা চার্ট (issue chart), চিত্রযুক্ত চার্ট (pictorial chart) ও বৃত্তীয় চার্ট (pie chart)।

(২) **মডেল** (Model) : প্রকৃত বস্তুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় মডেল (model) প্রকৃত বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপ হল মডেল। **মঙ্গল ও মঙ্গল** তাঁদের 'Essentials of Educational Technology' নামক গ্রন্থে মডেলের সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন "models

Scanned with CamScanner

can be defined as a replica, imitation or copy of the real things or objects with a suitable change in size, complexity, timing, safety and cost factors for carrying out the desired instructional purpose."

মডেল বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। শ্রেণিশিক্ষণে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে কখনো প্রকৃত বস্তুর সমান মাপের হতে পারে যেমন—একটি ব্যাটারির মডেল; প্রকৃত বস্তু অপেক্ষা বড়ো আকারের যেমন—বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি; ছোটো আকারের হতে পারে যেমন—বিভিন্ন বাড়ি, গাড়ি, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। মডেল হতে পারে কঠিন, ফাঁপা, আবার বাহ্যিক রূপ মাত্র। কোনো জীবজন্তুর দেহাভ্যন্তরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়াই বাইরের কাঠামোটি মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় 'scale model', আবার মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ দেখানোর জন্য মডেল প্রস্তুত করা হয়। যেমন—চোখ, কান, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ইত্যাদির মডেল। আবার (ডায়নামো), জলের পাম্প, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদিরও মডেল হতে পারে।

- **শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে মডেলের গুরুত্ব :**

(i) শ্রেণিশিক্ষণে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে শিক্ষণকার্যে প্রকৃত বস্তু ও তার কার্যকারিতাকে ছবি, চার্ট-এর সাহায্যে বোঝানো যায় না আবার প্রকৃত বস্তুটিকে শ্রেণিকক্ষে হাজিরও করানো যায় না। সেক্ষেত্রে কার্যকরী মডেল প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষণকে সার্থক করে তোলা যায়। যেমন—চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ-এর ঘটনা, পৃথিবীতে দিনরাত্রির ঘটনা, আগ্নেয়গিরির ঘটনা ইত্যাদি।

(ii) প্রকৃত বস্তুকে শ্রেণিকক্ষে হাজির করানো যায় না আরও একটি কারণে। কখনো সেটি আকারে বিশাল আবার কখনো সেটি আকারে ক্ষুদ্র। উভয় ক্ষেত্রটিতে শিক্ষক তার শিক্ষণের কাজকে সফল ও শিক্ষার্থীদের শিখনে সাহায্য করার জন্য শ্রেণিকক্ষে হাজির করেন। প্রকৃত বস্তুর ছোটো প্রতিরূপ যেমন—পৃথিবীর গঠন বোঝাবার জন্য পৃথিবীর মডেল এবং প্রকৃত বস্তুর বড়ো প্রতিরূপ যেমন—কীট-পতঙ্গের মডেল।

(iii) শ্রেণিকক্ষে এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয় যখন কোনো একটি বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা বস্তু সামগ্রী, ফলাফল কখনোই উপস্থাপিত করা যায় না, বিশেষ করে অতীতের বিভিন্ন ঘটনা, সভ্যতা বিকাশের ধারা, অতীতের মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ, জীবনযাপন প্রণালী, বিভিন্ন ব্যক্তি, মহাপুরুষ সম্পর্কের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলার ক্ষেত্রে মডেল বিশেষভাবে কার্যকরী।

(iv) দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা আলোচনা পর্বে শিক্ষককে অনেক সময় প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে মডেল ব্যবহার করতে হয় যেমন—কোনারকের সূর্যমন্দির, মীনাক্ষীমন্দির, কুতুবমিনার, তাজমহল, বিভিন্ন জলাধার প্রকল্প ইত্যাদি।

(v) প্রকৃত বস্তুর, বিভিন্ন অংশের গঠন, একটি অংশের সঙ্গে অন্য একটি অংশের সম্পর্ক এবং তাদের কার্যকারিতা বোঝানোর ক্ষেত্রেও শিক্ষক মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। যেমন মানবদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় চোখ, কান, প্রভৃতি, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, মানুষের পরিপাক তন্ত্র ইত্যাদি।

(৩) **বাস্তব বস্তু/নমুনা** (Real object/Specimen) : শ্রেণিকক্ষে পাঠ-পরিচালনা বা শিক্ষণমূলককার্যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বাস্তব বস্তু বা নমুনা। পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে বাস্তব বস্তুর উপস্থাপনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিখনকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং প্রকৃত উপলব্ধিতে সাহায্য করা যায়। শিক্ষক নিজেও বেশ স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন। ইতিহাস পাঠে মুদ্রা, মুদ্রিত গ্রন্থ, ব্যবহৃত বস্তু কিংবা অস্ত্র ইত্যাদি; ভূগোল পাঠে মৃত্তিকা, বিভিন্ন প্রকার শিলার অংশ বা খণ্ড; জীববিজ্ঞানে বিভিন্ন জীবজন্তুর Specimen, উদ্ভিদের Specimen; ভৌতবিজ্ঞানে বিভিন্ন যন্ত্র বা যান্ত্রিক অংশ রাসায়নিক বস্তু ইত্যাদি। এই সমস্ত বাস্তব বস্তুর উপস্থাপন বা নমুনা প্রদর্শনের দ্বারা শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুরুত্ব উপলব্ধিতে প্রেরণা পায়।

(৪) **ছবি** (Picture) **এবং ফটোগ্রাফ** (Photograph) : শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে ছবি বা ফটোগ্রাফের ব্যবহারও বেশ উপযোগী। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে-এর গুরুত্ব এবং আকর্ষণ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন বিষয়ে ছবির ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ছবিগুলি হতে পারে অঙ্কিত, মুদ্রিত অথবা ক্যামেরার সাহায্যে তোলা। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ছবিগুলি শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর উপলব্ধিতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। **শিক্ষার্থীদের সামনে ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে। সেগুলি হল :**

(i) ছবি নির্বাচিত হবে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে।

(ii) ছবি অবশ্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে।

(iii) যতখানি সম্ভব ছবিতে প্রয়োজন মতো রঙের ব্যবহার থাকা দরকার।

(iv) ছবি হবে যথাযথ, সঠিক এবং উপযুক্ত আকার ও আয়তনের।

(v) শিক্ষক নিজে ছবি এঁকে নিতে পারেন, অথবা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে আঁকিয়ে নিতে পারেন।

(vi) শিক্ষক নিজে বোর্ডে ছবি এঁকে নিতে পারেন। তবে অবশ্যই শ্রেণির সমস্ত শিক্ষার্থী যেন ভালোভাবে দেখতে পায়।

(vii) প্রসঙ্গ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ছবিকে শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে।

(viii) ছবি ও পাঠ্য-বিষয়বস্তুর বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(ix) উৎসাহী শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকতে উৎসাহিত করতে হবে।

Scanned with CamScanner

(x) প্রয়োজনে বাড়িতে গৃহ কাজ হিসেবে ছবি আঁকতে দিতে হবে।

(xi) ফটোগ্রাফিতে উৎসাহিত করাও যেতে পারে।

(৫) **মানচিত্র** (Map) : শ্রেণিকক্ষের পাঠ-পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণমূলক প্রদীপন হল মানচিত্র। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিতেও মানচিত্র উপযোগী ভূমিকা পালন করে। মানচিত্রকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য রাখলে বা পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা করলে শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মানচিত্র থেকে অনেকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। **Jarolimek এবং পার্কার ১৯৩৩ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি শিক্ষণ শিখন কার্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।**

(i) পৃথিবীর স্থল ও জলভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভে মানচিত্র সাহায্য করে। বিভিন্ন মহাদেশ, মহাসাগর, সাগর, হ্রদ, উপসাগর, দ্বীপ, উপদ্বীপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

(ii) পৃথিবীর বিভিন্ন সমতল ভূমি, পাহাড় ও পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদনদী, উপত্যকার অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে মানচিত্র।

(iii) বিভিন্ন স্থানের অবস্থানগত তুলনামূলক দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

(iv) জনঘনত্ব, দেশের প্রধান প্রধান শহর, নগর ও বন্দরের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে।

(v) কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত উৎপাদন, মৃত্তিকার উর্বরতা ও প্রকৃতি, বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান উপলব্ধিতে সহায়ক।

(vi) দেশের রাজনৈতিক বিভাজন, সীমারেখা, রাজধানীর অবস্থান, রাজনৈতিক বিভিন্ন তথ্য প্রদানযুক্ত মানচিত্র সংশ্লিষ্ট ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে।

(vii) সমুদ্রস্রোত, খনিজ সম্পদের অবস্থান, খনিজতেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারের সঞ্চয়, বায়ুপ্রবাহ ও তার কার্যকারিতার পরিচয় দান করে।

(viii) দেশের বিভিন্ন শহর, রাস্তাঘাট, পরিবহণব্যবস্থা, টেলিযোগ ব্যবস্থা, সেতু, জলাধার, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র সম্পর্কে পরিচয় দেয় মানচিত্র।

মানচিত্রগুলি প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে—যেমন রাজনৈতিক মানচিত্র, প্রাকৃতিক মানচিত্র, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র।

প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষণকার্যকে অধিক ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

(i) শ্রেণিকক্ষের পাঠ পরিচালনায় পাঠ্য-বিষয়বস্তুর শিক্ষণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে কোন্ ধরনের মানচিত্র ব্যবহার করা হবে তার সঠিক নির্বাচন করা দরকার। অর্থাৎ মানচিত্রটি রাজনৈতিক, না প্রাকৃতিক না কি রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা ঠিক করতে হবে শিক্ষককে।

(ii) মানচিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, তাদের পরিণমনের স্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(iii) শ্রেণিতে মানচিত্রকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সমস্ত শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দে তা দেখতে পায়। দূরবর্তী স্থানে যে সমস্ত শিক্ষার্থী অবস্থান করে তারাও যাতে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তার জন্য লেখাগুলি যেন স্পষ্ট এবং মোটা অক্ষরের হয়।

(iv) মানচিত্রের গুণগত মানের ক্ষেত্রে proper scaling গুরুত্বপূর্ণ। আপেক্ষিক আকার, দূরত্ব এবং অঞ্চলকে নির্দেশ করার জন্য মানচিত্রে অবশ্যই proper scaling থাকা জরুরি।

(v) মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয় যেমন পাহাড়-পর্বত, নদনদী, সাগর, হ্রদ, গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশকারী প্রতীক (symbols) এবং রং (colours) ব্যবহার করা দরকার। এ বিষয়ে শিক্ষক অবশ্যই সচেতন থাকবেন।

(vi) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক মানচিত্রের বিভিন্ন বিষয় নির্দেশ করার জন্য একটি লম্বা ছড়ি বা pointer ব্যবহার করবেন।

(viii) মানচিত্রের নির্দিষ্ট বিষয়গুলির দেখানোর সময় প্রয়োজনে তা ব্যাখ্যা করে দেবেন শিক্ষক।

(৬) **স্লাইড** (Slide) : শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় পাঠ্য-বিষয়বস্তু আরও বেশি জীবন্ত ও নিখুঁত ভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য শিক্ষক স্লাইড (slide) ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণত কোনো স্বচ্ছ বস্তুর উপর কোনো প্রতিবিম্ব স্থাপন করানোকে বলা হয় স্লাইড প্রদর্শন। পাঠ্য বিষয়বস্তুকে কীভাবে উপস্থাপন করা হবে সেই অনুসারে পরিকল্পনা করে স্লাইড প্রস্তুত করা হয়। আবার, অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জীবকে দেখার জন্যও কাচের খণ্ডের উপর বিশেষ উপায়ে mount করে slide প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার এই স্লাইডের শিক্ষাগত মূল্য অনেকখানি। **নিম্নে তা উল্লেখ করা হল—**

(i) বড়ো আকারের পর্দায় বস্তুর প্রতিবিম্ব হলে শিক্ষার্থীদের তা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পাঠ্য-বিষয়বস্তুতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

(ii) শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয়ের অবতারণা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন এবং পাঠের ধারাবাহিক আলোচনায় সঠিক বিন্যাস ও ব্যাখ্যাকরণে শিক্ষককে সহায়তা করে এই স্লাইডগুলি।

(iii) পাঠ্যবিষয়ের পুনরাবৃত্তি, পুনরালোচনার সুযোগ এবং অনুশীলনের সুযোগ দিয়ে স্লাইডগুলি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে ও দক্ষতালাভে সহায়তা করে।

(iv) শিক্ষাদানকালে বা পাঠ-পরিচালনার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বোধমূলক মূল্যায়ন করতে পারেন।

(v) শিক্ষক যখন দীর্ঘসময় ধরে কোনো ব্যাখ্যা করেন অথবা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকেন তখন slide-কে শিক্ষার্থীদের সামনে রাখা যায়, এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে পারে। প্রয়োজনে পিছনেও যাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

(vi) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আণুবিক্ষণিক জীবগুলিকে শিক্ষার্থীদের সামনে স্পষ্ট এবং মূর্ত করে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনে অতীব সহায়তা করে থাকে slide-গুলি। শিক্ষার্থীদের চিন্তনপ্রক্রিয়াকে আরও বেশি অগ্রবর্তী করে তোলে।

(৭) **রেখাচিত্র** (Diagram) : শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে এমন বহু বিষয় থাকে যেগুলি মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে সক্ষম হন না। সেক্ষেত্রে শিক্ষক কিছু রেখা এবং জ্যামিতিক আকৃতির সাহায্যে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে বোধগম্য করে তোলেন। **Mangal and Mangal** তাঁদের 'Essentials of Educational Technology' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। "A diagram may be defined as a graphic visual and in the form of some simplified but explanatory drawing to show inter-relationships as well as explain ideas, events or process by means of lines, geometrical forms and symbols."

এই রেখাচিত্রের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার দেখা যায় জীববিদ্যা, ভৌতবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, শিক্ষাবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে। **শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে রেখাচিত্র ব্যবহারের সময় কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকবেন,** যেমন----

(i) রেখাচিত্র স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও বড়ো আকৃতির হতে হবে, যাতে শ্রেণিকক্ষের শেষ বেঞ্চের শিক্ষার্থীরাও স্পষ্ট দেখতে পায়।
(ii) রেখাচিত্র নির্ভুল হওয়া দরকার এবং তথ্যের বাহুল্য বর্জিত হওয়া দরকার।
(iii) পাঠ্য-বিষয়বস্তুর সঙ্গে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
(iv) রেখাচিত্রের বিভিন্ন অংশকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে দেখানো দরকার।

(৮) **লেখচিত্র বা গ্রাফ** (Graph) : লেখচিত্র হল এমন এক চিত্ররূপ যার সাহায্যে সংখ্যাগত ও পরিসংখ্যানগত রাশি তথ্যগুলিকে সহজে বোধগম্য করে তোলা হয়। এই ধরনের লেখচিত্র অর্থনীতি, রাশিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, শিক্ষাবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। **Mangal** এবং **Mangal** গ্রাফকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে—"Graphs are defined as those visual graphic aids which help in the visual representation of numerical data with the objectives of providing a gist of informations along with revealing any important relationship (such as trends and variations from normal), contained in the dates as quickly and effectively as possible."

গ্রাফ বা লেখচিত্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন—রেখা গ্রাফ (line graph), স্তম্ভ লেখচিত্র (Bar graph), বৃত্তীয় লেখচিত্র (Circle graph, Pie-graph) চিত্রমূলক লেখচিত্র (Pictorial graph)। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে পরিসংখ্যা বহুভুজ, ওজাইভ, আয়তলেখ, পাই গ্রাফ, বারচিত্র এবং রেখাচিত্র বা Line graph-এর ব্যবহার খুব বেশি। **এই সমস্ত গ্রাফ বা লেখচিত্রের শিক্ষামূলক গুরুত্ব যথেষ্ট, যেমন—**

ebook.dascoaching.in

(i) লেখচিত্র বা গ্রাফ দ্বারা প্রকাশিত রাশিমালার গুরুত্ব বা তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য হয়।
(ii) বিভিন্ন রাশি তথ্যগুলির মধ্যে তুলনা করে তাদের তুলনামূলক আলোচনা করা সহজ হয়।
(iii) রাশি তথ্যমালার মধ্যে কোনো বিশেষ প্রবণতা থাকলে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।
(iv) বিভিন্ন চলকের মানসমূহ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা সহজেই জানা যায়।

(৯) **গ্লোব** (Globe) : জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত যে সমস্ত শিক্ষামূলক উপকরণ আমাদের শ্রেণিকক্ষগুলিতে দেখা যায় তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল গ্লোব। ভূগোল বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলেও ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও আরও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানগুলিতে গ্লোবের ব্যবহার দেখা যায়। **গ্লোবের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক দিকগুলি হল—**

(i) গ্লোবের সাহায্যে বোঝানো যায় পৃথিবী গোলাকার বস্তু।
(ii) গ্লোবের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বোঝানো সহজ হয় যে, পৃথিবী স্থির নয় ঘূর্ণমান বস্তু।
(iii) পৃথিবীর সবচেয়ে বেশির ভাগ অংশই জল দ্বারা আবদ্ধ তা সহজেই শিক্ষার্থীদের বোঝানো সহজ হয়।
(iv) গ্লোবের সাহায্যে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও কোনো দেশ ও স্থানের অবস্থান শিক্ষার্থীদের বোঝানো সহজ হয়।
(v) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের সঞ্চরণ ও সম্পর্ক উপলব্ধি সহজ হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার উপলব্ধি সহজ হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও দেশগুলিতে আবিষ্কার ও সভ্যতার আবিষ্কার গ্লোবের থেকে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

(১০) **ফিল্ম স্ট্রিপ** (Film strips) : পৃথক পৃথক চিত্র সম্বলিত ফিল্মের ছোটো ছোটো খণ্ড সম্মিলিতভাবে একটি বিশেষ ধারণাকে শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির করে এই ফিল্ম স্ট্রিপ। চিত্র সম্বলিত ছোটো ছোটো খণ্ডগুলি ক্রমানুসারে সাজানো থাকে এবং শ্রেণিকক্ষে একটি পাঠের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। চিত্রগুলির সঙ্গে শব্দ সংযোজিত থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এগুলি রঙিন হতে পারে আবার সাদা-কালোও হতে পারে। একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম স্ট্রিপের মধ্যে সাধারণত ২০ থেকে ৫০টি চিত্র থাকে এবং ২ থেকে ৫ ফিটের মধ্যে দীর্ঘ হয়। একটি চিত্রের দৈর্ঘ্য ১.৬ ইঞ্চির মতো। যেহেতু ফিল্মগুলি নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত থাকে, তাই ফিল্ম স্ট্রিপ পাঠ্য-বিষয় বস্তুকে শ্রেণিকক্ষে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের আকর্ষণ ঘটিয়ে সহজেই তাদের পাঠে প্রেষণা সঞ্চারে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপনগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন ব্যবহার করতে দেখা যায়, সেগুলি হল—ম্যাজিক লণ্ঠন, পোস্টার, সংবাদপত্র এবং কম্পিউটারে ব্যবহৃত পাওয়ার পয়েন্ট-এর স্লাইড ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

◆ শ্রবণ-দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন (Audio-Visual Aids) :

মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন বা জ্ঞানার্জন করে মূলত চক্ষু ও কর্ণ এই দুটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নির্ভর করেই। দর্শন ও শ্রবণ অনুভূতির উপর ভিত্তি করে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি তাই আমাদের ধারণা গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয় সবচেয়ে বেশি। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে যা তারা শোনে আর যা যা দেখে সেগুলির গুরুত্ব অনেক বেশি। এজন্য আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণনাবহুল বা ব্যাখ্যামূলক পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে শ্রবণ ও দৃষ্টি নির্ভর শিক্ষামূলক উপকরণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। শ্রবণ ও দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(১) চলচ্চিত্র, (২) দূরদর্শন ও (৩) কম্পিউটার। নিম্নে **এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :**

(১) **চলচ্চিত্র** (Cinema) : রূপালি পর্দায় চলমান চিত্রের এক আশ্চর্য জাদু সমগ্র বিশ্বের মানুষকে মোহিত করে রেখেছে। মানুষের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র মানুষের জীবন বোধের সন্ধান দেয় আর শিক্ষাক্ষেত্রে হয়ে ওঠে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক উপকরণ। আলাদা আলাদা আলোক চিত্র পর পর সাজিয়ে নির্দিষ্ট গতিতে মানুষের চোখের সামনে হাজির করলে চলমান চিত্রের উদ্ভব হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এক একটি ধারণাকে মূর্ত করে তোলে শিক্ষার্থীর সামনে। পূর্ণাঙ্গ সবাক চলচ্চিত্রের প্রাণ শুরু ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হলেও চার ও পাঁচের দশকের পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই উচ্চমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে।

বিভিন্ন গবেষণায় চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক উপযোগিতাগুলি জানা গেছে। নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(i) **বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা :** শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের সামনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

(ii) **আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চার :** চলচ্চিত্রের দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সর্বোপরি প্রেষণার সঞ্চার করে।

(iii) **ইতিবাচক মনোভাব :** চলচ্চিত্রের ঘটনাবলির প্রভাবে শিক্ষার্থীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। জীবনবোধ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি করে।

(iv) **প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ :** চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিখন সঞ্চালনের দ্বারা এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রকৃত পর্যবেক্ষণের চেতনাকে জাগ্রত করে তোলে।

(v) **অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি :** চলচ্চিত্রের প্রদর্শিত বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা লাভে অসম্পূর্ণতা দূর হয় এবং শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন স্থায়ী হয়।

(vi) **নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি :** বহুক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রদর্শিত স্থান, কাল, পাত্র শিক্ষার্থীদের মনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারের দ্বারা পুরাতন মূল্যবোধগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে।

চলচ্চিত্রের যেমন ভালো দিক আছে তেমনি তার কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে। চলচ্চিত্রের এই ক্ষতিকর দিকটি নিয়ন্ত্রিত করে সচেতনভাবে যদি শিক্ষণমূলক উপকরণ হিসেবে ভালো দিকগুলিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসৃত করা যায়, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করে।

(২) **দূরদর্শন** (Television) : চলচ্চিত্রের মতো দূরদর্শনও একটি শ্রবণ ও দৃষ্টিমূলক উপকরণ। একইসাথে শ্রবণ ও দর্শনের মতো কাজ সম্পন্ন হয় বলে দূরদর্শন সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। **শিক্ষণমূলক উপকরণ হিসেবে দূরদর্শনের গুরুত্ব নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :**

(i) **মূর্ত ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান :** পাঠ্যবিষয়ের এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যেগুলি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত করা বেশ কঠিন, ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা অনেক সময় বোধগম্য হয় না, কিন্তু দূরদর্শনের মাধ্যমে সেই বিষয়টি সহজেই বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব এবং শিক্ষার্থীদের কাছে তা সহজেই মূর্ত হয়ে ওঠে।

(ii) **অত্যাধুনিক জ্ঞান :** পাঠক্রমের অন্তর্গত অনেক বিষয়ই আছে যেগুলি দূরদর্শনের দ্বারা প্রদর্শিত হলে অনেক বেশি তথ্যবহুল ও অত্যাধুনিক রূপ লাভ করে।

(iii) **মনোযোগ আকর্ষণ :** দূরদর্শন যে-কোনো বিষয় বা ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রাণবন্ত করে উপস্থাপিত করে, ফলে তা যেমন একদিকে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তেমনই বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য দূরদর্শন-এ প্রদর্শিত বিষয় সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(iv) **প্রেষণা সঞ্চার :** দূরদর্শনে অনেক সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই ধরনের বক্তব্য রাখার সময় বা আলোচনা কালে অনেক শিক্ষার্থীও হাজির থাকে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রেষণা লাভ করে।

(v) **বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ :** দূরদর্শনকে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য বর্তমানে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু এই মাধ্যমটি সহজেই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে, তাই নিরক্ষর মানুষকে তাদের কর্মজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রথামুক্তভাবে নানা ধরনের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে।

Scanned with CamScanner

(vi) **জনশিক্ষার বিস্তার :** দূরদূর্শনের দ্বারা জনগণকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সচেতন করে তোলা যায়। প্রথমত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা মানুষের জীবনে কতখানি তার উপলব্ধিতে দূরদর্শন খুব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথামুক্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে জনগণকে যেমন উৎসাহিত করে, তেমনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলে, যেমন—কৃষি, শিল্প, পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ দূষণ, রোগ ও তার প্রতিকার-এর প্রসঙ্গ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা প্রসঙ্গ।

অতিরিক্ত নতুন তথ্য, ইতিহাসচর্চার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, কোন ঐতিহাসিক ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা, কিম্বা গবেষণালব্ধ নতুন তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। ফলে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায় ও 'Up to date Knowledge' এর অধিকারী হয়। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

(5) সমধর্মী পুস্তক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অতিরিক্ত পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। বিভিন্ন লেখকের লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ইতিহাসের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। ইতিহাস পাঠের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা জন্মায়। অতিরিক্ত জ্ঞান আহরণের জাগে, ফলে ইতিহাস পাঠের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(6) শুধুমাত্র পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চা একঘেয়েমিতা সৃষ্টি করে। সমধর্মী পুস্তক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের আস্বাদ পায় এবং শিক্ষার্থীরা ইতিহাস পাঠে উৎসাহী বোধ করে। শিক্ষার্থীর কাছে ইতিহাস অনেক বেশি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাই Johnson বলেছেন সমধর্মী পুস্তকী 'make the history real, intelligible and interesting'.।

(7) শিক্ষার্থীরা সমধর্মী পুস্তক থেকে নিজেদের পছন্দমতো বিষয় সংগ্রহ করে ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে ইতিহাস চর্চা করতে পারে।

(8) সমধর্মী পুস্তক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্য প্রীতি গড়ে ওঠে।

(9) বিভিন্ন সমধর্মী পুস্তকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়। ফলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয় এবং নিরপেক্ষ সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

◆ ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা (Skill of Blackboard Use) :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত উপকরণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্ল্যাকবোর্ড। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যে 'চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন' প্রবর্তিত হয় তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড'। এর থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষের মতো দেশে ব্ল্যাকবোর্ডের গুরুত্ব কতখানি। বস্তুত, শ্রেণিকক্ষে

ব্যবহৃত শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলির মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্য নাম হল ব্ল্যাকবোর্ড। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তব্যকে লিখিত রূপ দেওয়া, প্রয়োজনীয় নকশা, ছক, কোনো মানচিত্র বা চিত্র অঙ্কনের জন্য ব্ল্যাকবোর্ড অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। শিক্ষাবিদ **Raymont**-এর ভাষায় "Blackboard drawings, sketches and maps are superior to finish production at least in the early lessons."

অল্প খরচে তৈরি অথচ দীর্ঘ সময়কালীন ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে প্রচলিত সাধারণত কালো রঙের এই উপকরণটিকে শ্রেণিকক্ষের এমন একটি স্থানে স্থাপন করা হয়। যাতে সমস্ত শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দে সেটি দেখতে পায়। সাদা চক কখনো-কখনো রঙিন চক, এই ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। আজকাল অনেক আধুনিক লেখার জন্য বোর্ড চালু হয়েছে, কিন্তু তথাপি ব্ল্যাকবোর্ডের গুরুত্ব আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। শ্রেণিকক্ষে যে-কোনো পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর উপলব্ধি স্তরে যথার্থভাবে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করতেই হবে। সুতরাং একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্ল্যাকবোর্ডকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারা। এই জন্যই ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের প্রশ্নটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ :

(i) পাঠ্য-বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টতা এবং ধারণার উপলব্ধিতে স্পষ্টতা,

(ii) পুনঃশক্তিসঞ্চারক বিষয়গুলি লেখার সঙ্গে সঙ্গে মৌখিকভাবে সেগুলির উপস্থাপন,

(iii) পাঠ্যবিষয়বস্তুর সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন এবং

(iv) পাঠ্যবিষয়ের প্রাসঙ্গিক দিক (relevant points)-গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ।

(ক) ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতার প্রধান উপাদান (Major components of skill of black board use) :

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতার প্রধান উপাদানগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) হস্তাক্ষরের বোধগম্যতা (Legibility in handwriting)

(i) লিখিত অক্ষরগুলির মধ্যে যেন স্পষ্ট ফাঁক বা ব্যবধান থাকে,

(ii) বড়ো হাতের অক্ষর-এর আকার বড়ো ও স্পষ্ট হতে হবে,

(iii) ছোটো হাতের অক্ষরগুলি আকারে বড়ো হাতের অক্ষরের তুলনায় ছোটো হতে হবে কিন্তু স্পষ্ট,

(iv) লেখার লাইনগুলি বেশ মোটা, পরিষ্কার হতে হবে।

(২) ব্ল্যাকবোর্ডের কাজের পরিচ্ছন্নতা (Neatness in blackboard work) :

(i) লিখিত লাইনগুলি সোজা হতে হবে,

Scanned with CamScanner

(ii) লেখা লাইনগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকতে হবে,

(iii) লেখার উপরে লেখা (over writing) পরিহার করতে হবে,

(iv) প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে হবে।

(৩) **উপযুক্ততা** (Appropriateness) :

(i) উল্লেখযোগ্য দিকগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে,

(ii) সংক্ষিপ্ততা এবং সরলতা মেনে চলতে হবে,

(iii) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণকারী দিকগুলির উল্লেখ করতে হবে।

(খ) শিক্ষক বোর্ড ব্যবহারের সময় দক্ষতার উপাদানগুলি সম্পর্কে যেমন অতি সচেতন থাকবেন তেমনই আরও কতগুলি দিক সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করবেন। **সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করা হল :**

(i) শ্রেণিকক্ষে পিছনের সারিতে উপস্থিত শিক্ষার্থীরাও যাতে স্বচ্ছন্দে দেখতে পায় তেমনভাবে লিখতে হবে।

(ii) ব্ল্যাকবোর্ডকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে তার থেকে আলো প্রতিফলিত না হয়।

(iii) চককে সঠিকভাবে ধরতে হবে যাতে লেখার সময় সেটি বারবার ভেঙে না যায়।

(iv) বোর্ড ও চকের ঘর্ষণে যেন অহেতুক শব্দ উৎপন্ন না হয়।

(v) বোর্ডের পাশে এমনভাবে দাঁড়িয়ে লেখা উচিত যাতে লেখার সময় সমস্ত শিক্ষার্থীদের দিকে মাঝে মাঝে দেখার সুযোগ থাকে।

(vi) লেখার সময় ৩০° কোণে চককে ধরা উচিত।

(vii) ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান বা ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে রঙিন চক ব্যবহার করা উচিত।

(viii) ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে সুযোগ দেওয়া উচিত।

(ix) ব্ল্যাকবোর্ড পরিচ্ছন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত, অপ্রাসঙ্গিক লেখা কখনোই পাশে থাকা উচিত নয়।

(x) শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে বোর্ডকে পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার।

আধুনিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্ল্যাকবোর্ডর ব্যবহার ক্রমশ উন্নত থেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষার প্রকৃতি, পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর চাহিদার কথা চিন্তা করে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহারকে আরও সহজ অথচ আধুনিক করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

◆ সফটওয়্যার (Software) :

বর্তমান একুশ শতকে কম্পিউটার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মানুষের জীবনে স্থান করে

নিয়েছে। অফিস, আদালত, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগারগুলিতে তার প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা এক বিশেষ স্তরে পৌঁছেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে কম্পিউটার Teaching Aid বা শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ বা প্রদীপন হিসেবে কী ভূমিকা পালন করে তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(i) **শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার জ্ঞান ও তথ্যের এক সঞ্চয় ভাণ্ডার :** শিক্ষণ-শিখনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠ্য-বিষয়বস্তুর অন্তর্গত সমস্তরকম প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও তথ্যের সঞ্চয়ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে কম্পিউটার প্রযুক্তি। একজন শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের দ্বারা উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। এই সমস্ত সংগৃহীত তথ্যগুলিকে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ব্যক্তিগত কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। আবার, অন্যদিকে, ফ্লপি, CD রম, পেনড্রাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এইভাবে শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে নিজস্ব ব্যক্তি লাইব্রেরি নির্মাণ করতে পারে।

(ii) **শিক্ষার্থীদের নিকট কম্পিউটার আত্মনির্দেশনার একটি ভালো উৎস :** বর্তমান যুগে কম্পিউটার শিক্ষক, টিউটর এবং শিক্ষানির্দেশক-এর সমন্বিত রূপ। একজন শিক্ষার্থী তার নিজের চেষ্টাতে কম্পিউটারের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ, ধারণা গঠন, দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগের বিভিন্ন দিকে সার্থকভাবে সাফল্যলাভ করতে পারে। কম্পিউটার একটা স্বল্প পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ে একজন অথবা একদল শিক্ষার্থীকে শিক্ষার নানা দিকে সাহায্য করতে সক্ষম। বস্তুত, কম্পিউটার আধুনিক যুগে এমন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা একজন শ্রেণি-শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, উত্তর প্রদর্শনকারী এবং পরিচালক বা নির্দেশক-এর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

(iii) **প্রতিকল্প ও খেলাচ্ছলে শিক্ষাদান :** আধুনিক কালে কম্পিউটার জগতে বহু রকমের software programme সহজলভ্য হয়ে গেছে যেগুলি শিক্ষার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করেছে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুসারে জ্ঞান-বোধ প্রয়োগ-দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এইভাবে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য বজায় রেখে মূল বিষয়ের কিছু অংশ কাটছাঁট করে প্রতিকল্পের (simulation)-আকারে উপস্থাপন করার মাধ্যমে শিখন সংঘটিত হচ্ছে। এই ধরনের শিখন প্রতিকল্প-শিখন বা simulated learning নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে নানা রকম খেলাচ্ছলেও শিক্ষার্থীরা শিখনের সুযোগ পাচ্ছে।

(iv) **শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং পেশাগত উন্নয়নে কম্পিউটার :** বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তির সুবাদে প্রচুর পরিমাণ তথ্য, পঠন সামগ্রী, শিক্ষণ পদ্ধতির নানা বিষয়

Scanned with CamScanner

সহজলভ্য হয়েছে। শিক্ষক ইচ্ছা করলে তাঁর শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে আরও বেশি আধুনিক ও তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য, পেশাগত উন্নয়ন ঘটাবার লক্ষ্যে সর্বাধুনিক তথ্য, পদ্ধতি-প্রকরণ সামগ্রী, গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারেন কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে।

(v) **গতানুগতিক শিক্ষণমূলক প্রদীপনের বিকল্প ব্যবস্থা নির্মাণ :** এই একুশ শতকের গোড়াতেও আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি প্রাচীন এবং গতানুগতিক প্রকৃতির। অথচ এই সমস্ত গতানুগতিক শিক্ষণ প্রদীপনের স্থানে নতুন নতুন প্রদীপনের আমদানি ঘটাতে সক্ষম কম্পিউটার প্রযুক্তি। শিক্ষক তার শিক্ষাদান কার্যে প্রয়োজন মতো ভিডিয়ো, অডিয়ো সিডি, স্লাইড ও টেক্সট-এর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, লিখিত সামগ্রীর প্রক্ষেপণ ইত্যাদির দ্বারা বড়ো আকারের স্ক্রিনে প্রদর্শন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ-শিখন কার্যকালে আরও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে কম্পিউটারকে কাজে লাগাতে পারেন, যেমন—শিক্ষার্থীদের সংশোধনমূলক শিখন, শিক্ষার্থীদের স্বশিখন, দলগত শিখন, লাইব্রেরি ও প্রোজেক্ট ওয়ার্ক কমিউনিটি রিসোর্সকে ব্যবহার করার জন্য কম্পিউটারের সাহায্য নিতে পারেন।

✪ ৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন (Improvisation of Teaching Aids) :

❑ ৩.৪.১ ভূমিকা (Introduction) :

শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে সফল করার জন্য আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র শিক্ষণ প্রদীপনকে ব্যবহার করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। ভারতীয় শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪-৬৬) এই শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা যেখানে খুব বেশি অথচ বেশিরভাগ মানুষ একদিকে নিরক্ষর অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য খুব কম সেখানে শিক্ষণ প্রদীপন জোগাড় করা বেশ সমস্যার ব্যাপার। বিশেষ করে, অনুন্নত গ্রামাঞ্চলগুলিতে এই শিক্ষণ প্রদীপনের প্রাচুর্য আশা করা বিলাসিতা। আবার আর এক দিক থেকে দেখা যায় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু (পাঠ্যসূচি অনুসারে) ভিত্তিক শিক্ষণ প্রদীপন সব সময় সহজলভ্য নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় দুর্লভ। এক্ষেত্রে শিখন উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন বা নির্যাস (improvisation) যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যাগুলিকে দূরে ঠেলে যদি যথার্থ শিক্ষণের পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়, তাহলে শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষণ প্রদীপনের এই তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনকে মর্যাদা দিয়ে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যেতে পারে যাতে সকলেই সম্মিলিত ভাবে সহযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষণ প্রদীপনের

তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের বিষয়টিতে নিশ্চিত করতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের সেই বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

❑ ৩.৪.২ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Improvised Teaching Aids) :

তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল—

(১) **তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণ :** শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও দরকারি এমন শিক্ষণ প্রদীপন প্রয়োজন অনুভব করেন যা প্রচলিত বাজারে সহজলভ্য নয়, অথবা আদৌ যাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে ওই চাহিদা পূরণ করার জন্য শিক্ষক স্বচ্ছন্দে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষাপ্রদীপনটি উদ্ভাবন করতেই পারেন।

(২) **কাঁচামালের সহজলভ্যতা :** শিক্ষণ প্রদীপনটির তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের জন্য যে সমস্ত কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সেগুলি সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশে সহজেই পাওয়া যায়।

(৩) **স্বল্প মূল্যের কাঁচামাল :** কাঁচামালের পর্যাপ্ততার কারণে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালটি খুব কম দামেই সহজেই পাওয়া যায়, এতে অর্থের সাশ্রয় হয়।

(৪) **সময় সাশ্রয় :** তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনগুলির জন্য সময় খুব বেশি লাগে না। সাধারণত অবসর সময়েও তা নির্মাণ করা যায়। ফলে সময়-এর সাশ্রয়ও হয়।

(৫) **নির্ভুল ও নিরপেক্ষতা :** বাজারে কেনা শিক্ষণ প্রদীপনে অনেক ক্ষেত্রে ভুল থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। বাণিজ্যিক ভাবে নির্মিত ঐ শিক্ষণ প্রদীপনগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্যার তৈরি করে। কিন্তু শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের নিজে দাঁড়িয়ে শিক্ষণ প্রদীপনের উদ্ভাবন করতে সাহায্য করলে সেটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভুল থাকে এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায়।

(৬) **চিন্তন ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করা :** শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন বা নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরের চিন্তনক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে তোলে।

(৭) **শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী :** শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের একটি বিশেষ দিক হল তা শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের বয়স অনুযায়ী, তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী উদ্ভাবনের সুযোগ বলে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

Scanned with CamScanner

(৮) **উৎপাদন পদ্ধতি সরল প্রকৃতির :** শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের পদ্ধতি বেশ সরল প্রকৃতির, এখানে কোনো জটীল প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করা হয় না।

(৯) **বিশেষ ধর্মী প্রযুক্তিগত দক্ষতা লাগে না :** শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতেই শিক্ষণ প্রদীপন উদ্ভাবন করতে পারেন, এখানে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর কারোরই তেমন কোনো বিশেষধর্মী প্রযুক্তিগত দক্ষতা লাগে না।

(১০) **তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় :** শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর সুযোগ লাভ করে।

❑ ৩.৪.৩ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ পদ্ধতি (Process of Developing Improvised Teaching Aids) :

স্বল্প মূল্যে অথবা শূন্য মূল্যে শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণের পদ্ধতিতে কয়েকটি পর্যায় বা স্তর অনুসরণ করা হয়। সেই পর্যায়গুলি হল—

(১) উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulation of objectives)
(২) পরিকল্পনার নক্শা প্রস্তুতিকরণ (Preparation of Design of Teaching Aid)
(৩) প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ (Collecting the required material)
(৪) শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণ (Constructive of Teaching Aid)
(৫) নির্মিত শিক্ষণ প্রদীপনের প্রাথমিক পরীক্ষণ (Pilot testing of the Improvised Teaching Aid)
(৬) শিক্ষণ প্রদীপন নির্মানে চূড়ান্ত রূপদান (Finalization of Production of Teaching Aid)
(৭) শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ এবং বিতরণ (Production and Distributration of Teaching Aid)

এবার পর্যায়গুলি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব :

(১) **উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulation of objectives) :** শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের প্রস্তুতি, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকে মাথায় রেখে শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণের উদ্দেশ্যটি প্রথম স্থির করার দরকার হয়। উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনটিকে তারা যাতে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে সেই বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়।

(২) **পরিকল্পনার নক্শা প্রস্তুতিকরণ (Preparation of Design of Teaching Aid) :** স্বল্প মূল্যের বিভিন্ন উপকরণ এর সমন্বয়ে কীভাবে শিক্ষণ প্রদীপনটি নির্মাণ করা যেতে পারে সেই ব্যাপারে একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। শিক্ষণ

প্রদীপনটি নির্মানের খরচ, প্রাসঙ্গিকতা এবং স্থানীয়ভাবে উপকরণ সংগ্রহের সহজলভ্যতা আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হয়।

(৩) **প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ (Collecting the required material) :** স্থানীয় পরিবেশে সংগ্রহ করা যেতে পারে এমন সব উপকরণ-এর একটি তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলি সংগ্রহ করার কাজটি সম্পূর্ণ করতে হয়। যদি কোনো উপকরণ স্থানীয় পরিবেশে না পাওয়া যায়, তবে তার বিকল্প উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়।

(৪) **শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণ (Constructive of Teaching Aid) :** শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনার ক্ষমতা, দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষণ প্রদীপনটি এবার নির্মাণ করা দরকার। নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

(৫) **নির্মিত শিক্ষণ প্রদীপনের প্রাথমিক পরীক্ষণ (Pilot testing of the Improvised Teaching Aid) :** কাঙ্খিত শিক্ষণ প্রদীপনটি নির্মাণের পর শিক্ষক সেটিকে যাচাই করে দেখবেন, সেটি যথোপযুক্ত হয়েছে কিনা, শিক্ষণ কার্য পরিচালনা বা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে পূরণ করতে পারবে কিনা। প্রাথমিক পরীক্ষণ বা যাচাই করার পর প্রয়োজনীয় উন্নতিসাধন করার চেষ্টা করবেন।

(৬) **শিক্ষণ প্রদীপন নির্মানে চূড়ান্ত রূপদান (Finalization of Production of Teaching Aid) :** প্রাথমিক পরীক্ষণ বা যাচাই এর পর নির্মিত শিক্ষণ প্রদীপনটির ত্রুটি বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে সেটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়। এবার শিক্ষণ প্রদিপনটির নির্মাণের চূড়ান্ত রূপদান করা হয়।

(৭) **শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ এবং বিতরণ (Production and Distributration of Teaching Aid) :** চূড়ান্ত রূপদানের পর শিক্ষণ প্রদীপনটি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞায় নির্মাণ করে সেগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনটির গ্রহণযোগ্যতা বেশি হলে পর্যাপ্ত সংখ্যায় নির্মাণ করে সেগুলি পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিকটও বিতরণ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

❑ ৩.৪.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষণ প্রদীপন তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের গুরুত্ব (Importance of Improvised Teaching Aids in Teaching Education) :

আজকের এই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও একটি শিক্ষামূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা বা গুরুত্বকে অধিকার করার উপায় নেই। শিক্ষাবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে যেখানে শিক্ষণ প্রদীপন সাধারণভাবে

Scanned with CamScanner

পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে শিক্ষণ প্রদীপন উদ্ভাবনে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। গুরুত্বের সেই দিকগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(i) অর্থনৈতিক গুরুত্ব
(ii) শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব
(iii) বিনোদনমূলক গুরুত্ব
(iv) সামাজিক গুরুত্ব
(v) সমাজবৈজ্ঞানিক গুরুত্ব
(vi) অনুবন্ধমূলক গুরুত্ব
(vii) ব্যবহারিক জ্ঞান মূলক গুরুত্ব
(viii) সৃজনমূলক গুরুত্ব
(ix) গবেষণামূলক গুরুত্ব
(x) সহযোগিতা মূলক গুরুত্ব

গুরুত্বের উপরোক্ত দিকগুলি সম্পর্কে এবার সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করা হল :

(i) **অর্থনৈতিক গুরুত্ব :** ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলি এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়েও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। এই পরিস্থিতি অতি স্বল্প খরচে বা শূন্য খরচে শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমন বিদ্যালয়ের অর্থ তহবিলের খরচকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই ধরনের স্বল্প মূল্যে বা শূন্য মূল্যে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনকে সহজে ব্যবহার করা যায়।

(ii) **শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব :** শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত পাঠ্য বিষয়বস্তুতে এমন কিছু বিষয়বস্তু আছে যেগুলি প্রকৃতিগতভাবে বিমূর্ত ধরনের। এই বিমূর্ত ধারণাগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট সার্থকভাবে তাদের উপলব্ধিতে আনা অনেক সময়েই বেশ কষ্টকর হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষক বিমূর্ত ধারণাটিকে অবলম্বন করে চার্ট, চিত্র, রেখাচিত্র প্রভৃতি ধারণা গঠনে সক্ষম হয়। সেদিক থেকে বলা যায় শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব অনেকখানি।

(iii) **বিনোদনমূলক গুরুত্ব :** শিক্ষা প্রদীপন তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকের সাথে একসঙ্গে চিত্তবিনোদনের সুযোগ পায়। অবসর সময়ে, এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে যে আনন্দ লাভের সুযোগ শিক্ষার্থীরা পায় তার বিনোদন মূলক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

(iv) **সামাজিক গুরুত্ব :** শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের কার্যটি সম্পন্ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে এবং শিক্ষকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে

কার্য সম্পাদন করে। এতে তাদের মধ্যে যে 'Wee feeling' বা আমরা মনোভাব' যৌথ অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করে, সামাজিক সুসম্পর্ক তৈরি হয়, সমাজজীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পায়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন এর সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

(v) **সমাজ বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব :** শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সমাজ জীবনের বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করার দরকার হয়। সমাজ সমীক্ষার পর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যদি চার্ট, রেখাচিত্র, লেখচিত্র নির্মাণ করতে হয় তাহলে শিক্ষার্থী সমাজ জীবনের বেশ কিছু কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিতিলাভের সুযোগ পায়। সুতরাং শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একটি সমাজ বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে।

(vi) **অনুবন্ধ মূলক গুরুত্ব :** বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শিক্ষা অনেকখানি সম্পূর্ণতা পায়। শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয়বস্তুর অন্তর্গত কোনো মহাপুরুষের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে যখন কোনো চার্ট, মডেল বা রেখাচিত্র নির্মাণ করা হয়, তখন তার সঙ্গে সম্পর্কিত ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলির সঙ্গে চার্টে প্রদর্শিত সংশ্লিষ্ট মহাপুরুষের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এতে বিকল্প বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ রচিত হয়ে যায়। সুতরাং শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন এর অনুবন্ধমূলক গুরুত্বও অনেকখানি।

(vii) **ব্যবহারিক জ্ঞান মূলক গুরুত্ব :** পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর না করে বস্তুকেন্দ্রিক এবং বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষার্থী পাঠের বিষয়বস্তুকে ব্যবহারিক কার্য সম্পাদনের দ্বারা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের সঙ্গে বোধ ও প্রয়োগের বিকাশ সাধন ঘটে।

(viii) **সৃজনমূলক গুরুত্ব :** শিক্ষার্থীকে কোনো বস্তুগত ধারণা দেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রকৃত বস্তুটিকে শিক্ষার্থীকে দেখাবার সুযোগ পান না, তখন তার অভাব মেটাবার জন্য প্রকৃত বস্তুটির অনুরূপ একটি মডেল নির্মাণ অথবা চিত্রাঙ্কন করার চেষ্টা করানো হয়, শিক্ষার্থীকে দিয়ে। শিক্ষার্থী তখন তার সৃজনী ক্ষমতার দ্বারা মডেল প্রস্তুত কিংবা চিত্রাঙ্কন ও রেখাচিত্র অঙ্কনের ব্যবস্থা করে। এইভাবে শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। সুতরাং এর সৃজনমূলক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

Scanned with CamScanner

❑ ৩.৪.৫ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণ ও কার্যকরী ব্যবহারে সমস্যা (Problems in the Development and Effective use of Improvised Teaching Aid) :

শ্রেণিশিক্ষণে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও সেগুলির নির্মাণ এবং কার্যকরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়। সেইরকম কতকগুলি সমস্যা এখানে উল্লেখ করা হল :

(১) **দীর্ঘ স্থায়ী নয় :** তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় না, কারণ সেগুলি নির্মাণ করা হয় স্থানীয়ভাবে হাতের কাছে যে সমস্ত কাঁচামাল পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে।

(২) **উৎস ও সুযোগ সুবিধার অভাব :** শিক্ষণ প্রদীপনগুলির নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সব সময় স্থানীয়ভাবেও সহজে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাপ্ত কাঁচামালগুলি শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণে কাঙ্খিত সুবিধা প্রদান করতে পারে না।

(৩) **সাধারণ দক্ষতার অভাব :** শিক্ষণ প্রদীপনগুলি নির্মাণের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ দক্ষতা না থাকলেও অন্তত সামান্য সাধারণ দক্ষতা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে সেটুকুও থাকে না। ফলে নির্মিত শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে ঠিকমত ব্যবহার করা যায় না।

(৪) **সঠিক ও নিখুঁত হয় না :** কাজ চালানোর মতো শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধারণ দক্ষতা বেশ কিছুটা অভাব মেলালেও বিশেষ দক্ষতার অভাবের জন্য তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনগুলি বহু ক্ষেত্রে সঠিক ও নিখুঁত হয় না, এতে নির্ভুল ফল পাওয়া দুষ্কর হয়।

(৫) **স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে সচেতনতার অভাব :** স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষণ প্রদীপন উদ্ভাবনের জন্য যে সচেতনতার প্রয়োজন তা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের এমনকি শিক্ষকের থাকে না।

(৬) **শিক্ষার্থীদের আগ্রহের অভাব :** স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত স্বল্প মূল্যের অথবা শূন্য মূল্যের কাঁচামালকে ব্যবহার করে শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণের জন্য যে ধরনের আগ্রহ শিক্ষার্থীদের থাকা দরকার অনেক ক্ষেত্রে তার অভাব লক্ষ করা যায়।

(৭) **উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব :** শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণের জন্য শিক্ষকের প্রাথমিক আগ্রহ, উদ্ভাবনী মানসিকতা, সৃজনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতা থাকা দরকার। কিছু প্রশিক্ষণও থাকা দরকার। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব আছে।

(৮) **প্রশাসনিক ও অন্যান্য বাধা :** বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যদি শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন করতে চায় তাহলে শুধুমাত্র শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-এর উদ্যোগ থাকলেই হবে না, সেই সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে যুক্ত ব্যক্তিদেরও যথেষ্ট

তৎপর ও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে তাদের তা থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয়, সম্পদের অপচয় বলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বাধাও দেওয়া হয়।

(৯) **সময়ের অভাব :** বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষায় পাঠক্রমের বোঝা বিদ্যালয় কার্যক্রমের ব্যস্ততার প্রেক্ষিতে বহুক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রদীপন নির্মাণে পর্যাপ্ত সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের থাকে না।

❑ ৩.৪.৬ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের দৃষ্টান্ত (Improvisation of Teaching Aids Example) :

◆ দৃষ্টান্ত-১

• **চার্ট তৈরি :** দৃষ্টি নির্ভর শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে চার্টের গুরুত্ব অনেকখানি। দর্শন অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের প্রদীপনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে এবং তাঁর পরিচালনায় সহজেই অল্প অর্থ ব্যয়ে এই চার্ট তৈরি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে চার্ট তৈরি করা যেতে পারে তা নিম্নে দেখানো হল।

পরিকল্পনা : যে বিষয় নিয়ে চার্ট তৈরি করা হবে সেই অনুসারে একটি পরিকল্পনা করে নিতে হবে। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার পর উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।

(১) **উপকরণ :** সাধারণত বড়ো আর্টপেপার বা কার্টিজ পেপার। আর্টপেপারটি হওয়া দরকার হালকা হলুদ বা সাদা রঙের। পেনসিল, স্কেচপেন, জল রং বা পোস্টার রং, তুলি, চিত্রাঙ্কনের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম, আঠা, ছুরি ও কাঁচি ইত্যাদি।

(২) **পদ্ধতি :** চার্ট তৈরির পদ্ধতি হিসেবে প্রথমে আর্টপেপারটির চারপাশে ১ ইঞ্চি মাপের মার্জিন দিতে হবে। এবার বিষয়বস্তু অনুসারে, ছবি অঙ্কন করতে হবে। চার্টের মধ্যে ছবি বা কোনো চিত্রকে অঙ্কনের জন্য প্রথমে ছোটো আকারের চার্ট তৈরি করে পরে তাকে অনুসরণ করে বড়ো আকারের চার্ট তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এপিস্কোপের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, অথবা ছোটো ছবিটির উপর গ্রাফ অঙ্কন করেও অনুসরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটি ছোটো চার্টে চিত্রের ওপর অনেকগুলি বর্গাকার অংশে ভাগ করে নেওয়া হয় এবং পরে অন্য একটি বড়ো চার্টে-বর্গাকার অংশগুলিকে ২ গুণ, ৩গুণ বা ৪ গুণ বড়ো করে। সমগ্র চিত্রটিকে বড়ো আকারে উপস্থাপিত করা সহজ হয়।

চার্টে যদি শুধু লেখা থাকে তাহলে বড়ো বড়ো করে সুন্দর হস্তাক্ষরে উপস্থাপন করতে হবে। লেখা অনুযায়ী রং ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে স্কেচ পেন ব্যবহার করতে হবে। একটিমাত্র কাগজ দ্বারা যেমন চার্ট প্রস্তুত হতে পারে, তেমনি আবার অনেকগুলি কাগজের

Scanned with CamScanner

অংশ নিয়ে একটি সামগ্রিক চার্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে। অবশ্য সমস্ত রকম চার্টের সাধারণভাবে গুণগত মান নির্দেশের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলিকে মান্যতা দেওয়া দরকার। সেগুলি হল :

(i) একটি আদর্শমানের চার্ট পেপারের সাইজ বা আকার হতে হয় ৯০ সেমি x ৬০ সেমি. বা ৭০ সেমি x ৫৫ সেমি।

(ii) চার্টের ওপর লেখা হরফগুলির সাইজ বা আকার হওয়া দরকার ২ থেকে ৩ সেমি। লেখার লাইনগুলির স্থূলত্ব হতে হবে ২ থেকে ৩ মি.মি.-এর মধ্যে।

(iii) লেখার হরফগুলি সরল প্রকৃতির এবং অলঙ্কার বর্জিত।

(iv) হালকা হলুদ, সবুজ এবং সাদা রঙের কাগজের চার্টের উপর গাঢ় কালো অথবা নীল অথবা লাল কিংবা কমলা রঙের হলে ভালো হয়।

(v) একটি মাত্র চার্টের মাধ্যমে একটি ধারণা বা নীতিকে স্থাপন করা উচিত। একটি মাত্র চিত্রের মধ্য দিয়ে হাজার শব্দের বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা থাকতে হবে। পাঠ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে চার্টের বক্তব্য অবশ্যই সমঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(vi) সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে চার্টে সারণি ব্যবহার করা দরকার।

(vii) শ্রেণি বিন্যাস, সংগঠন কিংবা প্রক্রিয়া সমূহ প্রধানত প্রবাহী রেখাচিত্রের মাধ্যমে চার্টে দেখানো দরকার।

(viii) চার্টের মধ্যে রঙের ব্যবহারে যথেষ্ট অর্থ সংগতি থাকতে হবে। প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছবির রঙ ব্যবহার করা উচিত যেমন— পাতার রঙ সবুজ, রক্তের রঙ লাল ইত্যাদি।

(ix) সামগ্রিকভাবে চার্টটি স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, আকর্ষণীয় এবং প্রয়াজন মতো বড়ো হওয়া দরকার।

(x) চার্টটিকে হতে হবে নির্ভুল এবং তথ্যের বাহুল্য বর্জিত এবং অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য।

(xi) চার্টের অপরের দিকে বিষয়বস্তুর নামকরণ করা থাকতে হবে।

(৩) চার্টে রঙের প্রতীকী ব্যবহার : চার্টে কোন রঙ ব্যবহার করা হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রঙের ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের ওপর আরোপিত হয় বিভিন্ন প্রতীকী অর্থ। এই প্রতীকী অর্থ যদিও সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভেদে এই প্রতীকী অর্থও অনেক সময় বদলে যায়। তথাপি যে সমস্ত রংগুলিকে সাধারণত একটা প্রতীকী অর্থের বর্তমানে মান্যতা দেওয়ার প্রচলন আছে সেই অনুসারে চার্টে রং ব্যবহার করাই উচিত।

◆ দৃষ্টান্ত-২

মডেল তৈরি : মডেল হল প্রকৃত বস্তুর একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপ। শ্রেণি শিক্ষণের প্রয়োজন অনুসারে কখনও এটি প্রকৃত বস্তুর অপেক্ষা বড়ো আকারের আবার কখনও প্রকৃত বস্তুর অপেক্ষা ছোটো আকারের করা হয়, আবার অনেক সময় সমান আকারেরও হয়। মডেল যেমন গঠনমূলক হয় তেমনি আবার কার্যকরী মডেল (working model) হয়। আমরা এখানে গঠনমূলক মডেল তৈরির বিষয়টি আলোচনা করব।

✦ মাটির মডেল তৈরি :

উপকরণ : পরিকল্পনা মতো যে মডেল তৈরি করা হবে সেই অনুসারে উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। কাঁচামাল হিসেবে মাটি, অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন—একটি কাঠের পাটাতন, হাতুড়ি, কাঠ বা ধাতুর তৈরি চামচ, ছাঁকনি বা চালুনি, বাঁশের ছড়ি, রং-তুলি ইত্যাদি।

• **মাটি নির্বাচন ও মন্ড প্রস্তুত :** বিভিন্ন মাটির মধ্যে এঁটেল মাটিকেই মডেল তৈরির জন্য নির্বাচন করা হয়। বাড়ির কাছাকাছি কোনো স্থান থেকে এই এঁটেল মাটি সংগ্রহ করতে হবে। আবার মাটিকে রোদ খাইয়ে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো মাটিটিকে এবার হাতুড়ি দিয়ে, মিহি করে গুঁড়ো করতে হবে। গুঁড়ো করা মাটিকে এবার চালুনি দিয়ে চেলে নিয়ে কাঁকড়, মোটা বালি, পাথরের টুকরো ইত্যাদি পৃথক করে নিতে হবে। গুঁড়ো এঁটেল মাটিতে এবার অল্প অল্প করে জল মিশিয়ে একটি কাদার মণ্ড প্রস্তুত করতে হবে। মণ্ডটি এমন নরম হতে হবে যাতে সেটিতে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে তাতে আঙুলের দাগ বসে কিন্তু আঙুলে মাটি না লাগে, অর্থাৎ চটচটে না হয়। মণ্ডটিকে এবার একটি ভেজা কিন্তু অতিরিক্ত জল বিহীন কাপড় দিয়ে ঢেকে একটি পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে মুড়ে রেখে দিতে হবে।

• **মডেল প্রস্তুত করণ :** মাটির যে মণ্ডটি প্রস্তুত করা হয়েছে সেটিকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মডেল বা প্রতিরূপ তৈরি করা হয়। মূর্তবস্তুতে পরিণত করে শিক্ষণ কার্যে ব্যবহার করার এই রীতিটি তুলনামুলকভাবে স্বল্প ব্যয় যুক্ত ও সহজসাধ্য। কাঙ্ক্ষিত মডেলটি প্রস্তুত করার জন্য দুটি প্রণালী সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়—(i) হাতের সাহায্যে মডেল প্রস্তুতি, (ii) ছাঁচের সাহায্যে মডেল প্রস্তুতি। এছাড়াও চাকের সাহায্যেও মডেল প্রস্তুতির কাজ হতে পারে, (যেভাবে কুমোরেরা মাটির হাড়ি, কলসি ইত্যাদি তৈরি করেন) কিন্তু শিক্ষার্থীদের নিকট তার প্রণালীটি কিছুটা কষ্টসাধ্য। আমরা এখানে দুটি প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

(i) হাতের সাহায্যে মডেল প্রস্তুত করণ : হাতের সাহায্যে বিভিন্ন মূর্তি, পশুপাখির অবয়ব, বিভিন্ন ফল, মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি তৈরি করা যায় সহজেই। হাতের সাহায্যে মডেল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায়ে সম্পন্ন হয় :

Scanned with CamScanner

প্রথম ধাপ : মাটির মণ্ডটিকে কাঙ্ক্ষিত যে বস্তুর প্রতিরূপ তৈরি করা হবে সেটি খুব নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গঠনগত ও আকৃতি বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করে মাটির মণ্ডটিকে একটি প্রাথমিক অবয়ব-এ পরিণত করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : প্রাথমিক অবয়বটিকে এবার বাঁশের ছুরি ও জল দিয়ে মডেলটির মূল অংশটিকে মসৃণ করে নিতে হবে। প্রকৃত বস্তুর সাথে তুলনা করে দেখতে হবে মডেলটি কতখানি প্রকৃত বস্তুর কাছাকাছি রূপ নিতে পেরেছে।

তৃতীয় ধাপ : মডেলটিকে এবার ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া হবে।

চতুর্থ ধাপ : কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাটির তৈরি মডেলটিকে শুকিয়ে নিয়েই শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি রং দিয়ে মডেলটিকে আরো বেশি মনোগ্রাহী বা আকর্ষণীয় করে তুলতে চাওয়া হয় তবে মডেলটির ওপর রং করা যেতে পারে। যে বস্তুর প্রতিরূপ তৈরি করা হচ্ছে, সেই বস্তুর মতো করে রং করতে হয়। এতে মডেলটির বাস্তবতা ও সৌন্দর্য উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

(ii) ছাঁচের সাহায্যে মডেল প্রস্তুত করণ : ছাঁচের সাহায্যে মডেল প্রস্তুতির জন্য প্রথমেই দরকার একটি মূর্তি যার প্রতিরূপ বানানো হবে। মূর্তিটির একটি ছাঁচ তৈরি করে নিতে হবে। এবার সেই ছাঁচকে ভালোভাবে শুকিয়ে অথবা আগুনে পুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর এই ছাঁচকে ব্যবহার করে বহু সংখ্যক মূর্তি সহজেই প্রস্তুত করা যায়।

ছাঁচ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কতকগুলি পর্যায় বা ধাপ অনুসরণ করা হয়। সেগুলি হল :

ধাপ-১ : মাটির তৈরি মণ্ডটিকে দুভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

ধাপ-২ : দ্বিতীয় ধাপে একখণ্ড কাপড়-কাচা সাবানকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে সেগুলি জলে গুলে নিতে হবে। এর সাথে সমান পরিমাণ নারকেল তেল মিশিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে।

ধাপ-৩ : এবার যে আকৃতির ছাঁচ তৈরি করা হবে তার গায়ে তেল সাবানের প্রলেপ দিতে হবে।

ধাপ-৪ : যে বস্তুটির আকৃতি নেওয়া হচ্ছে তার ওপরে মাটির তালটিকে চেপে ধরে ভালো করে আঙুলের সাহায্যে চাপতে হবে। এইসময় লক্ষ রাখা দরকার যাতে কাঙ্ক্ষিত মডেল বা প্রতিরূপটির সমস্ত অংশ (মূলত নাক, কান, চোখ ইত্যাদি) যেন খাঁজে খাঁজে বসে।

ধাপ-৫ : মাটি কিছুটা শুকনো মতো হলে (সাধারণত ৪-৫ ঘণ্টা বা ১ দিন) ওই বস্তুটি থেকে ছাঁচ বের করে নিয়ে কম রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিলে ভালো হয়। ছাঁচটি হবে বস্তুটির ঠিক উল্টো।

• **মডেল প্রস্তুতি :** এবার ছাঁচের সাহায্যে মূর্তি বা কোনো বস্তুর প্রতিরূপ তৈরির জন্য মাটি প্রস্তুত করে নিয়ে বেশ চেপে চেপে আঙুল দিয়ে টিপে ছাঁচটির ওপর বসিয়ে কিছু সময় পরে নতুন তৈরি মডেলটি ছাঁদ থেকে বের করে নিয়ে কয়েকদিন শুকিয়ে নিতে হবে অথবা পুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর প্রয়োজন ও ইচ্ছামতো রং করে নিয়ে মডেলটিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে হবে।

• **ভালো মডেলের শর্তাবলি (Criteria of a good model) :** একটি ভালো মডেলের জন্য কতকগুলি শর্তকে মান্যতা দেওয়া দরকার। সেগুলি হল :

(i) মডেলের গঠন শক্তপোক্ত হতে হবে যাতে সেটিকে পর্যাপ্তভাবে এবং খুশী বা ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়।

(ii) মডেলকে অবশ্যই প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সামগ্রিক আয়তন, আকার ও বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। যাতে প্রকৃত বস্তুটি সম্পর্কে ধারণা বা কার্যকারিতা সহজবোধ্য হয়।

(iii) ওয়ার্কিং মডেল বা কার্যকরী প্রতিরূপের কার্যপ্রণালী যাতে সঠিক ভাবে প্রদর্শিত হয় অর্থাৎ তার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং যথার্থতা থাকা দরকার।

(iv) মডেলটিকে যাতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায় তার সুযোগ বা পরিস্থিতি থাকতে হবে।

(v) মডেল বা প্রতিরূপটি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বয়স এবং মানসিক ক্ষমতার স্তর অনুসারে যথোপযুক্ত হতে হবে।

(vi) কার্যকরী মডেলের প্রণালী বা প্রক্রিয়াটি (process) যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরা করে দেখাতে পারে তার সুযোগও থাকা দরকার।

(vii) মডেলটিকে এমন একটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে মডেলের আকার, গঠন ও কার্যপ্রর্ণালী শিক্ষার্থীরা দেখতে পায়।

❂ ৩.৫ সমাজবিজ্ঞান (ইতিহাস) গবেষণাগারের পরিকল্পনা (Planning and Organisation of History Laboratory) :

বিকাশমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ এবং মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা, আগ্রহ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে একটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে ইতিহাস। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযোজিত করতে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সহায়তা করে এই ইতিহাস। এই কারণে ইতিহাসকে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বা পুঁথিগত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, তার ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের

Scanned with CamScanner

দৈনন্দিন জীবন এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োগমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত। এ জন্য ইতিহাসের শিক্ষককে শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতিতে শ্রেণিশিক্ষণ দিলেই হবে না গ্রহণ করতে হবে সক্রিয়তাভিত্তিক আলোচনা পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রোজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতি, ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং সমাজধর্মী শিক্ষণ ব্যবস্থা। সুতরাং ইতিহাস শিক্ষককে এই সমস্ত পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে সাহায্য নিতে হবে বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ও উপকরণের। স্বাভাবিকভাবে ইতিহাস শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিকট একটি ল্যাবরেটারি বা পরীক্ষা কক্ষের অত্যন্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের তাত্ত্বিক বিষয় পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ইতিহাসের কক্ষ বা History Laboratory-এর প্রাসঙ্গিকতা আছে।

❑ ৩.৫.১ ইতিহাস ল্যাবরেটারির অর্থ (Meaning of History Laboratory) :

ইতিহাস কক্ষ বলতে বোঝায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত এমন একটি কক্ষ যেখানে ইতিহাস পাঠদানের জন্য প্রাসঙ্গিক ও দরকারি শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ও উপকরণগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এটি এমন একটি কক্ষ যেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো এবং সময় অনুযায়ী সংরক্ষিত সামগ্রী ও উপকরণগুলিকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। তা ছাড়া এই ধরনের কক্ষে যেমন প্রথাগত তাত্ত্বিক বিষয় পাঠ পরিচালনার সম্ভব তেমনি ব্যবহারিক শ্রেণিশিক্ষণ কর্মও সম্পাদিত হতে পারে।

❑ ৩.৫.২ ইতিহাস ল্যাবরেটারির প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব (Need and Importance of History Laboratory) :

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানবিষয়গুলি এবং ভূগোল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পৃথক পৃথক ল্যাবরেটারি বা কক্ষ বিদ্যমান। কিন্তু অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানগুলির জন্য কোনো পৃথক ল্যাবরেটারি বা কক্ষ দেখা যায় না। অথচ ইতিহাস এমন একটি বিষয় যার সঙ্গে সম্পর্ক বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি বিষয়কে শিক্ষাদানের জন্য আজ ল্যাবরেটারি বা কক্ষের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিহাস ল্যাবরেটারি বা কক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়।

(১) ইতিহাস শিক্ষণে বর্তমানে বহু শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এইসমস্ত শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী এবং উপকরণগুলি একটি উপযুক্ত স্থানে সংগঠিতভাবে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় রাখার জন্য ইতিহাস ল্যাবোরেটারির প্রয়োজন আছে।

(২) ইতিহাস ল্যাবরেটারিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি ও উপকরণসমূহ সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার রাখার জন্য শিক্ষককে এগুলি একশ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে বহন করে নিয়ে আনার দরকার হয় না। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সময়, পরিশ্রম ও শক্তি খরচের সাশ্রয় ঘটে।

(৩) ইতিহাস ল্যাবরেটারির বিভিন্ন দেয়ালের বিভিন্ন অবস্থানে চার্ট, মডেল, চিত্র, ফটোগ্রাফ, মানচিত্র, রেখাচিত্র, লেখচিত্র, সময় রেখা, কার্টুন এবং পোস্টারগুলি স্থাপন করে অনুকূল শিক্ষণ শিখন পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ানো যায়।

(৪) বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক প্রদীপন বা সামগ্রী বিশেষ করে দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন, শ্রবণনির্ভর প্রদীপন, শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপনগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলকে জাগানো যায়, তাদের প্রেষণা সঞ্চার করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে অনেকখানি বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির গুরুত্ব ও প্রয়োজন কতখানি তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

(৫) ইতিহাসের সাধারণ শ্রেণি শিক্ষণকেও এই ল্যাবরেটারিতে পরিচালিত করে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব।

(৬) ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো সেমিনার, সেমিনার-কাম ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা সহজ হয় এই ইতিহাস কক্ষের।

(৭) ইতিহাসের কক্ষ বা ল্যাবরেটারিতে শিক্ষার্থীদের 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষণ' বা "Learning by doing" সম্পাদন করা যায়। 'মূর্ত থেকে বিমূর্ত' শিক্ষণের কার্য পরিচালনা করা যায়। তাছাড়া, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ের শিখনও শিক্ষার্থীদের এখানে অর্জন করা সম্ভব হয়। সেদিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞানাগারের প্রয়োজন অনেকখানি বলা যেতে পারে।

(৮) শিক্ষার্থীদের দলগত কার্য-সম্পাদন, প্রোজেক্ট ওয়ার্ক বা প্রকল্পমূলক কার্য-সহযোগিতামূলক শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি, স্বাধীনভাবে ব্যক্তি শিখন ও অনুশীলন, পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ব্যবহারিক কার্যসম্পাদনে এই ইতিহাস ল্যাবরেটারি বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(৯) ইতিহাসের কক্ষ বা ল্যাবরেটারিতে শিক্ষার্থীরা তাদের কাজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ও ভাবের আদান-প্রদান; বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যসম্পাদনের সুযোগ পায়। এর ফলশ্রুতিতে এই সমস্ত সুযোগসুবিধাগুলি শিক্ষার্থীদের গুণগতমানের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। তাদের মধ্যে সামাজিকভাবে দৃষ্টিভঙ্গি; যৌথ মানসিকতা,

Scanned with CamScanner

সহযোগিতামূলক মনোভাব, দলগত কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুণগুলি বিকাশ লাভ করে।

(১০) অনেক সময় আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণিকক্ষে প্রোজেক্টারের মাধ্যমে কোনো ছবি প্রদর্শন-এর মাধ্যমে শিক্ষণকার্য পরিচালনা করেন শিক্ষক। সেই সময় শিক্ষককে ঘর অন্ধকার রাখতে হয়। তাই এই ধরনের শিক্ষণকার্য পরিচালনার জন্য একটি পৃথক ইতিহাস ল্যাবরেটারির প্রয়োজন হয় এবং সেটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

❑ ৩.৫.৩ ইতিহাস ল্যাবরেটারির পরিকল্পনা (Designing of History Laboratory) :

চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিদ্যা ল্যাবরেটারির কথা আমরা জানি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূগোলের মতো সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়ের ল্যাবরেটারি ব্যবহারের বিষয়টি অবগত হতে পারি। কিন্তু অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলির ল্যাবরেটারির কথা খুব একটা শোনা যায় না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লিখিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই ল্যাবরেটারি ধারণাটি সীমাবদ্ধ না থেকে ইতিহাসের মতো সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ল্যাবরেটারির যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্ব পেয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সুবাদে বহু যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটারিতে স্থান পেয়েছে যেগুলি ইতিহাসে শিক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতিতেও এসেছে নতুন নতুন ধারণা। ইতিহাস আজ বহুমুখী কর্মধারায় বিস্তৃত। ইতিহাসের এই বহুমুখী কর্মধারা লক্ষ করে আমরা **"M.P. Moffatt** (1950)-এর মন্তব্যটি স্মরণ করতে পারি : "In modern education the class room has become a learning laboratory and greater emphasis is placed on students activities and participation in class room procedures." এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি আমাদের বর্তমান বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এমন এক ইতিহাস ল্যাবরেটারি দরকার যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের বহুমুখী কর্মসম্পাদনের সুযোগ পাবে এবং শিক্ষক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। **শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদনের বিভিন্ন দিকগুলি হল—**

(i) নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ যেখানে নির্দেশনামূলক কার্যসম্পাদন সম্ভব।
(ii) সামাজিক-ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য অ্যাসেম্বলি হলের ব্যবস্থা।
(iii) স্বাধীন অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণকার্য পরিচালনার জন্য স্থান।
(iv) দলগত কার্যসম্পাদন, সহযোগিতামূলক শিখন, প্রোজেক্ট ওয়ার্কের স্থান।
(v) আদান-প্রদানমূলক আলোচনা, সেমিনার, প্যানেল আলোচনা, ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ পরিচালনার স্থান।

(vi) সৃজনমূলক কর্মসম্পাদনের জন্য স্থান।
(vii) শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী বা শিক্ষামূলক প্রদীপন ও উপকরণ, প্রযুক্তিমূলক যন্ত্রপাতি নিরাপদে রক্ষণ-এর জন্য স্থান।

❑ ৩.৫.৪ ইতিহাস ল্যাবরেটারিতে যে সমস্ত শিক্ষামূলক সামগ্রী ও উপকরণ রাখা যেতে পারে (Type of Material and Equipment to be kept in a History Laboratory) :

শিক্ষামূলক যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের প্রদীপন এবং উপকরণ ল্যাবরেটারিতে রাখা যেতে পারে সেগুলি নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

(১) বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাসংক্রান্ত চিত্র, ফটোগ্রাফ, মানচিত্র, রেখাচিত্র, চার্ট, কার্টুন, পোস্টার, লেখাচিত্র এবং রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির দেয়ালে টাঙিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের শিখনে এগুলি যথেষ্ট আগ্রহ ও প্রেষণার সঞ্চার করে।

(২) চকবোর্ড, অন্যান্য কাঠের বোর্ড, প্লাস্টিক, কাপড় অথবা চৌম্বকবোর্ড দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। বুলেটিন বোর্ড এবং চৌম্বকবোর্ড বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করে।

(৩) ত্রিমাত্রিক গঠন বিশিষ্ট বিভিন্ন মডেল রাখা যেতে পারে।

(৪) দৃষ্টি ও শ্রবণ নির্ভর বিভিন্ন প্রকার প্রদীপন এবং বিভিন্ন হার্ডওয়ার যন্ত্রপাতি যেমন— ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, এপিডায়াস্কোপ, স্লাইড এবং ফিলম প্রোজেক্টার, ওভারহেড প্রোজেক্টার, টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোন, রেডিয়ো, টেলিভিশন, ভিডিয়ো ক্যাসেট, প্রোজেক্টার, টিচিংমেশিন বা শিক্ষণ যন্ত্র, ক্যামেরা, কম্পিউটার ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাইক্রোপ্রোজেক্টার ও সাউন্ড প্রোজেক্টারও রাখা যেতে পারে।

(৫) প্রোজেক্টার, শ্রবণ দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন এবং কম্পিউটারকে ব্যবহার করার জন্য প্রাসঙ্গিক সফটওয়ার রাখার ব্যবস্থা দরকার।

(৬) বিভিন্ন আকার-এর কাঠের খণ্ড, কাগজের শিট, গাম-আঠা, ছুড়ি, কাঁচি, হাতুড়ি, রং-ব্রাশ, কম্পাস, ড্রয়িং শিট, গ্রাফপেপার ইত্যাদি রাখা দরকার। এ ছাড়া থাকবে কাঠের স্কেল, থার্মোকল, পিচবোর্ড, মোমবাতি, দেশলাই ইত্যাদি।

(৭) পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, বুলেটিন, সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পেপারকাটিং ও বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের জন্য রাখা দরকার।

(৮) বিভিন্ন ধরনের ফাইল, ক্যাবিনেট বাক্স, আলমারি ও র‍্যাক ইত্যাদিও রাখা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 2

১। সম্পদ কাকে বলে? (What is Resource?)

২। শিখন সম্পদ কাকে বলে? (What is Learning Resource?)

৩। শিখন সম্পদের গুরুত্ব কী? (What is the importance of Learning Resource?)

৪। ভালো ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের গুণগুলি লিখুন। (Write the qualities of Good History Text Book.)

৫। সাধারণ বই ও রেফারেন্স বই-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference between Book and Reference Book.)

৬। স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণ-এর বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characterisitcs of self-Instructional Meterial?)

৭। প্রশ্নভাণ্ডার কী? (What is Question Bank?)

৮। শিখন প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণ বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by Teaching Aids and Appliances?)

৯। শিক্ষণ প্রদীপনের সংজ্ঞা দাও। (Give the definition of Teaching.)

১০। প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন ও প্রক্ষোপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। (Give the difference between projected and Non-Projected Teaching Aid.)

১১। সময়রেখার দুটি শিক্ষামূলক গুরুত্ব লিখুন। (Write two educational importance of timeline.)

১২। ইতিহাস শিক্ষাক্ষেত্রে মানচিত্রের গুরুত্ব কী? (What are the importance of map in History education.)

১৩। মিউজিয়াম শিক্ষামূলক উপযোগিতা লিখুন। (Write the educational implication of Museum.)

১৪। তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। (Write four characteristics of Improvised Teaching Aids.)

১৫। ইতিহাস শিক্ষণে শিক্ষণ প্রদীপন তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের গুরুত্ব কী? (What is the importance of Improvised Teaching Aids in teaching History?)

১৬। ইতিহাস ল্যাবরেটরি কী? (What is History Laboratory?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কী? (What is the need and importance of Text Book?)

২। স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণ বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by self-Instructional Material?

৩। শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। Write in brief the utility of Teaching Aids.)

৪। সময়রেখার শিক্ষামূলক গুরুত্ব কী? (What are the educational importance of timeline.)

৫। মিউজিয়াম-এর শিক্ষামূলক গুরুত্ব লিখুন। (Write the importance of Museum.)

৬। শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে মডেলের গুরুত্ব লিখুন। (Write the importance of Model as Teaching Aid.)

৭। মানচিত্রের শিক্ষামূলক গুরুত্ব লিখুন। (Write the educational importance of Map.)

৮। শ্রেণি শিক্ষণে ইতিহাস কক্ষের গুরুত্ব উল্লেখ করুন। (State the importance of History room in Classroom Teaching.)

৯। ইতিহাস পাঠ্য বই-এর শিক্ষামূলক গুরুত্ব কী? (What are the educational importance of History text book?)

১০। তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Describe in brief the characteristics of Improvised Teaching Aids.)

❑ রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি (Essay type questions) : Marks – 10

১। শিক্ষণ প্রদীপনের অত্যাবশকীয় গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Describe in brief the essential qualities of Teaching Aids.)

২। শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (Discuss in brief the classification of Teaching aids.)

৩। তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (Describe the process of developing improvised Teaching Aids.)

Scanned with CamScanner

৪। শিক্ষাবিকাশ শিক্ষণে শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের গুরুত্ব লিখুন। (Write the importance of Improvised Teaching Aids in Teaching Education.)

৫। ইতিহাস ল্যাবরেটারি কী? ইতিহাস ল্যাবরেটারি পরিকল্পনা বর্ণনা করুন। (What is History Laboratory? Describe the designing of History Laboratory?)

Thank You

Visit Our Educational Website

Regularly For More Update:

https://www.dascoaching.in/

Our Free Service

Free B.Ed EBook

Online Class

Edu Blogs

Contact Us On:

Facebook: fb/dascoaching.in

YouTube: DAS Coaching

Mail: contact.dascoaching@gmail.com

Follow on Dailyhunt Apps: DAS Coaching

Telegram: DAS Coaching

অধ্যায় 8

সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাসের) শিক্ষক
(Social Science Teacher)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৪.১ সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের (ইতিহাসের) যোগ্যতা ও গুণাবলি (**Qualifications and qualities of social science Teachers**)

৪.১.১ ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি (Important Qualities of Teacher according to National Knowledge Commission, 2008)

৪.২ সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন (**Professional Growth of the Social Science**)

৪.২.১ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন—ধারণা

৪.২.২ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব (Importan of professional development of Teacher)

৪.২.৩ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি (Type of Professional Development Programme)

৪.২.৪ ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি (Professional Development Programme of History Teacher)

৪.২.৫ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের সংস্থা (Agencies of Professional Development of Teacher)

৪.১ সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের (ইতিহাসের) যোগ্যতা ও গুণাবলি (Qualifications and qualities of social science Teachers) :

ভূমিকা : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড়ো ভূমিকা শিক্ষকের। তিনি হলেন শিক্ষার প্রধান রূপকার। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়া শিক্ষার ভবিষ্যৎ আদৌ উজ্জ্বল নয়। এ প্রসঙ্গে কোঠারি কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) প্রতিবেদনে প্রকাশ, "Of all the different factors which influences the quality of education and its contribution to national

Scanned with CamScanner

development : the quality competence and character of teachers are undoubtedly the most significant." ফরাসি ছাত্র আন্দোলনের মূল শ্লোগান হল—"No teacher, No future." শিক্ষকের নিপুণতা, আত্মবিশ্বাস ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমেই শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্ভব। **হেনরি অ্যাডামস** (Henry Adams)-এর মতে, "A good teacher affect eternity; he can nerve tell where his influenee stops." সুতরাং ভালো শিক্ষার জন্য ভালো শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভালো শিক্ষক হওয়া কঠিন কাজ। বিশেষ করে ভালো ইতিহাসের শিক্ষক হওয়া আরো কঠিন। কারণ ইতিহাসের শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকের থেকে পৃথক। ভলো ইতিহাস শিক্ষক হতে গেলে শিক্ষকের সাধারণ গুণাবলিগুলি ছাড়া কতকগুলি বিশেষ গুণাবলি অর্জন করতে হয়। এই গুণাবলিগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

★ পেশাগত গুণাবলি (Professional Qualities) :

(1) বিষয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য (Mastery in subject knowledge) :

শিক্ষণ (Teaching) বলতে বোঝায় দুটি বিষয়কে—বিষয় এবং যোগাযোগ দক্ষতা (Content and Communication). সুতরাং ইতিহাস শিক্ষকের ইতিহাস বিষয়ে গভীর জ্ঞান (Adequate knowledge of history) থাকা প্রয়োজন। জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকার পাশাপাশি শিক্ষকের স্থানীয় ও আঞ্চলিক (Local and Regional) ইতিহাস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয় ভালো ইতিহাস শিক্ষকের বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান (working knowledge of world history) থাকা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতবর্ষ কিংবা শিক্ষা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ শিক্ষা আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের যে-কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসের (world history) প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করলে তা বেশি অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে (Meaningful and significant). এছাড়া ভালো ইতিহাস শিক্ষকের বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক কালের (Current Affairs) ঘটনা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। এটি বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণের সহায়ক। এই কারণে শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স বুক (Reference Book), গবেষণা পত্রিকা (Research Journal of History) যেমন ইতিহাস অনুসন্ধান, সমধর্মী পুস্তক পাঠ কিংবা ইন্টারনেট সার্চ (Internet Search) প্রয়োজন। বিষয়ের গভীর জ্ঞান থাকলে শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস (Self Confidence) বাড়ে ও দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাদান করতে সমর্থ হয়।

(2) শিশুমনস্তত্ত্বের জ্ঞান (Knowledge of Child Psychology) :

শিক্ষণের মূল ভিত্তি হল মনস্তত্ত্ব। শিক্ষা হল মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। যে-কোনো বিষয়ে ভালো শিক্ষক (Successful Teacher) হতে গেলে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য এবং এটি

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সত্য। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, বিভিন্ন ধরনের চাহিদা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের ধারণা ও গ্রহণ ক্ষমতা, পরিণমন, আগ্রহ বা ঝোঁক বিভিন্ন রকমের হয়। ভালো ইতিহাস শিক্ষকের মনোবিজ্ঞানের এই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিষয়ের জ্ঞান সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে গেলে শিশু মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন এবং কার্যকরী ইতিহাস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান ভীষণভাবে সহায়তা করে।

(3) বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির জ্ঞান (Knowledge of Different Methods of Teaching):

প্রত্যেক বিষয় পড়ানোর কতকগুলি পদ্ধতি আছে। কোন্ পদ্ধতি এককভাবে সমস্ত বিষয় পড়ানোর উপযুক্ত, এছাড়া প্রত্যেক পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। ইতিহাসের বিভিন্ন ধরনের বিষয় বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। ইতিহাস শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং এই জ্ঞান থাকলে শিক্ষক মহাশয় অতি সহজে বিশেষ ক্লাসের বিশেষ পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে সমর্থ হন এবং শিক্ষণ সফল হয়। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল ও দক্ষতা (Teaching and skills) সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

(4) গল্প বলার দক্ষতা (A good story Teller) :

ইতিহাস শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল গল্পচ্ছলে শিক্ষাদান (Story Teching Technique)। গল্প বলা একটি শিক্ষণ ও শিল্প। বিশেষ করে নীচু শ্রেণির (Lower Classes) ইতিহাস শিক্ষাদানের একটি কার্যকরী পদ্ধতি হল গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দান। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অনায়াসে মনোযোগী করে তোলা যায়। তাই ভালো (Successful History Teacher) ইতিহাস শিক্ষকের কাছে গল্প বলার প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

(5) ভালো পরিকল্পনা প্রস্তুত করার দক্ষতা (Teacher as a good Planner) :

উত্তম শিক্ষণ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সঠিক পরিকল্পনা (Proper planning). সঠিক পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে শিক্ষণের কার্যকারিতা। তাই অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইতিহাসের শিক্ষককে ভালো পরিকল্পনা রচনাকারী (Good planner) হতে হবে। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার আগে শিক্ষণের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যর বাস্তবের জন্য গৃহীত পদ্ধতি ও কৌশল। ব্যবহৃত শিক্ষা প্রদীপন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্ক শিক্ষকের উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। কারণ "Without planning the teacher is just live a ship moving in the sea without any aim and destination."

Scanned with CamScanner

(6) সুসংগঠক হিসেবে শিক্ষক (Teacher as a good organisor) :

বর্তমানে পাঠ্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি এবং শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ইতিহাসের শিক্ষককে ঐতিহাসিক ভ্রমণ, বিতর্ক প্রভৃতি আয়োজন করার সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

(7) যোগাযোগ দক্ষতা (Teacher as a Good Communicator) :

শিক্ষা হল একটি যোগাযোগের প্রক্রিয়া (Communicative Process). এই প্রক্রিয়ার একদিকে থাকে শিক্ষার্থী এবং অপরদিকে থাকে শিক্ষক। এটি একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়া (Two way communication process)। পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শেখা-শেখানোর (Teaching-Learning) মান নির্ভর করে কার্যকরী (Effective Communication Process) যোগাযোগর ব্যবস্থার উপর অর্থাৎ শিক্ষকের ভালো যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills) উপর শিখন-শিক্ষণের কার্যকারিতা বা সাফল্য নির্ভরশীল। শিক্ষক ভালো বক্তা হবেন (good speaker)। তার কথা যেন সহজে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেন। শিক্ষক ভলো যোগাযোগ ক্ষমতার (good communicator) অধিকারী হলে শিক্ষার্থীরা নানাভাবে উপকৃত হয়।

(8) ভালো উপস্থাপক (To be a good presenter) :

ইতিহাসের শিক্ষকের বড়ো কাজ হল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা (creating interest-among the learner). শুধুমাত্র নিরস বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় না। কিংবা আগ্রহ ধরে রাখা যায়না। আমরা সকলেই বর্তমানে আগ্রহী অথচ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হল অতীতের। ইতিহাসের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা কঠিন কাজ। তাই ইতিহাস শিক্ষণকে কার্যকরী করে তুলতে হলে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের কাছে জীবন্ত করে তুলতে হবে (Bring history alive for their students) । ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি ও আগ্রহ ধরে রাখার জন্য ইতিহাসের শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে সচেষ্ট হবেন। এখানে তিনি শিক্ষা প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কার যথা ওভারহেড প্রজেক্টর (OHP), পাওয়ার পয়েন্ট (Power point presentation) প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারেন।

(9) নৃতত্ত্বের জ্ঞান (Knowledge of Anthropology) :

ইতিহাসের সঙ্গে নৃতত্ত্বের সম্পর্ক অতি নিবিড়। "Anthropology is living history." নৃতত্ত্ববিদ্যা নানাভাবে ইতিহাসকে সাহায্য করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিষয়ে। নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্যপ্রস্তর

যুগের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়। বিশেষ করে আদিবাসী উপজাতিদের ইতিহাস আজও ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসের মূল্যবান সম্পদ এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছ থেকে এদের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। এছাড়া নৃতত্ত্বের মাধ্যমে সমাজের নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্য অভ্যাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। তাই শিক্ষকের নৃতত্ত্বের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(10) ভাষা বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge about Philology) :

ইতিহাসের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক গভীর। যথার্থ ইতিহাস লেখার জন্য বা আয়ত্ত করার জন্য ভাষাবিদ্যা আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাস তথ্যনির্ভর। তথ্যের উৎস বা উপাদান বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রাথমিক উৎসগুলি (লিপি, মুদ্রা) নানা ভাষায় লিখিত (তামিল, পার্সি, সংস্কৃত, তেলেগু ও অন্যান্য ভাষা)। অনেক উপাদান আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের মূল উপাদানগুলির অধিকাংশ আরবি, ফার্সি, উর্দু ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত ভাষায় লিখিত উৎসগুলির যথাযথ পাঠ উদ্ধার করতে না পারলে প্রকৃত তথ্যনির্ভর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা বা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এটা শুধু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের ক্ষেত্রে নয়, সারা বিশ্বের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রে সত্য। সুতরাং শিক্ষকের ভাষাজ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের একাধিক বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়।

(11) প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞান (Knowledge about Archaeology) :

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিকট। ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্নতাত্ত্বিক বা অলিখিত উপাদান ও লিখিত বা সাহিত্যিক উপাদান। তুলনামূলক বিচারে ইতিহাস রচনার বিশেষ করে প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অনেক বিজ্ঞানসম্মত, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য দলিল হল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাহায্যে পৃথিবীর বহু প্রাচীন শহর, নগর, সভ্যতা ও অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। তাই শিক্ষকের প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়।

♦ ব্যক্তিগত গুণাবলি (Personal qualities) :

(1) জ্ঞান এবং শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোবাসা (Love for knowledge and Learner) :

শিক্ষক হবেন শিক্ষা অনুরাগী। তিনি শিক্ষাকে ও শিক্ষার্থীকে ভালো বাসবেন। শিক্ষা হল একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া (Life long process)। তাই শিক্ষক হবেন একজন ভালো

Scanned with CamScanner

পাঠক। যতদিন শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত থাকবেন ততদিন নিয়মিত পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "A teacher can never trully teach unless he is still learning himself. A lamp can not light another lamp unless it continues to burn its own flame." সমাজ বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে ইতিহাস হল জ্ঞানের বিকাশমান (developing subject) শাখা। সাম্প্রতিককালের গবেষণার মাধ্যমে বিষয় ও পদ্ধতি সংক্রান্ত (Content and Methology) যে নতুন জ্ঞান আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত সে সম্পর্কে শিক্ষকের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। তাই শিক্ষক হবেন আজীবন পাঠক (Continious Learner)। এর পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহশীল, আন্তরিক ও সংবেদনশীল হবেন।

(2) শিক্ষকের বিষয় এবং পেশার প্রতি ভালোবাসা (Love for his subject and profession) :

শিক্ষকতা হল একটি মহান পেশা (nobel profession)। অন্যান্য পেশা থেকে ভিন্ন। শিক্ষককে তার পেশাকে এবং তার বিষয়কে ভালো বাসতে হবে। নচেৎ কোনো শিক্ষক ভালো শিক্ষক হতে পারেননা। এটি ইতিহাসের শিক্ষকের ক্ষেত্রেও সত্য।

(3) সত্যানুসন্ধান (Love for Truth) :

ইতিহাস হল সত্যানুসন্ধান এবং ইতিহাসের শিক্ষক হবেন সত্যানুসন্ধানী। ইতিহাস হল তথ্য নির্ভর। পর্যাপ্ত তথ্যের সাহায্যে ঐতিহাসিক তথা ইতিহাসের শিক্ষক সত্য যা তাকে সেভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন (What actually past was)। সংকীর্ণ স্বার্থে, তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে শিক্ষা ব্যক্তিগত মতামত আরোপ করে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করবেন না। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের (Nation and community) ইতিহাসে জাতীয় বীরদের বিশেষ স্থান লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষে মধ্য যুগের ইতিহাসে আকবর, ঔরঙ্গজেব, শিবাজি, রানাপ্রতাপ সিংহ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত বীরদের কাহিনি উপস্থাপনের সময় শিক্ষক নিজেকে ধর্মীয় গোঁড়ামিতা বা অন্ধ ধর্মবিশ্বাস (dogmatic or fanatical) থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন।

শিক্ষকের নিজের ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক না কেন (হিন্দু কিংবা মুসলিম) তিনি একজন ভারতবাসী। বৃহত্তর স্বার্থে একই সঙ্গে আকবর, ঔরঙ্গজেব, শিবাজী, রানাপ্রতাপ সকলের মহত্ত্বকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। ইতিহাস যুগপৎ বিজ্ঞান ও কলা। তাই ইতিহাসের শিক্ষক ইতিহাসের সত্যকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরার (Express Truth Beautifully) চেষ্টা করবেন।

(4) বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর মনোভাব (Scientific and Healthy Attitude of the Teacher) :

ইতিহাস হল বিজ্ঞান এবং ইতিহাস শিক্ষকের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি হবে বিজ্ঞানসম্মত (History Teacher must adopt the attitude of a scientist)। ইতিহাসের শিক্ষক হবেন মুক্তমনের (Open Minded) এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে প্রসারিত (A broad out look)। তিনি যে-কোনো ধরনের পূর্ব সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস বা পক্ষপাত থেকে মুক্ত হবেন—তিনি জাতীয়, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক (National, Religious or communal and Regional) সমস্ত রকমের পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকবেন। ইতিহাস হল তথ্যনির্ভর। তাই কোনো বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার উপযোগী তথ্য পাওয়া না, গেলে শিক্ষক কখনোই নিজের মতামত শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেবেন না।

এক্ষেত্রে তিনি নিজে Open Mind-এর অধিকারী হতে চেষ্টা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের Open Minded. হতে সহায়তা করবেন। ইতিহাস কার্যকারণে বিশ্বাসী, তাই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনার সময় তাদের নৈতিক চরিত্র ও ব্যক্তিগত জীবন (Moral qualities and personal life) অহেতুক আলোচনা না করে শিক্ষক শুধুমাত্র তাদের ঐতিহাসিক কার্যাবলির (Historical activities)-এর উপর আলোকপাত করবেন যার ঐতিহাসিক মূল্য বা গুরুত্ব আছে (Historical values)। সেই সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আলোচনা করবেন যাঁরা মানব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি সবকিছুর ভালো-মন্দ উভয় দিক তুলে ধরার চেষ্টা করবেন।

(5) ভালো শ্রোতা (A good Listener) :

শিক্ষক শুধুমাত্র ভালো বক্তা হবেন না। এর পাশাপাশি তিনি ভালো শ্রোতা হবেন (Good Listener)। তুর্কী প্রবাদে (Turkish proverb) বলা হয়—"If speaking in silver, then listening is gold." অর্থাৎ শিক্ষকের শোনার ধৈর্য্য থাকা প্রয়োজন। ভালো শ্রোতা হলে প্রচুর অনুরাগী (Fan and friend) ভক্ত জোটে। ভালো শ্রোতা হলে ভালো শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভালো শ্রোতা হওয়া উচিত (Should be a good listener)

৪.২.১ ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি (Important Qualities of Teacher according to National Knowledge Commission, 2008) :

ন্যাশনাল নলেজ কমিশন (২রা মে, ২০০৮), ভারত সরকার একজন সুশিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দিকগুলি উল্লেখ করেছেন---

Scanned with CamScanner

(১) **সমঅনুভূতি সম্পন্ন** (Empathy) : ইতিহাস শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সমভূতি অনুভূতি সম্পন্ন হবেন। শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে শিক্ষকের নিজের অনুভূতির মেলানোর জন্য তাঁকে হতে হবে নমনীয়। শিক্ষার্থীদের ভালো মন্দ, সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে।

(২) **ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি** (Positive mental attitude) : শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। নেতিবাচক মানসিকতা বর্জন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তু এবং ঘটনাবলিকে দেখতে হবে। সবকিছুর মধ্যে ভালো দিকও যে আছে তা উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষার্থীদের। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতা শিক্ষকের থাকতে হবে।

(৩) **পরিবর্তনে মুক্তমনা** (Open to change) : জীবন ও জগত স্থিতিশীল নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। এই বস্তুজগতে এবং মানবজীবনেও সেই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত। গতিশীলতাই জীবন। একজন ইতিহাস শিক্ষক সেই সত্যটি মেনে নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মনে রেখেও নতুন ধ্যান-ধারণা, নতুন ব্যবস্থা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সবসময় স্বাগত জানাবেন মুক্তমন নিয়ে।

(৪) **সৃজনশীল** (Creative) : সৃজনশীল এবং প্রেরণা সঞ্চারকারী শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারে উদ্বুদ্ধ করবেন। শিক্ষকের স্বাতন্ত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট এমনভাবে উপস্থাপিত করবেন যাতে বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাঁকে অনায়াসে খুঁজে নিতে পারে।

(৫) **রসবোধ সম্পন্ন** (Sense of humour) : একথা সকলেরই জানা যে রসবোধ সম্পন্ন শিক্ষক সহজেই শ্রেণিকক্ষের বাধাবিঘ্ন দূর করে পঠন-পাঠনের পরিবেশকে অনুকূল পরিস্থিতিতে আনতে সক্ষম। বিশেষ করে কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিতে হবে শিক্ষককে।

(৬) **উপস্থাপনে দক্ষতা** (Presentation skills) : শিক্ষকের এটা জানা আছে যে, শিক্ষার্থীদের দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল এবং সংবেদনশীল, সেই সঙ্গে তারা গতিধর্মী। শিক্ষক তাঁর পাঠ-উপস্থাপন কালে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। তাঁর বাচনভঙ্গি এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকের দেহের ভাষায় ফুটে উঠবে।

(৭) **প্রশান্তভাব সম্পন্ন** (calmness) : শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ আগ্রাসী, নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন এবং এমন সব আচরণ সম্পাদন করে যার মূলে কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকে। শিক্ষকের জানা দরকার যে, এইসব শিক্ষার্থীরা এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে যে, তার ফলশ্রুতি তাদের আচরণে প্রকাশ পায়। এ

ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে থাকবেন শান্ত, সংযত এবং সমগ্র পরিস্থিতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখবেন।

(৮) **শ্রদ্ধাশীল** (Respectful) : এই জগতে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে। সুতরাং শিক্ষার্থীদেরও একটা নিজস্ব স্থান আছে। শিক্ষক যেমন তাঁর পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, তেমনি তিনি তাঁর সহকর্মী বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দ্বারা তিনি সবার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

(৯) **প্রেরণা সঞ্চারকারী** (Inspirational) : প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু ক্ষমতা আছে যার দ্বারা সে জগতে নিজের স্থান করে নেয়। অনুরূপে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী আলাদা আলাদা হলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা থাকে যার দ্বারা তারা সাফল্য পেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতা, প্রকৃতি, রুচিকে উপলব্ধি করে তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তাদের মধ্যেও যে সুপ্ত প্রতিভা, দক্ষতা এবং ক্ষমতা আছে যেগুলির প্রকাশ ঘটাতে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করবেন।

❂ ৪.২ সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন (Professional Growth of the Social Science Teacher) :

ভূমিকা : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষক। No teacher, No future শিক্ষক ছাড়া কোনো শিক্ষা পরিকল্পনা সঠিকভাবে ফলপ্রসু হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে শিক্ষকের মানের উপর নির্ভর করে শিক্ষার মান। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ধারণা, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তনকে বাস্তব রূপদান করে শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাই ধারাবাহিক ভাবে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। **নলেজ কমিশনের মতে** (The knowledge commission, 2007), "The teacher is the single most import. Element of the school system and has stressed the need to substantially enhance teacher, professional capability, standing and commitment to education." কোঠারি কমিশনে সর্বপ্রথম শিক্ষক শিক্ষিকাদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরবর্তীকালে **দ্যা রিপোর্ট অফ দ্যা ন্যাশেনাল কমিশন অন টিচার** (1983-85), **জাতীয় শিক্ষানীতি** (১৯৮৬), **আচার্য, রামমূর্তি কমিটি** (১৯৯০), যশপাল কমিটির প্রতিবেদন (Learning without Burden, 1993), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম (DPEP),**সর্বশিক্ষা অভিযান** (২০০১-২০০২), **জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা** (NCF-2005), **শিক্ষক-শিক্ষণে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা** (NCFTF-2009), **ন্যাশনাল ফোকাস গ্রুপ অন টীচার**

Scanned with CamScanner

এডুকেশন (National Focus Group on Teacher Education-2006) প্রভৃতি সরকারি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও দলিলে শিক্ষকের পেশাগত জীবনের উন্নয়নের উপর জোর দেয়। সাম্প্রতিককালে (২০০৯-১০) **রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান** (RMSA, 2009) বলা হয় যে শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়নের জন্য কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

❑ ৪.২.১ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন—ধারণা :

Professional Growth বা Professional Developmetn কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হল পেশাগত উন্নয়ন। পেশাগত উন্নয়ন (Professional Development) কথাটি এসেছে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা (Management Education) ক্ষেত্র থেকে। Career Development শব্দটি থেকে Professonal Development শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক। শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদন ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হলেও পেশাগত উন্নয়ন শব্দটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলন ঘটে অতি সাম্প্রতিককালে। সাধারণভাবে শিক্ষার সামগ্রিক (শিক্ষার ধারণা, পাঠক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল) উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য যে প্রশিক্ষণ, আলোচনা চক্র, কর্মশালা প্রভৃতির কর্মসূচির আয়োজন করা হয় তা শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি নামে খ্যাত।

পেশাগত উন্নয়ন বিষয়টিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এর বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। নীচে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হল—

- **UNESCO :** defined as professional growth a teacher achieves as a result of gaining increased experience and examining his or her teaching systematically."
- **TALIS :** "Professional development is defined as activities that develop an individual is characteristics as a teacher."
- **(Clarke and Hollings worth, 2002, Gressman, 1992, kagan, 1992, Ross and Bruce, 2007)**
  "Professional growth is defined as changes in the performance, knowledge, view or perceptions of teachers."
- **Joyce et. al (1976, P.6) :** defined professional development as "formal and informal provision for the improvement of educators as people, educated persons and professional as well as, inform of the competence to carryout their assigement."
- **Gall and Renchler (1985, P.6) :** described professional development more specially as "efforts to improve teacher is capasity to function as effective professionals by having them learn new knowledge, attitudes and skill."

- **Fullan (1995, P. 265) :** defined professional development as "the sum total of formal and informal learning pursued and experienced by the teacher in a compelling learning environment under conditions of complexity and dynamic change.
- **Agnihotri et. al (1994, P. 122) :** "Teacher's professional development was conceired as gradual, on going interactive and collaborative process of change."
- **Day (1999, P, 27) :** Professional development consists at all naturall learning experience and those concious and planned activites which are intended to be of direct on indirect benefit to the individual, group, school, which constitute, through these, to the quality of education in the classroom. It is the process by which, alone and with others, teacher review, renew and extend their commitment as change agents to the moral purposes of teaching and by which they acquire and develop critically the knowledge, skills and emotional intelligence essential to good professional thinking, planning and practice with children, young people and colleges throughout each phase of their teaching lives."

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে শিক্ষকতা হল একটি জটিল পেশা। এই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে গেলে নানা ধরনের জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতার প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র প্রাক-চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ (Pre-service Training) কর্মসূচি, যা যতই ভলো হউক না কেন, একজন শিক্ষকের সারাজীবনের পেশাগত জীবনের যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই গুণমান সম্পন্ন শিক্ষকের যোগান বজায় রাখা ও শিক্ষকের গুণমান বজায় রাখার জন্য কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকা উচিত (OECD, 2005)।

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি হল একপ্রকার প্রথাগত, অ-প্রথাগত বা প্রথাবর্হিভূত শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যা শিক্ষককে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে নিজের কার্যাবলি ও ভূমিকা সঠিক ভাবে পালন করতে সাহায্য করে। শিক্ষকদের এই পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি নানা ধরনের হয়। এটি প্রথাগত, অ-প্রথাগত ও প্রথাবর্হিভূত শিক্ষার মাধ্যমে হতে পারে। এটি বিদ্যালয়ের মধ্যে থেকে হতে পারে। বিদ্যালয়ের বাইরে অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে। বাইরে থেকে আয়োজিত কর্মশালা, আলোচনাচক্র, সম্মেলন, রিফ্রেসার বা ওরিয়েন্টেশন কোর্সের মাধ্যমে হতে পারে। পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নয়, এর দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষিকার শ্রেণি শিক্ষণের উন্নতি ঘটে। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও

Scanned with CamScanner

পেশার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এটি শিক্ষকের আত্মবিকাশের ও পেশাগত মর্যাদা বাড়ায় এবং পেশার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এর সাহায্যে পেশার সামনে বিভিন্ন সময়ে যে চ্যালেঞ্জগুলি আসে তা সহজে মোকাবিলা করতে পারে, শিক্ষকের পারদর্শিতা বৃদ্ধি করে ও দুর্বল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কার্যকরী শিক্ষক-শিক্ষিকা রূপে গড়ে তোলে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা পরোক্ষভাবে বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

❑ ৪.২.২ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব (Importance of professional development of Teacher) :

- সাম্প্রতিককালের নতুন তথ্য বা জ্ঞান আহরণ, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।
- দুর্বল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে এবং কার্যকরী শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।
- সামগ্রিকভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের দায়দায়িত্ব যথাযথ ভাবে এবং দক্ষতার সাথে পালন করতে সক্ষম হয়।
- শিক্ষক শিক্ষিকার পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- শিক্ষার নতুন ধারণা, নতুন ভাবধারা, নতুন দর্শন, নতুন শিক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল, নতুন পাঠ্যক্রম প্রভৃতির সাহায্যে পরিচিত হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ শিক্ষা পদ্ধতি পাঠক্রম, শিক্ষার ধারণায় সাম্প্রতিক যে পরিবর্তন ঘটেছে তা জানতে সাহায্য করে।
- সাম্প্রতিককালের গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়।
- শ্রেণিশিক্ষণে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জ্ঞান ও কৌশল লাভ করে।
- শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহারের জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত্ব করতে সাহায্য করে।
- শ্রেণি শিক্ষণ পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- নিজের বিষয়ের সাম্প্রতিক গবেষণার সাথে পরিচিত হয়।
- অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পায় এবং আদানপ্রদান করতে পারে।
- পেশার প্রতি অনুকুল মনোভাব ও আগ্রহ সৃষ্টি করে।
- বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনমূলক (Innovation) কার্যকলাপে আগ্রহী করে তোলে।
- এটি শিক্ষকের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

❑ ৪.২.৩ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি (Type of Professional Development Programme) :

শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়ন একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষক সমগ্র চাকুরিজীবনে পেশাগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই কর্মসূচিগুলি প্রথাগত, অ-প্রথাগত ও প্রথাবর্হিভূত হতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

Qualification Programme : আমাদের দেশে মুক্ত ও দূরশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা মুক্ত ও দূর শিক্ষার মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারেন। স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি, বিএড, এমএড, প্রভৃতি ডিগ্রি শিক্ষার্থীরা মুক্ত ও দূর শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে পেশাগত উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

Paricipation in Orientation and Refresher Course : পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষাপদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষার নতুন ভাবধারা কিংবা শিক্ষাসংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (শিক্ষা অধিকার আইন) প্রভৃতি বিষয়ের উপর **রিফ্রেসার** ও ওরিয়েন্টেশন কোর্স রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর, রাজ্য শিক্ষা ও গবেষণা পর্ষদ (SCERT), ডায়েট (DIET) কর্তৃক আয়োজন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই ধরনের কোর্সগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

Workshop : পাঠ্যক্রম রচনা, মূল্য প্রক্রিয়া, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য এই কর্মশালাগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

Education Conference of Seminor : আর্থ-সামাজিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবধারা আসে। শিক্ষায় নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় (Issues in Education) উদ্ভব হয়। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা সেমিনার বা কনফারেন্স আয়োজন করে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সেমিনার বা কনফারেন্সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

Individual on Collaborative Research : শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল গবেষণা। শিক্ষক শিক্ষিকা নিজের বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে কোনো গবেষণামূলক কার্যাবলি চালিয়ে যেতে পারেন। শ্রেণি শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সম্পাদনী গবেষণা (Action Research) করতে পারেন, এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা যৌথভাবে গবেষণামূলক কার্যাবলি চালাতে পারে।

Observation Visit to other school : কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্য বিদ্যালয় পরিদর্শন (Visit ot other school) বা পর্যবেক্ষণ করতে যেতে পারে। অন্য বিদ্যালয়ে যেসমস্ত ভালো অভ্যাসগুলির (Good Practice) সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং নিজেরা

Scanned with CamScanner

সেগুলি নিজের বিদ্যালয়ে অনুশীলন করতে পারেন। এছাড়া বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। (শিক্ষার সমস্যা, পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে)। অন্য বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পঠনপাঠন পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

Participation is a Network of Teacher/Teachers, Network : শিক্ষক-শিক্ষিকারা পেশাগত উন্নয়ন ও তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া সংগঠিতভাবে আদায় করার জন্য পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করেন। এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত বিভিন্ন মিটিং বা আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এখানে পেশাগত সমস্যা (Professional Problems) শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবন (Innovations), শিক্ষামূলক গবেষণা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে। এই আলোচনা পরোক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়ন ঘটায়।

Reading Professional Literature (Independent Learning) : স্ব-শিখন (Independent Learning) শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের একটি মাধ্যম। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রত্যেকে নিজের বিষয় সংক্রান্ত গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা সন্দর্ভ, রেফারেন্স বই নিয়মিত পড়তে পারেন। এছাড়া ইন্টারনেট ও সরকারি বিভিন্ন দলিল ও প্রতিবেদনগুলি (যেমন—NCF-2005, NCFTE-2009, RTE, Act, 2009, RMSA-2009) দেখতে পারেন।

Engaging in Informal Dialogue with peer : শিক্ষার বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন সমস্যা, কীভাবে পঠন-পাঠনের উন্নতি করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

ICT Training : শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করে। তাই বর্তমানে শ্রেণি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয় বা সংযুক্তিকরণ (Integration of ICT in Classroom) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। প্রযুক্তিবিদ্যা শিখন পরিবেশকে উন্নত করে ও শিক্ষার্থীর সাফল্যের (Achievement and Performance) ও পারদর্শিতার হার বৃদ্ধি করে। তাই শিক্ষক শিক্ষিকার (ICT) ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ (Training of ICT) একান্ত প্রয়োজন।

School Network : কোনো একটি জেলা/রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়গুলি একই ছত্রছায়ায় থাকবে। পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, গবেষণামূলক কার্যাবলি ও শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের অভিজ্ঞতা ও ভাবের আদানপ্রদান করার সুযোগ পাবে। এটি শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়নে সাহায্য করে থাকে।

Training on Use of Teaching Learning Material : শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়নের আর একটি মাধ্যম হল শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ।

কার্যকরী শিক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় শিখন সহায়ক উপকরণের। শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের যথাযথ ব্যবহার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তোলে। তাই শিক্ষণ-শিখন সহায়ক উপকরণ বা শিখন সম্পাদের উপযুক্ত ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

❑ 8.2.8 ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি (Professional Development Programme of History Teacher) :

(1) **শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি** (Increasing Qualification) : মুক্ত ও দূর শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগত ও পেশাগত (ইতিহাস) বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে যোগ্যতা বৃদ্ধি।

(2) **আলোচনা চক্র ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ** (Participation in Seminar and Conference) : ইতিহাস বিষয়ের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা আলোচনাচক্র ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করে। ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই আলোচনা চক্রে বা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। বছরে একবার করে জাতীয় ইতিহাস সম্মেলনে (National History Congress) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইতিহাসের শিক্ষক শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করতে পারে।

(3) **রিফ্রেসার ওরিয়েন্টেশন কোর্স ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ** (Participation in Refresher and Orientation Coursed and Workshop) : ইতিহাসের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবধারার সমাগম ঘটলে, সেই নতুন চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য রিফ্রেসার ও ওরিয়েন্টেশন কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া শিক্ষা সহায়ক উপকরণ তৈরি, পারদর্শিতার অভীক্ষা প্রস্তুত, পাঠ্যবই পর্যালোচনা, প্রভৃতি বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে নিজের পেশাগত উন্নতি ঘটাতে পারেন। এই কর্মশালা ও রিফ্রেসার ও ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইতিহাসের নতুন ভাবধারা ও উদ্ভাবনী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে।

কার্যকরী বা সম্পাদনী (Action Research) গবেষণা : কর্মরত ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পড়াতে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। এই সমস্যাগুলি নিয়ে কার্যকরী বা সম্পাদনী গবেষণা (Action Research) করা যেতে পারে।

- **স্বাধীন শিখন বা স্বশিখন (Independent Learning) :** শিক্ষা হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কারণ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সুতরাং শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত ধারাবাহিক ভাবে পড়াশোনার অভ্যাস থাকা দরকার। ইতিহাসের শিক্ষক তাঁর বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা (ইতিহাস অনুসন্ধান), জার্নাল, গবেষণা সন্দর্ভ (Ph.d. Thesis)

Scanned with CamScanner

নিয়মিত পড়তে পারেন এবং এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারেন। ফলে কর্মরত শিক্ষা-শিক্ষিকাগণ ইতিহাসের সাম্প্রতিককালের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

- **তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (Training on Effective Vre of ICT) :** তথ্য-প্রযুক্তি বিদ্যা ও শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। শ্রেণি শিক্ষণকে কার্যকরী করে তুলতে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অপরিহার্য।
- **সহকর্মীদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা (Informes Dialouge with other Teacher) :** ইতিহাস শিক্ষণ, ইতিহাস শিক্ষণের সমস্যা, ইতিহাসের মূল্যায়ন, ইতিহাসের পাঠ্যবই, ইতিহাসের পাঠ্যসূচি, ইতিহাসের বিতর্কিত বিষয় (Controvertial Issues) প্রভৃতি বিষয়ে ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদান করতে পারেন।
- ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতা সভায় অংশগ্রহণ।
- পাঠ্যবই পর্যালোচনা, ইতিহাসের পাঠ্যসূচি নির্মাণ, ইতিহাসের বিভিন্ন শিখন সম্পদ প্রস্তুত সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- সামগ্রিকভাবে সমাজ বিজ্ঞানে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত নতুন ধারণা, নতুন ধ্যানধারণা আসছে ও উদ্ভাবন ঘটছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা।
- ইতিহাস শিক্ষণ শিখন সহায়ক উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

❑ ৪.২.৫ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের সংস্থা (Agencies of Professional Development of Teacher) :

- **NUEPA :** National University of Education Planning and Administration.
- **NCERT :** National Council of Education Research and Training.
- **NCTE :** National Council of Teacher Education
- **RIE :** Regional Institute of Education
- **Teacher Organisation**
- **SCERT :** State Council of Education Research and Training
- **DIET :** District Institute of Education and Training
- **CTE :** College for Teacher Education
- University, Department of Education
- **Open and Distance Education :** Indira Gandhi National Open University, Netaji Open University

ebook.dascoaching.in

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 2

১। ইতিহাস শিক্ষকের চারটি ব্যক্তিগত গুণাবলি উল্লেখ করুন। (State four individual qualities of History Teacher.)

২। ইতিহাস শিক্ষকের চারটি পেশাগত গুণাবলি উল্লেখ করুন। (State four professional qualities of History Teacher.)

৩। ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতানুসারে শিক্ষকের যে-কোনো দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি লিখুন। (Write any two important qualities of Teacher according to National Knowledge Commission.)

৪। ইতিহাস শিক্ষকের নীতিবোধের চারটি দিক লিখুন। (Write four aspects of ethics of an History Teacher.)

৫। সহায়কের ভূমিকায় ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of History Teacher as a facilitator?)

৬। উপদেষ্টার ভূমিকায় ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of History Teacher as a mentor?)

৭। প্রেষণাসসঞ্চারকারী হিসাবে ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of History Teacher as a motivator?)

৮। শিক্ষকের পেশাগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলি কী কী? (What are the different aspects of professional growth of teachers.)

৯। উৎকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characterisitics of good teaching method?)

১০। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী? (What is the role of Government in professional growth of teachers?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। ইতিহাস শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Describe in brief the individual qualities of History Teacher.)

২। ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত গুণাবলির বিভিন্ন দিকগুলি উল্লেখ করুন। (Write the different aspects of professional qualities of History Teacher.)

Scanned with CamScanner

৩। ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতানুসারে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির দিকগুলি কী কী? (What are the different aspects of importantant qualities of teacher according National Knowledge Commission?)

৪। ইতিহাস শিক্ষকের নীতিবোধ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। (Write in brief the ethics of an History Teacher.)

৫। আধুনিক শিক্ষায় উপদেষ্টা হিসাবে ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of History Teacher in modern education as a mentor?)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

Marks – 10

১। ইতিহাস শিক্ষকের গুণাবলি বর্ণনা করুন। (Describe in brief the qualities of History Teacher.)

২। ইতিহাস শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলি আলোচনা করুন। (Discuss in brief qualification and qualities of History Teacher.)

৩। ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন বর্ণনা কর। (Describe in brief professional growth of History Teacher.)

অধ্যায় ৫

সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাসের) মূল্যায়ন
(Evaluation in Social Science Education)

❑ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৫.১ সমাজবিজ্ঞানে মূল্যায়নের হাতিয়ার ও মূল্যায়নের কর্মসূচি **(Evaluation devices, evaluation programme in social studies)**

৫.১.১ মূল্যায়নের হাতিয়ার (Evaluation devices)

৫.১.২ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) মূল্যায়নের কর্মসূচি (Evaluation programme in social studies)

৫.২ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন, নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন, গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন, নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন, মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা **(Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation, formative and summative evaluation, diagnose and remediation, construction of assessment tools like achievement test.)**

৫.২.১ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন (Competency based evaluation)

৫.২.২ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন (Continuous and comprehensive evaluation)

৫.২.৩ গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Formative and summative evaluation)

৫.২.৪ নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন (Diagnose and remediation

৫.২.৫ মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা (Construction of assessment tools like achievement test)

Scanned with CamScanner

৫.১ সমাজবিজ্ঞানে মূল্যায়নের হাতিয়ার ও মূল্যায়নের কর্মসূচি (Evaluation devices, evaluation programme in social studies) :

◆ মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation) :

আধুনিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মূল্যায়ন। অভিধানিক অর্থে মূল্যায়ন হল মূল্য আরোপের প্রক্রিয়া। এর দ্বারা কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর বা বিষয়ের পরিমাণগত ও গুণগত মূল্য নির্ধারিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ এবং মূল্যায়নের কাজ হল এই লক্ষ্য কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা বিচার করা। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা ঘাটতি সনাক্ত করা যায়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মূল্যায়ন শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মূল্যায়নকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—

● **টাইলার** (Ralph Tyler, 1950) : "এটা (মূল্যায়ন) হল একটি প্রক্রিয়া, এর দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা নির্ধারিত হয়।"

● **মুদালিয়ার কমিশন :** (Mudalior Commission 1950 - 52) "মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Scholartic Areas) অ-বৌদ্ধিক (Non-scholertic Areas) যথা মনোভাব, আগ্রহ, আদর্শ মূল্যবোধ, চিন্তন প্রণালী, স্বাস্থ্য বা দৈহিক বিকাশ, কর্ম উদ্দীপনা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলি প্রভৃতি দুটি ক্ষেত্রে সাফল্যের অগ্রগতি বিচার করে।"

● **জাতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ :** (NCERT, 1963) "মূল্যায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিতে কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে, শিখন অভিজ্ঞতা কতটা কার্যকরী ও ফলপ্রসু হয়েছে এবং পরিমাপ পদ্ধতিগুলি কতটা যথার্থতা বিচার করা যায়।"

● **কোঠারি কমিশন :** (Kothari Commission 1914 - 66) "এটি এখন স্বীকৃত যে মূল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক অঙ্গ এবং এটি শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত।"

● **বেঞ্জামিন ব্লুম :** (Benjamin Bloom) বেঞ্জামিন ব্লুমের মতে, শিক্ষার মূল্যায়ন হল ত্রিমুখী প্রক্রিয়া—শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন কৌশল মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক পরিবেশে (Teaching Learning Environment) শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা সার্থক করতে পেরেছে সেটি বিচার করা হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।"

● **মনোবিজ্ঞানী গ্রনল্যান্ড :** (Gronland) "মূল্যায়ন ব্যক্তি তথা শিক্ষার্থীর আচরণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনে বিবরণ দেয় এবং এই আচরণ কতটা প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত তা বিচার করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে মূল্যায়ন হল নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক ও বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া। এটি হল উদ্দেশ্যভিত্তিক বিচারকরণের প্রক্রিয়া। শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ এবং মূল্যায়নের কাজ হল শিক্ষার লক্ষ্য কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে বা শিক্ষার্থীদের দ্বারা এই লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা বা বিচার করা। আর শিক্ষার্থীদের সাফল্য ব্যর্থতার নিরিক্ষে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত বা কার্যকারিতা (শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রমের উপযুক্ততা, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনার কার্যকারিতা, শিখন সম্পদের যথার্থতা প্রভৃতি) বিচার করা যায়। মূল্যায়ন সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার সংশোধন ও উন্নয়নে সহায়তা করে।

◆ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Evaluation) :

(১) মূল্যায়ন একটি জটিল পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া (Evaluation is a complex and varied process)।

(২) মূল্যায়ন একটি বিজ্ঞানসম্মত ও নিয়মাবদ্ধ প্রক্রিয়া (Evaluation is a scientific and Systemetic Process)।

(৩) মূল্যায়ন প্রকৃতপক্ষে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Evaluation is actually a more continuous process), —যা শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিমাণগত ও গুণগত মানের প্রকাশ করে থাকে।

(৪) মূল্যায়নে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করা হয় (Evaluation approaches a person as a whole and attends to inter-related aspects of personality)। মূল্যায়ন এমন একটি সামগ্রিক পদ্ধতি, যা ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, চারিত্রিক নৈতিক প্রভৃতি সকল দিকের সঠিক পরিমাপ নির্দেশ করে থাকে।

Scanned with CamScanner

(৫) মূল্যায়ন ব্যক্তি-আচরণের পরিমাণগত ও গুণগত (quantitative and qualitative) উভয়দিকের মান নির্দেশ করে থাকে।

(৬) মূল্যায়ন হল একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়া (Triangular Process)। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের তিনটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives); (খ) শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা (Learning experience) এবং (গ) মূল্যায়ন কৌশল (Tools of evaluation)।

(৭) মূল্যায়ন শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষার লক্ষ্যে কতখানি পৌঁছাতে পারবে—তা নির্ধারণ করার একটি নিয়মাবদ্ধ প্রক্রিয়া হল মূল্যায়ন। (Evaluation – as a systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by pupils)। মূল্যায়নের একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমুখী করা। শিক্ষার পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কতখানি কার্যকরী হয়েছে তার সঠিক পরিমাপ নির্ধারণ করাই হল মূল্যায়নের প্রধান কাজ।

(৮) শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নই যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপ নির্দেশ করতে পারে এবং সমগ্র শিক্ষণ ও শিখন-প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করতে পারে।

❑ ৫.১.১ মূল্যায়নের হাতিয়ার (Evaluation devices) :

সাধারণ ভাবে কোনো কিছুর পরিমাপের কৌশলকে বলা হয় অভীক্ষা। অভীক্ষা হল একটি পরিমাপক পদ্ধতি। এখানে এমন কতকগুলি সুসংগঠিত পদ (Item) বা প্রশ্ন তালিকা যা পর্যায়ক্রমে কাঠিন্যের মাত্রা অনুযায়ী সাজানো হয় যার সাহায্যে ব্যক্তি তথা শিক্ষার্থীর আচারণের গুণগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তনকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। একক হল বিষয় বস্তু বা পাঠ্যসূচির একটি ক্ষুদ্র অংশ যা বিষয়বস্তু বা পাঠ্যসূচির একটি বিশেষ দিকের তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে পারে। তাই বলা হয়—"A unit is a subject of a syallabus given by the examination board."

অভীক্ষা গঠনের নীতি অনুযায়ী (principles of Test construction) অভীক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) এবং শিক্ষকের দ্বারা গঠিত অভীক্ষা (Teacher Made Test)। একক অভীক্ষা (Unit Test) এক ধরনের শিক্ষক নির্মিত বা শিক্ষক দ্বারা গঠিত অভীক্ষা। একক অভীক্ষা শিক্ষামূলক অগ্রগতি পরিমাপক এক ধরনের অভীক্ষা। সাধারণভাবে পারদর্শিতার অভীক্ষা শ্রেণিভুক্ত অভীক্ষা হল একক অভীক্ষা। এই নামটি দেওয়া হয়েছে পরিমাপের বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির ভিত্তিতে। সাধারণত সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য যে সমস্ত অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় সেগুলি কোনো পাঠ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ অংশকে অথবা পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের পরিপ্রক্ষিতে সামগ্রিক অগ্রগতিকে পরিমাপ করার চেষ্টা করে। একক

অভীক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিমাপযোগ্য বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি এত ব্যাপক হয়না। পাঠ্য বিষয়ের খণ্ডিত একটি একক। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা তাকেই বর্তমানে বলা হয় একক অভীক্ষা (Unit Test) শিক্ষাবিদ **রিমারস** এবং **গেজের** মতে (Remers and Gaze), "The tests which intend to measure the attainment of the pupil in a unit of study, are called unit test."

পাঠ্যসূচির (Syallabus) অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ধারণার সমন্বয় বা শিক্ষার্থীরা একত্রে অনুধাবন করতে পারে তাকেই বলা হয় পাঠ একক। পাঠ এককের দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতির কোনো সুনিশ্চিত সীমা থাকে না। কারণ একটি পাঠ একক কতকগুলি অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বয়স বা মানসিক পরিণমন এবং পাঠ্য বিষয়ের অধীত গভীরতার উপর (Depth of the study)। আর এই কারণে কোনো একটি পাঠ্য বিষয়ের একক অভীক্ষার দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে তার কেনো নিশ্চয়তা থাকে না। পাঠ এককের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি ও গভীরতার দ্বারা একক অভীক্ষার দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয়।

কোনো কোনো শিক্ষাবিদ এই একক অভীক্ষার শিক্ষক কেন্দ্রিক অভীক্ষা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তারা মনে করেন এই জাতীয় অভীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষণ কতটুকু কার্যকরী হয়েছে তা বিচার করা এবং শিক্ষকের কী করণীয় তা নির্ধারণ করা। N.C.E.R.T-এর মতে "The purpose of unit test is to measure the effect of teaching and learning respect to a unit of study, immediately following the teaching learning session." অর্থাৎ একক অভীক্ষা হল পাঠ একক ভিত্তিক এমন এক অভীক্ষা যার উদ্দেশ্য হল তাৎক্ষণিকভাবে শিখন ও শিক্ষণের প্রভাব পরিমাপ করা।

◆ একক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি :

একক অভীক্ষা এক ধরনের শিক্ষাগত অভীক্ষা হলেও সাধারণ শিক্ষাগত অভীক্ষার সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য আছে। একক অভীক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করলে তার উদ্দেশ্য ও প্রকৃত সাংগঠনিক রূপটি উপলব্ধি করা সহজ হবে। তাছাড়া একক অভীক্ষা গঠন করার সময় এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সচেতনতা শিক্ষককে সহায়তা করবে।

প্রথমত—শ্রেণিতে ব্যবহারের অভীক্ষা : একক অভীক্ষা এক ধরনের প্রথাবহির্ভূত অভীক্ষা। অর্থাৎ এই অভীক্ষা গঠনের সব নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয় না। এইগুলি আদর্শায়িত নয়। পরিমাপের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য এখানে এমন কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা হয় যা সব শিক্ষক ব্যবহার করতে পারেন এবং যার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ যে-কোনো শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য এই জাতীয় অভীক্ষা নির্মাণ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত—সংকীর্ণ বিষয়বস্তু : একক অভীক্ষার দ্বারা পাঠক্রমের স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিমাপ করা হয়। এদিক থেকে বিচার করলে অর্থাৎ বিষয়বস্তুর

Scanned with CamScanner

বিস্তৃতির কথা বিবেচনা করলে একক অভীক্ষাকে সংকীর্ণ অভীক্ষা বলা যেতে পারে। বিষয়বস্তু সংকীর্ণ হলেও পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ অভীক্ষায় পরিমাপের ক্ষেত্র বিস্তৃতি হলেও অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে অমিল থাকে।

তৃতীয়ত—অভীক্ষা পদ নির্বাচনের স্বাধীনতা : একক অভীক্ষার প্রশ্ন বা অভীক্ষা পদ নির্বাচনের কোনো বিধি নিষেধ থাকে না। যে-কোনো ধরনের প্রশ্ন শিক্ষক নির্বাচন করতে পারেন এই অভীক্ষা গঠনের জন্য। এদিক থেকে একক অভীক্ষা বেশি নমনীয় হয়ে থাকে। সাধারণ অভীক্ষা গঠনের ক্ষেত্রে এই নমনীয়তা থাকে না। সেখানে প্রত্যেকটি অভীক্ষা পদ নির্বাচনের পূর্বে তার যৌক্তিকতা বিচার করা প্রয়োজন হয়।

চতুর্থত—প্রস্তুতি অপ্রয়োজনীয় : একক অভীক্ষা ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুতি সময়ের প্রয়োজন হয় না। একক অভীক্ষা সাধারণত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য অভীক্ষা। সুতরাং এই অভীক্ষা প্রয়োগ করার জন্য সময় ও দিন পূর্বে ঘোষণা করা প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমত—স্বল্প সময়সীমা : একক অভীক্ষা প্রয়োগের সময় সীমাও তুলনামূলকভাবে বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের সাধারণ সময় তালিকার কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে এই অভীক্ষা ব্যবহার করা যায়। তাই অভীক্ষার দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিত যাতে সেটিকে ৩০ বা ৪০ মিনিটের একটি ক্লাসের মধ্যে প্রয়োগ করা যায়।

ষষ্ঠত—সহজ মূল্যায়ন ব্যবস্থা : একক অভীক্ষা এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে তার প্রয়োগের ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করা যায়। কারণ শ্রেণিকক্ষের ব্যবহৃত অভীক্ষা হিসেবে এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর পরবর্তী শিক্ষণ প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা এবং শিক্ষকের শিক্ষণ প্রচেষ্টার উন্নতি ঘটানো। তাই একক অভীক্ষার প্রশ্নগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয় এবং মান নির্ণয় করা হয় যাতে উত্তরপত্রগুলিকে দ্রুত মূল্যায়ন করা সম্ভব।

সপ্তমত—সীমিত উদ্দেশ্যে : একক অভীক্ষায় পরিমাপযোগ্য শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির সংখ্যাও সীমিত করা হয়। পরিমাপের জন্য শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্বাচনের স্বাধীনতা শিক্ষকের থাকে। সাধারণত ২-৩ টির বেশি শিক্ষণ উদ্দেশ্যে একটি একক অভীক্ষার পরিমাপ করা হয় না।

অষ্টমত—অনেকগুলি পরীক্ষা ব্যবস্থা : একক অভীক্ষাগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে এরকম অনেকগুলি অভীক্ষা প্রয়োগ করা যেতে পারে। গতানুগতিক ব্যবস্থায় আমরা শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি শিক্ষাবর্ষে দুই-তিন বারের বেশি পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারি না। তারজন্য শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে একক অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক অগ্রগতি পরিমাপক অভীক্ষা।

একক অভীক্ষার ও সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষার পার্থক্য :

একক অভীক্ষা	সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষা
১। একক অভীক্ষা সময় প্রথা-বহির্ভূত শ্রেণির অভীক্ষা।	১। সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষাগুলি প্রথাগত।
২। একক অভীক্ষায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক শিক্ষণ উদ্দেশ্য বিচার করা হয়।	২। এই অভীক্ষায় পাঠ্যসূচির সব শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলিকে পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
৩। এই অভীক্ষা প্রয়োগের সময়কাল সংক্ষিপ্ত।	৩। এই অভীক্ষা প্রয়োগের সময়কাল দীর্ঘ।
৪। এই অভীক্ষায় প্রশ্ন নির্বাচনে শিক্ষকের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।	৪। এতে প্রশ্ন নির্বাচনে শিক্ষকদের যথেষ্ট স্বাধীনতা কম।
৫। এই অভীক্ষায় একটিমাত্র পাঠ এককের জ্ঞান পরিমাপ করা হয়।	৫। এই অভীক্ষায় পাঠ্যসূচি বা পাঠক্রমের জ্ঞান পরিমাপ করা হয়।

◆ **একক অভীক্ষার উপযোগিতা :** শিক্ষাক্ষেত্রে একক অভীক্ষার উপযোগিতাগুলি হল—

(১) একক-অভীক্ষা শ্রেণিকক্ষের সাধারণ অবস্থায় ব্যবহারের জন্য নির্মিত অভীক্ষা। এই জাতীয় অভীক্ষা দ্বারা শিখন এবং শিক্ষণ উভয় ধরনের প্রচেষ্টারই কার্যকারিতা বিচার করা সম্ভব হয়।

(২) শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একক-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমগ্র পাঠসূচিতে অগ্রগতি অনুশীলন করা সম্ভব হয়।

(৩) একক-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যেমন বিচার করা যায় তেমনি একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতাগুলিও নির্ণয় করা যায়। অভীক্ষার ফলাফল বিচার করে শিক্ষক উপযুক্ত সংস্কারমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

(৪) কোনো একক অভীক্ষা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা শিক্ষককে তাঁর পরবর্তী পাঠ এককের শিক্ষণ পরিকল্পনা রচনায় সহায়তা করে।

(৫) একক-অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের কাজে প্রেষণা সঞ্চার করতে সহায়তা করে।

(৬) একক-অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই প্রয়োজনে নিজেদের উপর এই জাতীয় অভীক্ষা প্রয়োগ করে অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারে। এর ফলে তাদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগ্রত হয়।

(৭) একক-অভীক্ষাগুলি পরোক্ষভাবে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত গৃহকাজ নির্বাচনে সহায়তা করে। শ্রেণিতে পাঠ পরিচালনার পর শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য গৃহকাজ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এইসব কারণেই বর্তমানে একক-অভীক্ষা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

◆ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা বা প্রশ্নপত্র: রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা [Different Types of Question (Examination)] :

ভূমিকা: সাধারণত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—মৌখিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—রচনাভিত্তিক পরীক্ষা (Essay type examination) এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective type examination)। নীচে রচনাভিত্তিক পরীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

◆ রচনাভিত্তিক পরীক্ষা (Essay Type Examination) :

রচনাধর্মী পরীক্ষা হল একটি গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষর্থীদের কতকগুলি রচনাত্মক প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া হয়। প্রশ্নের উত্তরগুলি অনেক বিস্তৃত হয় (Lengthy)। এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ের উপর প্রবন্ধ বা রচনা লিখতে দেওয়া হয়।

- অশোককে মহান সম্রাট বলা হয় কেন? আলোচনা করো।
- মুঘল যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো।
- ইতালির ঐক্য আন্দোলনে ম্যাৎসিনি, ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডির ভূমিকার মূল্যায়ন।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির দায়িত্ব কতখানি ব্যাখ্যা করো।

▲ রচনাধর্মী প্রশ্নের শ্রেণিবিভাগ :

- **বর্ণনামূলক প্রশ্ন**—গুপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ দাও/পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা দাও।
- **বিচারকরণ জাতীয় প্রশ্ন**—"১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম"— যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- **তুলনামূলক প্রশ্ন**—পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা করো।
- **কার্যকরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন**—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করো।
- **সৃজনাত্মক প্রশ্নাবলি**—"ভারত বিভাজন অনিবার্য"—তোমার মতামত ব্যক্ত করো।
- **বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন**—"ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ" – বিশ্লেষণ করো।
- **শ্রেণিকরণ জাতীয় প্রশ্ন**—ইতিহাসের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করো।
- **সংক্ষিপ্তকরণ জাতীয় প্রশ্ন**—সংক্ষেপে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিবরণ দাও।

- **মূল্যায়ন ভিত্তিক প্রশ্ন**—সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির মূল্যায়ন করো।

উপরি উল্লিখিত ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের রচনাভিত্তিক প্রশ্ন হতে পারে।

▲ রচনাধর্মী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Essay type Examination) : রচনাধর্মী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল —

১। রচনাধর্মী পরীক্ষা হল একটি গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরগুলি অনেক বিস্তৃত হয়।

২। রচনাধর্মী পরীক্ষার সাহায্যে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান পরিমাপ করা হয় না; এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারকরণ ক্ষমতা, বোধগম্যতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, অন্যান্য শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়।

৩। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষামূলক-জ্ঞান ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

৪। এই পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। তারা স্বাধীনভাবে প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

৫। এই পরীক্ষার প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকে কিন্তু প্রশ্নোত্তরগুলি অনেক বেশি দীর্ঘ হয়।

৬। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা (creativity) এবং চিন্তন ক্ষমতা (thinking ability)-এর বিকাশ ঘটে।

৭। এই পরীক্ষার রচনাত্মক প্রশ্নগুলির অনেকগুলি অংশ থাকে। শিক্ষার্থী কোন্ প্রশ্নের অংশ লেখার জন্য কতটা সময় ব্যয় করবে তা বুঝতে না পারায় নির্ধারিত মোট সময়ের মধ্যে তার সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে না।

৮। রচনাধর্মী পরীক্ষা হল এক ধরনের শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা। ফলে এই ধরনের অভীক্ষার বা পরীক্ষার যথার্থতা (Validity) এবং নির্ভরযোগ্যতা (Reliality) সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়।

৯। রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর লেখা উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের কোনো আদর্শায়িত পদ্ধতি নেই। এর ফলে পরীক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর লিখিত প্রশ্নোত্তরের মান নির্ধারণ করে থাকেন। এই ধরনের পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থী কখনই লিখিত কোনো প্রশ্নোত্তরের জন্য পূর্ণমান পায় না। এই ধরনের অভীক্ষায় ব্যক্তিগত প্রভাব অনেক বেশি থাকে।

১০। রচনাধর্মী পরীক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। শিক্ষার্থীকে সেই সময়ের মধ্যে সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়।

Scanned with CamScanner

১১। এই ধরনের পরীক্ষায় কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ না-থাকায় শিক্ষার্থীরা অনেকেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পরিবর্তে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখে পৃষ্ঠার সংখ্যা বাড়িয়ে থাকে।

১২। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন-সংখ্যা কম হওয়ার ফলে পাঠ্যবিষয়ের সমগ্র অংশ থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করা যায় না। ফলে শিক্ষার্থীর সমগ্র পাঠ্যবিষয়ের অর্জিত জ্ঞান এই পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় না।

▲ রচনাধর্মী অভীক্ষার সুবিধা (Advantages of Essay-type Test or Examination): রচনাধর্মী পরীক্ষার সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

প্রথমত, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ খুব সহজে করা যায়। যে-কোনো বিষয়ে রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা এবং তার প্রয়োগ করা খুবই সহজ। পাঠ্যবিষয় থেকে কয়েকটি রচনাত্মক প্রশ্ন নির্বাচন করে শিক্ষক খুব সহজেই শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে। উত্তরের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনের সাহায্যে এবং আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার স্বাধীন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারে।

তৃতীয়ত, রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থী তার নিজস্ব যুক্তি, বিচারশক্তি ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করে থাকে। ফলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটে থাকে এবং তাদের সম্ভাবনাময় প্রতিভারও বিকাশ হয়ে থাকে।

চতুর্থত, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষামূলক জ্ঞান ও ভাষা ব্যবহার দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে। কোনো রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর কতখানি গুছিয়ে ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখেছে, এর মাধ্যমেই তার ভাষাজ্ঞান ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা প্রকাশিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যয়নের মাধ্যমে তাদের ভাষাজ্ঞান ও ভাষাপ্রকাশ দক্ষতার বিচার করতে পারেন।

পঞ্চমত, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতার (Creativity) বিকাশ ঘটে। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা যে কল্পনাশক্তি ও চিন্তনক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে, তার মাধ্যমেই তাদের সৃজনশীলতা প্রতিফলিত হয়।

ষষ্ঠত, রচনাত্মক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করতে সময় ও অর্থ যথেষ্ট কম লাগে। কারণ এই পরীক্ষায় মাত্র আট থেকে দশটা প্রশ্নের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

▲ রচনাধর্মী অভীক্ষার অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Defects of Essay-type Test or Examination) : রচনাধর্মী অভীক্ষার বা পরীক্ষার ত্রুটিগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) **যথার্থতার** (Validity) **অভাব :** কোনো পরীক্ষা বা অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য তৈরি করা হয়, যদি ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যই পরিমাপ করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে অভীক্ষা বা পরীক্ষাটির যথার্থতা আছে (The validity of a test refers to how well it measures what it claims to measure)। রচনাধর্মী পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভীক্ষাটি যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য তৈরি তা পরিমাপ না করে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে থাকে। যেমন—ইতিহাসের পরীক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর শুধু ইতিহাসের জ্ঞান পরিমাপ না করে তার হাতের লেখা, বানান ইত্যাদির মূল্যায়ন করে থাকেন। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষা বা অভীক্ষায় যথার্থতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। পরীক্ষার যথার্থতা না থাকলে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ করা যায় না।

(২) **নির্ভরযোগ্যতার** (Reliability) **অভাব :** কোনো পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হল সেই বৈশিষ্ট্য যা কোনো শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একটি সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা করে থাকে। কিন্তু রচনাভিত্তিক পরীক্ষায় কোনো সঙ্গতিপূর্ণ স্কোর বা তথ্য (consistent scores or information) পাওয়া যায় না। কোনো বিষয়ে পরীক্ষার্থীর লেখা একই উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষককে দিয়ে বিচার করতে দিলে বিভিন্ন নম্বর পাওয়া যায়। আবার একই পরীক্ষক কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র দুবার পরীক্ষা করলেও নম্বরের বৈষম্য দেখা যাবে। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার মধ্যে নির্ভরযোগ্যতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

(৩) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity)-**এর অভাব :** কোনো পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে বোঝায় যে, পরীক্ষাটি পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং বিষয়মুখী হবে। কিন্তু রচনাধর্মী পরীক্ষায় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব যথেষ্ট বেশি থাকে। কোনো বিষয়ে পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কত নম্বর পাবে তা নির্ভর করে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি, মেজাজ ও খেয়ালখুশির ওপর। তাই রচনাভিত্তিক পরীক্ষার যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব রয়েছে।

(৪) **প্রয়োগশীলতার** (Administrability) **অভাব :** কোনো বিষয়ে পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে তার প্রয়োগশীলতার ওপর। প্রয়োগশীলতা বলতে বোঝায় সহজ, সরল-প্রয়োগ পদ্ধতি। রচনাভিত্তিক পরীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি মোটেই সহজসাধ্য নয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর কী হবে তা অনেক সময় নির্দিষ্ট করা থাকে না। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব রয়েছে।

(৫) **তুলনীয়তার** (Comparability) **অভাব :** রচনাভিত্তিক পরীক্ষার সঠিক কোনো নর্ম (Norm) নেই। ফলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে কোনো তুলনা করা যায় না। বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বিভিন্ন রকম নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে তুলনা করে পারদর্শিতার সঠিক হার নির্ণয় করা যায় না। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার মধ্যে তুলনীয়তার অভাব রয়েছে।

(৬) **মুখস্থ-নির্ভর** (Stress on rote learning) : রচনাধর্মী পরীক্ষা অনেকখানি মুখস্থ নির্ভর। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের 5 থেকে 6টি প্রশ্নের রচনাত্মক উত্তর

Scanned with CamScanner

লিখতে হয়। শিক্ষার্থীরা কতকগুলি বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশের চেষ্টা করে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা যুক্তি, বোধগম্যতার চেয়ে মুখস্থবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করে।

(৭) **অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা** (Unhealty Competition) : রচনাভিত্তিক পরীক্ষা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক (Examination oriented) করে গড়ে তোলে। পরীক্ষায় পাশ করা কিংবা ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযাগিতামূলক মনোভাব দেখা দেয়। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য কোনো কোনো শিক্ষার্থী অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবর্তে হিংসার মনোভাব দেখা দেয়। এর ফলে এই ধরনের প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

(৮) **সামগ্রিক বিকাশের** (Total development) **পরিমাপ অসম্ভব** : রচনাভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়গত অর্জিত জ্ঞানের আংশিক পরিমাপ করা যায় মাত্র; তার চারিত্রিক ও অন্যান্য মানসিক গুণের পরিমাপ করা যায় না।

(৯) **সামগ্রিক পারদর্শিতার** (Total achievement) **পরিমাপ অসম্ভব** : রচনাভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোনো বিষয়ের সামগ্রিক পারদর্শিতা পরিমাপ করা যায় না। নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ের সামগ্রিক পারদর্শিতা পরিমাপ করা যায় না।

(১০) **সময়সীমার ত্রুটি** (Defects of Time limit) : রচনাভিত্তিক পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী সময়সীমা নির্ধারণ মোটেই বিজ্ঞানসম্মত হয় না। অনেক সময় পরীক্ষা দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর এত বেশি বিস্তৃত বা রচনাত্মক হয় যে নির্দিষ্ট তিন কিংবা চার ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষার্থীরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে অসমর্থ হয়।

(১১) **নম্বর দানের ত্রুটি** (Defect of Marking or Scoring) : রচনাভিত্তিক পরীক্ষায় নম্বর দানের কোনো সঠিক নির্দেশনামা থাকে না। শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা ও পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর লিখিত উত্তরের সংখ্যামান নির্ধারণ করে থাকেন। শিক্ষকভেদে শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রের সংখ্যামান বিভিন্ন হয়ে থাকে। নম্বরদানের ত্রুটির ফলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ সম্ভব হয় না।

উপরিলিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে রচনাধর্মী পরীক্ষায় এইসব ত্রুটি থাকলেও এই পরীক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যাবে না। পরীক্ষা হল শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকারক (Necessary evil) অংশ। যে-কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এই পরীক্ষাব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ এই প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

▲ **রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কার** (Improvent of Essay-type Examination) : আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ রচনাধর্মী পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য যেসব নির্দেশাবলি (guideliness) দিয়েছেন, সংক্ষেপে সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল :

প্রথমত, কোনো রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তরে কতটা কী লিখতে হবে তা সেই প্রশ্নের মধ্যেই পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে (Write the essay question so its clear and explains to students what should be covered in the answer)।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হতে হবে এবং প্রশ্নের ভাষা সহজ হতে হবে।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা এবং উত্তরের প্রতিটি অংশের জন্য পৃথক Points ও নম্বর নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন (Write a sample answer to the question ahead of time and assign points to various parts of the answer.)।

চতুর্থত, রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রত্যাশামূলক ত্রুটি দূর করার জন্য (To reduce expectance effects) পরীক্ষকদের দলবদ্ধভাবে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। (Teachers are working in terms, checking each othe's grading.)

পঞ্চমত, প্রলচিত রচনাধর্মী পরীক্ষাকে ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী পরীক্ষা (Objective examination) প্রবর্তনের প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নের জন্য আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardized test) গঠন করা এবং বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক পরিমাপ পত্রের (Cumulative Record Card) প্রচলন করা প্রয়োজন।

◆ নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক পরীক্ষা (Objective Type test) :

প্রচলিত ব্যক্তিনির্ভর রচনাধর্মী পরীক্ষার অসুবিধাগুলি দূর করতে গিয়েই নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক পরীক্ষার (Objective test) উদ্ভব হয়। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা অনেকখানি ব্যক্তিনির্ভর (subjective) এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সামগ্রিক পরিমাপ করা যায় না। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা পরীক্ষা হল বিষয়াত্মক (objective) এবং এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার একটি নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ পরিমাপ দিতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নম্বরদান-পদ্ধতিও বিজ্ঞানভিত্তিক ও নির্ভুল হয়। অনেকে এই পরীক্ষাকে নতুন ধরনের পরীক্ষা (New type test) বলে উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হল এমন এক ধরনের পরীক্ষা যেখানে পরীক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতার মান ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত পরিমাপের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা যথেষ্ট উপযোগী।

▲ নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুধর্মী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Objective Examination) :

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়েরই কোনো ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে না।

২। এই পরীক্ষা হল বস্তুনিষ্ঠ; ব্যক্তিনির্ভর নয়।

৩। এই পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এর জন্য সব সময় অতিরিক্ত উত্তরপত্র ব্যবহৃত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রেই উত্তর লেখার ব্যবস্থা থাকে।

৪। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করা যায়। কারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে বিশেষ বিষয়ের পাঠ দেন, তার সমগ্র অংশ থেকেই প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

৫। এই অভীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক বলে এর যথার্থতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে রচনাভিত্তিক পরীক্ষার মতো পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা ভাষা, বানান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের মূল্যায়ন কার্যকে প্রভাবিত করে না।

৬। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন সংখ্যা অনেক বেশি হয়। এই প্রশ্নাবলি রচনা ও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ।

৭। এই জাতীয় অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি-চর্চার কোনো সুযোগ থাকে না। শিক্ষার্থীর ভাষা জ্ঞান ও রচনা দক্ষতা প্রকাশের কোনো সুযোগ থাকে না। এখানে পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তর লেখার প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই লিখতে পারে না।

৮। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মূল্যায়ন খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি করা যায়। এই জাতীয় অভীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও সংখ্যামান আগেই নির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর লিখলে পূর্ণ সংখ্যামান পেতে পারে। পরীক্ষক খুব অল্প সময়ে অনায়াসে এই পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন। এই অভীক্ষা গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয় ঠিকই; কিন্তু এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষা পরীক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

৯। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা হয়। যাতে শিক্ষার্থীর চিন্তন ক্ষমতা, যুক্তি বিচারকরণ ক্ষমতা, বোধগম্যতা প্রভৃতি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। তবে স্বাধীনভাবে লেখার সুযোগ এখানে না-থাকায়

শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিমাপ করা যায় না। এই অভীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর পরীক্ষার্থী অনেক সময় আন্দাজ বা অনুমানের মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করে থাকে।

১০। এই অভীক্ষার প্রশ্নগুলি সমগ্র পাঠ্যসূচি থেকে নির্বাচন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষ বিষয়ের বা বিষয়াংশের ত্রুটি বা দুর্বলতা সহজে নির্ণয় করা যায় এবং পরে পুনরায় পাঠদানের মাধ্যমে সেই দুর্বলতা দূর করা যায়।

▲ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ :

- সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক প্রশ্ন বা অভীক্ষা (True-False Item)
- সামঞ্জস্য নির্ণায়ক অভীক্ষা (Matching Item)
- সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Fill in the Blanks or Completion test)
- বহু নির্বাচনী অভীক্ষা (Multiple Choice)
- হ্যাঁ/না জাতীয় অভীক্ষা (Yes-No Type)
- সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Item)

▲ নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক অভীক্ষার সুবিধা (Advantages of Objective Test) :

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রধান গুণ বা সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ –

প্রথমত : নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা হল বস্তুনিষ্ঠ। এই অভীক্ষায় শিক্ষকের ব্যক্তিগত কোনো প্রভাব থাকে না।

দ্বিতীয়ত : নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। এই পরীক্ষা বিষয়াত্মক বলেই শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য পরিমাপ করতে পারে।

তৃতীয়ত : এই পরীক্ষায় নম্বর দান পদ্ধতি অনেক সহজ ও নির্ভুল। কারণ এই পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের একটি নির্ভুল উত্তর থাকে। শিক্ষার্থী নির্ভুল উত্তর লিখলে শিক্ষক সঠিক নম্বর দিতে বাধ্য হন।

চতুর্থত : এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করা যায়। কারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান, তার সমগ্র অংশ থেকেই প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষায় সাফল্যলাভের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমের সমস্ত অংশগুলোকেই ভালোভাবে পড়তে হয়।

পঞ্চমত : এই অভীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী বলে এর যথার্থতা অনেক বেশি থাকে। এক্ষেত্রে হাতের লেখা, ভাষা বানান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের মূল্যায়ন কার্যকে প্রভাবিত করে না।

ষষ্ঠত : এই ধরনের অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা ও তুলনীয়তাও যথেষ্ট রয়েছে। এই অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি কষ্টসাধ্য বা জটিল নয় এই অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি

Scanned with CamScanner

সহজ ও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা থাকে এবং এই অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত সামর্থ্যের তুলনা করা যায়।

সপ্তমত : এই ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগের জন্য সময় ও শ্রম যথেষ্ট কম লাগে। খুব অল্প সময়ে এবং অনায়াসে এই পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন। এই পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য অভিজ্ঞ পরীক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

▲ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ত্রুটি বা অসুবিধা (Defects or Disavantages of Objective Test) :

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা পরীক্ষার উপরিউক্ত সুবিধাগুলি থাকলেও এর অসুবিধা বা ত্রুটিও কম নয়। এর প্রধান **অসুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ :

প্রথমত : এই জাতীয় পরীক্ষা অত্যধিক বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর বলে এর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান, রচনা-দক্ষতা ও চিন্তাশক্তি প্রকাশের কোনো সুযোগ থাকে না। যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কিছু লেখার সুযোগও থাকে না। স্মৃতিনির্ভর এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত : যে-কোনো বিষয়ে ভালো নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা গঠন করতে হলে অনেক বেশি সময় লাগে (good objective tests take a long time to construct)। কয়েক মিনিটে বা পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে বসে এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায় না।

তৃতীয়ত : এই ধরনের অভীক্ষা যথেষ্টভাবে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ শিক্ষক ছাড়া তৈরি করা যায় না। শিক্ষকের বিষয়ের ওপর যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে এই অভীক্ষা গঠন যথেষ্টই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থত : এই ধরনের অভীক্ষা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। কারণ এই অভীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি অনেক বড়ো হয়। এই ধরনের প্রশ্নপত্র ছাপানোর খরচ অনেক বিদ্যালয়ই বহন করতে পারে না।

পঞ্চমত : এই অভীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর শিক্ষার্থী অনেক সময় আন্দাজ বা অনুমানের মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করে থাকে (The guessing factor associated with objective tests)। প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানা না থাকলে শিক্ষার্থী অনুমানের ভিত্তিতেই সম্ভাব্য উত্তরের নীচে দাগ দিয়ে থাকে। এর ফলে তার কিছু উত্তর ঠিক যেমন হতে পারে তেমনি ভুলও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ***Sandiford*** বলেছেন— "The examiner cannot tell where knowledge stops and guessing begins."

ষষ্ঠত : এই জাতীয় অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি-চর্চার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে এই অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা যায় না।

❑ ৫.১.২ সমাজবিজ্ঞানের (ইতিহাস) মূল্যায়নের কর্মসূচি (Evaluation programme in social studies) :

ebook.dascoaching.in

ভূমিকা : শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ হল মূল্যায়ন। মূল্যায়ন কথাটা শুনলে আমরা ভাবি পরীক্ষা। আর পরীক্ষায় ভালো ফল (Result) করাটা শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা মানেই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। ভয় (fear) ও উদ্বেগ (anxiety)। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—২০০৫-এ বলা হয় : " প্রতিযোগীতার অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উচ্চকাঙ্ক্ষা আমাদের শিক্ষাকে বস্তুগত সাফল্য লাভের এক উপকরণের পর্যায় নামিয়ে এনেছে। এই ধারণা, ব্যক্তি মানুষকে সর্বাঙ্গীণ প্রতিযোগীতার এমন এক সম্পর্কে পৌঁছে দিচ্ছে যা শিশুর উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করছে এবং মূল্যবোধগুলিকে বিস্তৃত করছে।" এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার (২০০৫) দিক নির্দেশ করেছে। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF-2005)-এর অন্যতম সুপারিশ ছিল মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে ভয়মুক্ত করতে হবে, স্বচ্ছ ও নমনীয় করে তুলতে হবে এবং নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের কথা বলা হয়। NCF-2005 ও NFG (National Focus Group) উভয়েই বিজ্ঞান সম্মত প্রশ্ন রচনার উপর গুরুত্ব দেয় এবং এক্ষেত্রে MCQ or Multiple Choice Question-এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০০৯-এর শিক্ষা অধিকার আইনে (RTE, 2009, Section 29) সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশেষত মান উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক (Continuous and comprehensive Evaluation) মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষিত হয় এবং মূল্যায়ন হবে সামর্থ্য ভিত্তিক। নির্মিতবাদের ভাবনা ও দর্শন (Constructivism), জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫ ও শিক্ষার অধিকার আইনের (RTE, 2009) পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার (School Education) বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা -২০০৫ (NCF-2005) ও শিক্ষার অধিকার আইন (RTE, 2009)-এই দুটি সরকারি নথিকে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় স্তরের মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে মধ্য শিক্ষাপর্ষদ (West Bengal Board of Secondary Education) সামর্থ্য ভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন (CCCE)-এবং গ্রেড ব্যবস্থা (Grading system) বিদ্যালয় স্তরে প্রবর্তিত হয়। এই নতুন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হল প্রচলিত ব্যবস্থা প্রসূত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পঠন-পাঠনে অংশগ্রহণ করুক লেখাপড়া বিষয়টি নিয়ম ছকে বাঁধা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব সরিয়ে লেখাপড়াকে আনন্দের কর্মসূচি, সৃজনাত্মক প্রক্রিয়া, মননশীলতার আধার— এই বোধ ও উপলব্ধি জাগ্রত করাই আজকের আহ্বান।

Scanned with CamScanner

◆ **পশ্চিমবঙ্গে প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তরে ইতিহাসের মূল্যায়ন ব্যবস্থা (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) (Evaluation System in Hitory in West Bengal at Elementary Level) :**

পশ্চিমবঙ্গে প্রারম্ভিক স্তরে (ষষ্ঠ-অষ্টম) সামর্থ্যভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু আছে (CCCE)। নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে শিক্ষার্থীরা বিকাশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্তকরণ করা হয়। এই স্তরে নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের অঙ্গ হিসেবে প্রস্তুতকালীন (Formative) ও পর্যায়কালীন (Summative) উভয় প্রকার মূল্যায়ন করা হয়। উভয় ধরনের মূল্যায়ন একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষার্থীর জীবনের প্রারম্ভিক স্তরে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় উচ্চশ্রেণিগুলিতে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হল বিকাশমূলক (Development) ও পর্যায়কালীন মূল্যায়ন (Summative) হল বিচারমূলক (Judgemental)। সারা বছরে প্রস্তুতিকালীন (Formative) পরীক্ষা হবে তিনটি এবং পর্যায়ক্রমিক (Summative) মূল্যায়ন হবে তিনটি। প্রথমটি হবে এপ্রিলের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে। দ্বিতীয় জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে, তৃতীয়টি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। প্রথম প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পর প্রথম পর্যায়কালীন মূল্যায়ন, দ্বিতীয় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পর দ্বিতীয় পর্যায়কালীন ও তৃতীয় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পর তৃতীয় পর্যায়কালীন মূল্যায়ন করা হবে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের সূচক (Indication)-গুলি হল অংশগ্রহণ (Participation), প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ (Questioning and Experimentation), ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য (Interpretation and Application), সমানুভূতি ও সহযোগীতা (Empathy and Co-operation) ও নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aesthetic and Creative Expression)। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হবে শিখনের সময়েই, শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের কৌশলগুলি—হল কুইজ, বিতর্ক, প্রকল্প, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ইত্যাদি। পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হবে লিখিত পদ্ধতিতে—যেন একেবারেই পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক মুখস্তবিদ্যা চর্চার কারণ না হয়ে ওঠে। বরং তা শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ দেবে। শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা প্রয়োগের সুযোগ থাকবে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে 35% (20+20+20 = 60) নম্বরও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের 65% (15+25+70 = 110) নম্বর বরাদ্দ করা হয়। **মোট নম্বরের (Distribution of Marks) বিজ্ঞানটি হল নিম্নরূপ—**

শ্রেণি	মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দপূর্ণ মান	প্রস্তুতিকালীন Formative	পর্যায়ক্রমিক Summative	শতকরা	
				প্রস্তুতিকালীন	পর্যায়ক্রমিক
ষষ্ঠ	১১০০	৩০০	৮০০	২৭%	৭৩%
সপ্তম ও অষ্টম	১৩০০	৩০০	১০০০	২৩%	৭৭%

উৎস : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নিরবচ্ছিন্ন সচিব মূল্যায়ন, বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা।

এই স্তরে নম্বর ও গ্রেডেশন প্রদানের রীতি চালু আছে।

◆ **পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Evaluation System in History at Secondary Level in West Bengal) :**

অতি সম্প্রতি নবম ও দশম শ্রেণির পাঠক্রম বিভাজন করে কেবলমাত্র দশমশ্রেণির পাঠক্রমের ভিত্তিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গ্রহণ করেছে এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে থেকে শুধুমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক স্তরের মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু হয়। নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচি মাধ্যমিক স্তরের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসে মূল্যায়নের পূর্ণ মান হল ১০০ নম্বর। এর মধ্যে ১০ নম্বর হল মৌখিক পরীক্ষা (অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন) ও ৯০ নম্বরে লিখিত পরীক্ষা (বর্হিমূল্যায়ন)। মাধ্যমিকের মতো চূড়ান্ত পরীক্ষার মূল্যায়ন হল বিচার বিশেষ যা শিখছে তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে পরবর্তী উচ্চ স্তরে ভরতি হওয়া বা বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণের ছাড়পত্র দেওয়া। তাই মাধ্যমিকের মূল্যায়নে বর্হিমূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। **লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন নিম্নে দেখানো হল—**

প্রশ্নের প্রকৃতি	প্রশ্নের সংখ্যা ও মান	মোট নম্বর
১।	১০ x ১	= ১০
২।	১০ x ২	= ২০
৩।	৫ x ৪	= ২০
৪।	৫ x ৬	= ৩০
৫।	১ x ১০	= ১০
		৯০

মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যায়নে নম্বর ও গ্রেডেশন প্রদান করা হয়।

নবম শ্রেণি :

মাধ্যমিক স্তরে দ্বিবিভাজিত পাঠ্যসূচি প্রণয়নের পর নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচি মাধ্যমিক স্তর থেকে বাদ চলে যায় এবং এই পাঠ্যসূচির মূল্যায়ন পৃথকভাবে করা হয়। প্রারম্ভিক স্তরে অর্থাৎ ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে যেমন বিদ্যালয়কেন্দ্রিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও বৎসরান্তে

Scanned with CamScanner

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মান নির্ধারিত হয় তারই পারম্পর্য বজায় রেখে নবম শ্রেণিতে অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। এ যাবৎ নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক কোনো নতুন সার্কুলার বা নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। বিদ্যালয়কেন্দ্রিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ রূপ ১০০ নম্বরের জন্য বছরে চারটি একক অভীক্ষা মূল্যায়ন (20+20+30+20) এবং ১০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বছর শেষ ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা ও ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। নবম শ্রেণির মূল্যায়নের বিষয়টি বিদ্যালয়কেন্দ্রিক হওয়ায় ও নির্দিষ্ট সরকারি নির্দেশিকার অভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে এটির তারতম্য লক্ষ করা যায়। যে সমস্ত শিক্ষার্থী ধারাবাহিক মূল্যায়নের ২৫%-এর কম নম্বর পায় তাদের জন্য দুটি সংশোধনী মূল্যায়নের ব্যবস্থা (Remedial Test) আছে।

◆ পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের মূল্যায়ন ব্যবস্থা (একাদশ ও দ্বাদশ) (Evaluation System in History at Higher Secondary Level in West Bengal) :

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমকে দ্বিবিভাজিত করা হয়েছে। বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠক্রম পৃথক করা হয়েছে। শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে (WBCHSE)। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একাদশ শ্রেণির মূল্যায়ন করা হয়। একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণির মূল্যায়নের পূর্ণ মান ১০০ নম্বর-এর মধ্যে ২০ নম্বর প্রজেক্ট অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও ৮০ নম্বর লিখিত পরীক্ষা (বর্হিমূল্যায়ন)। লিখিত পরীক্ষার তিনটি বিভাগ—ক-বিভাগ বা Group A (২৪ নম্বর), খ-বিভাগ বা Group B (১৬ নম্বর) ও গ-বিভাগ বা Group C (৪০ নম্বর)। এই ধারা দ্বাদশ শ্রেণি তথা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অনুসৃত হবে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন নিম্নরূপ—

Group বা বিভাগ	প্রশ্নের প্রকৃতি Type of Question	প্রশ্নসংখ্যা ও প্রশ্নের মান	মোট নম্বর
'ক' বিভাগ		২৪ x ১	= ২৪
'খ' বিভাগ		১৬ x ১	= ১৬
'গ' বিভাগ		৫ x ৮	= ৪০
			৮০

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নম্বরের পাশাপাশি গ্রেডদানের ব্যবস্থা আছে।

◆ প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার সুবিধা/ভালো দিক (Merits of Existing Evaluation System) :

প্রারম্ভিক স্তর (ষষ্ঠ-অষ্টম ও নবম শ্রেণি) :

- সামর্থ্যভিত্তিক ধারাবাহিক ও সার্বিক (CCCE) মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা বছর ধরে মূল্যায়ন হয়। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর উপরে চাপ সৃষ্টি করে না।
- এই মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নির্ণয়ে সহায়ক এবং সেই দুর্বলতাগুলি প্রতিকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়।
- এই মূল্যায়ন পদ্ধতি সামর্থ্য ভিত্তিক এবং শিক্ষার্থীর সমস্ত সামর্থ্যের যথা জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতা পরিমাপের সহায়ক।
- এই মূল্যায়ন পদ্ধতির সূচকগুলি (Indicators) এমনভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে যা পাঠক্রমিক ও সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যেকার বিভাজন দূর করতে সক্ষম।
- পর্যায়ক্রমিক (Summative Evaluation) মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন রচনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মধ্যে 'Open-ended question framing'-এর দর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা যুক্ত চিন্তার অনুশীলনের সহায়ক। পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে (প্রথম অধ্যায় বাদে) একটি নমুনা অনুশীলনী—ভেবে দেখো, খুঁজে দেখো সংযোজিত হয়েছে।
- মূল্যায়নে মুখস্ত বিদ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। কোথাও সরাসরি তথ্য জানতে চাওয়ার মতো প্রশ্ন রাখা হয়নি। ফলে তথ্য মুখস্ত করার প্রবণতা জন্মেছে।
- প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, নান্দনিক চেতনা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের সহায়ক।
- মূল্যায়নের রিপোর্ট কার্ডে নম্বর ও গ্রেড—দুটিই দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা শিক্ষার্থী নিজে নিজের বিকাশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা করতে পারে।
- ভয়মুক্ত ও ভারমুক্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা।
- সংক্ষিপ্ত সৃজন ও চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে (Thoughtful question)-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সমস্ত সামর্থ্যের পরিমাপ করা যায়।
- অর্জিত সামর্থ্যগুলি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

◆ মাধ্যমিক স্তর (দশম শ্রেণি) ও উচ্চমাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণি) :

- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অভ্যন্তরীণ ও বর্হিমূল্যায়ন চালু আছে। যেহেতু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বিচারমূলক (Judgemental), সেহেতু বর্হিমূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

- শুধুমাত্র দশমশ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের মূল্যায়নের সিদ্ধান্তটি যথাযথ। এর ফলে বিষয়ের ভার থেকে শিক্ষার্থীরা অনেকটা মুক্ত হয়েছে।
- প্রশ্নপত্র রচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটেছে এবং এক্ষেত্রে MCQ or Multiple Choice-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে মূল্যায়ন ব্যবস্থার বৈধতা বা নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যায়ন বিজ্ঞান সম্মত হয়েছে। মূল্যায়ন ব্যক্তি সাপেক্ষতার ত্রুটি (Subjective Basis) থেকে মুক্ত হয়।
- প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত, সৃজনশীল ও ভাবনা চিন্তা সম্পন্ন (thoughtful) প্রশ্নপত্র রচনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটা মুক্ত চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশের সহায়ক।
- একাধিক উত্তর হতে পারে এমন প্রশ্ন বর্জন করা হয়েছে।
- প্রশ্নপত্রে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য বিচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- প্রশ্নপত্রে পাঠ্যসূচির প্রায় পুরো অংশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
- দীর্ঘ রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ, অতিসংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্যে রচনাধর্মী প্রশ্ন রচনাকৌশল অনুসৃত হয়েছে (মাধ্যমিক)। উচ্চমাধ্যমিক স্তর ৫০% নৈর্ব্যক্তিক ও ৫০% রচনাধর্মী প্রশ্ন।
- প্রশ্ন রচনার ধারা, নীতি ও কৌশল বিজ্ঞানসম্মত।
- শিক্ষার্থীর বা পরীক্ষার কাম্য শিখন সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠক্রমও মূল্যায়নে প্রজেক্ট বা কর্ম অভিজ্ঞতাকে স্থান নিয়ে এক উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয়েছে। এটা শিক্ষার্থীর কর্মউদ্যম, সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা বিকাশের সহায়ক। প্রকল্প সম্পাদন করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের বাইরে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংগ্রহশালা, পাঠাগার, ইন্টারনেট, পুরাকীর্তি ইত্যাদির সহায়তায় অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও তথ্য বিশ্লেষণে প্রেষণা যোগাবে।
- নম্বর ও গ্রেড ব্যবস্থা উভয়ের প্রচলন ঘটেছে।
- সংবিধান অংশের থেকে প্রশ্নের জন্য তিন নম্বর বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। ফলে এই অংশ বাধ্যতামূলক ভাবে পড়বে। সংবিধানিক অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবে।
- প্রশ্নপত্রে একই অধ্যায় থেকে বিকল্প প্রশ্ন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- প্রশ্নপত্রের ভাষা সরল, সহজবোধ্য, সুনির্দিষ্ট এবং সকলপ্রকার অস্পষ্টতা মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।

❂ ৫.২ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন, নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন, গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন, নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন, মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা (Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation, formative and summative evaluation, diagnose and remediation, construction of assessment tools like achievement test) :

❑ ৫.২.১ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন (Competency based evaluation) :

ভূমিকা : পাঠক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মূল্যায়ন। ভালো মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জীবনের অনেকাংশে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়নের সাথে জড়িয়ে আছে পরীক্ষার চাপ ও উদ্বেগ। প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকা নম্বর দিয়ে থাকেন। এখানে শিক্ষার্থীর সক্ষমতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। একইসঙ্গে মূল্যায়ন অনেকটা পরে পরে হওয়ার কারণে তা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সমস্ত দক্ষতা তথা বিকাশের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (NCF 2005) পদ্ধতিগত সংস্কারের প্রস্তাব করে। জাতীয় পাঠক্রমের অন্যতম সুপারিশ ছিল মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে ভয় মুক্ত, স্বচ্ছ ও নমনীয় করে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সামর্থ্য ভিত্তিক ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Competency Based Continuous and Comprehensives Evaluation-CCCE) ও গ্রেড ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্তর চালু করে।

ইংরেজি Competency শব্দটির বাংলা হল সামর্থ্য। সংসদ বাংলা অভিধান মতে, সামর্থ্যের অর্থ হল ক্ষমতা বা যোগ্যতা। সাধারণ অর্থে সামর্থ্য বলতে বোঝায় ক্ষমতা, যোগ্যতা, শক্তি ইত্যাদি। শিক্ষায় সামর্থ্য বলতে বোঝায় সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা যা অর্জন বা আয়ত্ত করতে হয় বিভিন্ন বিষয়ের শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট পাঠ এককের সাহায্যে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট ক্ষমতা বা যোগ্যতা অর্জন করে। তাই হল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য। বিদ্যালয় শিক্ষায় শ্রেণি বলতে কার্য ও নির্দিষ্ট কতকগুলি সামর্থ্যগুচ্ছকে বোঝায় এবং উচ্চতর শ্রেণির সামর্থ্যগুচ্ছ হল ক্রমোন্নতি।

সামর্থ্যভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের (CCCE)-এর গোড়ার কথা হল এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থা প্রকৃত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো। সামর্থ্যভিত্তিক ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা এবং সংশোধনী পাঠ ও সঙ্গী শিখনের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা

Scanned with CamScanner

করা। এটি শিক্ষার্থীকে ধরে রাখতে এবং পরিকল্পিতভাবে সঠিক ধারণ ক্ষমতায় ক্রম উন্নতিতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পঠনপাঠনে অংশগ্রহণ করুক। লেখাপড়া বিষয়টি নিরস ও ছকে বাঁধা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া—এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব সরিয়ে লেখাপড়াকে আনন্দের কর্মসূচি, সৃজনাত্মক প্রক্রিয়া, মননশীলতার আধার এই বোধ ও উপলব্ধি জাগ্রত করাই আজকের আহ্বান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ সঞ্চালিত করা আজ ভীষণ জরুরি। আর সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়নের মূলে রয়েছে এই ভাবনা, এই দর্শন।

সামর্থ্যের প্রাথমিক ভাগগুলি হল জ্ঞানমূলক সামর্থ্য, বোধমূলক সামর্থ্য, প্রয়োগমূলক সামর্থ্য ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য। জ্ঞানমূলক সামর্থ্য হল তথ্য সনাক্ত করার সামর্থ্য, বোধমূলক সামর্থ্য হল তথ্য বুঝতে পারার সামর্থ্য। প্রয়োগমূলক সামর্থ্য হল তথ্য বোধকে প্রয়োগ করার সামর্থ্য এবং দক্ষতামূলক সামর্থ্য হল বংশ তালিকা প্রস্তুত। মানচিত্র অঙ্কন, নকসা চিত্র আঁকা প্রভৃতি তৈরির সামর্থ্য হল দক্ষতামূলক সামর্থ্য। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিহাস তথা সমাজবিজ্ঞানের জন্য উপরোক্ত চার ধরনের সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্য স্থির করেছে।

সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়ন ভাবনার সঙ্গে তিনটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত—**প্রত্যাশিত সামর্থ্য, অর্জিত সামথ্য ও ঘাটতি সামর্থ্য।**

● **প্রত্যাশিত সামর্থ্য :** যে সামর্থ্য বা যোগ্যতা বা ক্ষমতা একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়, কামনা করা যায় বা আকাঙ্ক্ষা করা যায়—তাই হল প্রত্যাশিত বা কাম্য সামর্থ্য। প্রত্যাশিত সামর্থ্যের জন্য কতকগুলি বিষয় জানা একান্ত জরুরি। এই বিষয়গুলি হল—

- কোন্ নির্দিষ্ট বয়স বা শ্রেণিতে শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?
- কোন্ বিষয়ে (Subject) শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?
- কোন্ পাঠএককে (Unit) শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?
- কোন্ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?

● **অর্জিত সামর্থ্য :** একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন (Teaching-Learning) প্রক্রিয়ার শেষে শিক্ষার্থীরা যে সামর্থ্য বা ক্ষমতা অর্জন করে তাকেই অর্জিত সামর্থ্য বলে। সাধারণত প্রত্যাশিত সামর্থ্য অর্জন করার লক্ষ্যই শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সুতরাং অর্জিত সামর্থ্য যত বেশি প্রত্যাশিত সামর্থ্যের কাছাকাছি পৌঁছাবে তত বেশি শিক্ষণ-শিখন সফল হিসেবে চিহ্নিত হবে তথা শিক্ষার্থীরাও সফল হিসেবে গড়ে উঠবে। একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা হলেন এই অর্জিত সামর্থ্যকে ত্বরান্বিত করার মূল কাণ্ডারী।

● **ঘাটতি সামর্থ্য :** প্রত্যাশিত সামর্থ্য (Minus)—অর্জিত সামর্থ্য = ঘাটতি সামর্থ্য। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর কাছে যে সামর্থ্য প্রত্যাশা করা হয়েছিল, সেই সামর্থ্য অর্জন থেকে শিক্ষার্থীরা যতটা পিছিয়ে থাকে সেটাই হল শিক্ষার্থীর ঘাটতি সামর্থ্য। প্রচলিত ব্যবস্থায় ঘাটতি সামর্থ্যের (অসাফল্য) জন্য শিক্ষার্থীকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী করা হয় এবং ফেল

বা অকৃতকার্য—এ সব শব্দ দ্বারা শিক্ষার্থীদের আক্রান্ত করা হয়। তবে বাস্তব সত্য এটাই যে অসীম সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা এই ঘাটতির জন্য যদি ন্যূনতম অংশীদার হয়ে থাকে—তার থেকে অনেক বেশি দায়ী থাকে পাঠক্রম, পঠনপাঠন পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক কিছুই। তাই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে বিজ্ঞান সম্মত পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচি নির্মাণ, শিক্ষণ পদ্ধতির প্রচলন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যথার্থভাবে যদি উপরোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকরী হয় তাহলে তথাকথিত অকৃতকার্য (ফেল) শব্দটি শিক্ষার্থীদের অভিধান থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিমধ্যে সারা বছর তিনটি সামগ্রিক মূল্যায়নের (Summative Evaluation) ব্যবস্থা করেছে (first summative, second summative and third summative evaluation)। প্রথম ও দ্বিতীয় সামগ্রিক মূল্যায়নের যেসব শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কাম্য সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে না তাদের জন্য ঘাটতি পূরণের সংশোধনী অভীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● **ভিতজরিপ :** মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর ভিত অর্থাৎ শিক্ষার্থী সামর্থ্যের কোন স্তরে আছে তা জেনে নেওয়ার প্রক্রিয়া। ভিত জরিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের স্তর চিহ্নিত করা হয়। কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করে তাকে শ্রেণির উপযুক্ত করে নিতে ভিত জরিপ বিশেষ কার্যকর।

এক নজরে চার ধরনের সামর্থ্য :

জ্ঞানমূলক সামর্থ্য	বোধমূলক সামর্থ্য	প্রয়োগমূলক সামর্থ্য	দক্ষতামূলক সামর্থ্য
➢ চিনতে পারা ➢ স্মরণ করতে পারা ➢ দেখাতে পারা ➢ সন ও তারিখ উল্লেখ করতে পারা ➢ শাসকের নাম বলতে পারা	➢ উদাহরণ দেওয়া ➢ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা ➢ তুলনা করতে পারা ➢ শ্রেণি বিন্যাস করতে পারা ➢ সম্পর্ক খুঁজে বের করা ➢ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা ➢ ভুল-ত্রুটি সনাক্ত করতে পারা	➢ যথার্থতা বিচার করতে পারা ➢ গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারা ➢ প্রভাব বিশ্লেষণ করা ➢ সমস্যার সমাধান করতে পারা ➢ কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারা ➢ মূল্যায়ন করতে পারা	➢ তালিকা প্রস্তুত ➢ সময় তালিকা প্রস্তুত করা ➢ বংশতালিকা প্রস্তুত ➢ মানচিত্র অঙ্কন করে স্থান নির্দেশ

◆ **সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :**

- সামর্থ্যভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য হল কাঙ্ক্ষিত সামর্থ অর্জন এবং মূল্যায়ন হল এই সামর্থ্যের পরিমাপ।

Scanned with CamScanner

- প্রশ্নপত্র রচিত হয় সামর্থ্য ভিত্তিক। দীর্ঘ রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ অতিসংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্যে রচনাধর্মী প্রশ্নের সুসংগত বিন্যাস ঘটানো হয় যাতে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটে।
- সামর্থ্যের মোটামুটি প্রাথমিক ভাগগুলি হল—জ্ঞানমূলক সামর্থ্য, বোধমূলক সামর্থ্য, প্রয়োগমূলক সামর্থ্য ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য এবং সামর্থ্যগুলি একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল।
- সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনের সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ কাম্য সামর্থ্যের কতটা অর্জন করেছে এবং কতটা ঘাটতি আছে তা যাচাই করা যায়।
- সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা বা ঘাটতি দূর করার ব্যবস্থার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের উন্নতির ব্যবস্থা আছে।
- ঘাটতি পূরণের জন্য সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করা হয় এবং সংশোধনী পাঠে সঙ্গী শিখনের উপর জোর দেওয়া হয়।

সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা :

- এটি সময় উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা।
- এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার উল্লেখগোয্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পাঠে অংশগ্রহণ করে।
- সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশের সহায়ক।
- সকল শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের উন্নতির সুযোগ আছে।

❑ ৫.২.২ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন (Continuous and comprehensive evaluation) :

ভূমিকা : শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মূল্যায়ন। মূল্যায়ন কোনো চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। সামাজিক চাহিদা ও ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পরিবর্তিত হয়। ১৯৯০-এর দশকে সারা পৃথিবী জুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষককেন্দ্রিক থেকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক (From teacher centred to learner centred) হয়ে ওঠে। শিক্ষণ (Teaching) অপেক্ষা শিখন (Learning) অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। মূল্যায়ন ব্যবস্থাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে—'teacher centred evaluation to learner centred evaluation.' বিশ্বব্যাপী এই পরিবর্তনের প্রভাবে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের তাগিদ অনুভব করে। এর ফলশ্রুতিতে হল অবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে (Continuous and Comprehensive Evaluation)।

ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Context) : শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার সূত্রে ১৯৮০-এর দশকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারণাটি আসে। ভারত স্বাধীন হবার পর শিক্ষার পরিমাণগত সম্প্রসারণের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়। Access and retention অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণ ও নথীভুক্তকরণ ও শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার বিষয়টি গুরুত্ব পেল। শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি অবহেলিত থেকে গেল। উৎকর্ষতার বিচারে ভারতীয় শিক্ষা ছিল অতি নিম্নমানের। সেই সময় সারা দেশে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার (External Examination)-এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার মান নিম্নগামী হয় (১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকে)। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের নিম্নমান (Falling Standard of Achievement) এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Scholastic areas) ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের (যথা প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র ও দৈহিক কর্মক্ষমতার ক্ষেত্র) বিকাশ ও পরিমাপের (Lack of development and assesment of co-scholastic areas) ব্যর্থতা শিক্ষাক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এই সংকট থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্য প্রাথমিক স্তরে No detention Policy প্রবর্তিত হলেও এর অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত প্রয়োগ নীতির ফলে (Mis-interpretation and wrong implemention) অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয় (Achievement of children continued to fail)। এই ব্যর্থতার (falling standard of achievement) কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌রা উপলব্ধি করেন – Evaluation is a missing link of educational process অর্থাৎ মূল্যায়ন ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্রের অভাব লক্ষ করা যায়। অথচ স্বাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন কমিশনে বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়া থেকে পৃথক কোনো বিষয় নয়। প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় শিক্ষার সমস্ত স্তরে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক (continuous and comprehensive evaluation) মূল্যায়ন চালু করার সুপারিশ করে। বিদ্যালয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই প্রাথমিক স্তরে একটি সুসংহত মূল্যায়ন পদ্ধতি (A systematic procedure of evaluation) চালু করা প্রয়োজন। তাই পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রচলন ঘটে। পরবর্তীকালে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা - ২০০৫ ও শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রারম্ভিক (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি) ও মাধ্যমিক স্তরে (নবম থেকে দ্বাদশ) এটি চালু করার সুপারিশ করে।

Scanned with CamScanner

◆ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Continuous and comprehensive Evaluation) :

মূল্যায়ন কথার সহজ অর্থ সঠিক বিচার। কোনো একটি কাজ কিংবা ভাবনার অথবা পরিকল্পনার গভীর ও সঠিক মর্মার্থ বুঝে এবং কার্যকারিতার গুরুত্ব বুঝে ও বিচার করে ফলাফল বিচার করা হয়। একেই ব্যাপক **মূল্যায়ন (CCE) বলে**। কিন্তু এই মূল্যায়ন যদি নিরন্তর বা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাবে না হয়ে কিছুদিন বা কিছু মাস বা কিছু সময় অন্তর হলে বেশ কিছু ত্রুটি দৃষ্টির বা চেতনার অন্তরালে চলে যায়। ফলে কোনো ব্যক্তি বা বিষয় বা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ব্যাহত হয় বা যথাযথ হয় না। সেই জন্যই নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শিক্ষামূলক নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অনুসরণ করছে কিনা সেটা শিক্ষকের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা যেহেতু শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার্থীর নিত্যনৈমিত্তিক দক্ষতা অর্জনই যখন প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। সুতরাং, শিক্ষার্থীর সঠিক অগ্রগতি বিচারও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিচার করতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যে কথাটি বারবার আলোচিত হয় সেটি হলো **শিক্ষার্থীর দক্ষতাভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপকতর মূল্যায়ন বা competency based continuous comprehensive evaluation বা CCCE সংক্ষেপে CCE।**

শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠক্রম নির্বাচনের সময় যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে পাঠ উপাদান (content, concepts or process) চয়ন করা হয় তা সঠিকভাবে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে পাঠদান করে থাকেন বিভিন্ন তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক কার্যপ্রণালী দ্বারা। শিক্ষার্থী সেই তথ্যকে সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে আত্তীকরণ করে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সেই দক্ষতা বৃদ্ধি কতটা কার্যকরী হয়েছে তা পরিমাপের জন্য বিশেষ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিমাপ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যান। এর ফলে শিক্ষার্থীর দুর্বলতার অংশগুলি ভালোভাবে ধরা পড়ে এবং পরে পুনঃপাঠদান প্রক্রিয়ার দ্বারা অনর্জিত শিক্ষা দক্ষতা শিক্ষার্থী অর্জনের সুযোগ পায়। একেই বিশেষ **গঠনমূলক মূল্যায়ন বা (Formative Evaluation) বলে** যা সামগ্রিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)-কে সফলতার এক বিশেষ রূপ দেয়।

তাই দৈনিক শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে নির্মিতিবাদ প্রক্রিয়া (Constructivism approach)-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জন এবং তার মূল্যায়ন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এক নতুন রূপ দিয়েছে। বর্তমানে একক অভীক্ষা (unit test) এরই বাস্তব উদাহরণ যা শিশুর শিক্ষায় ভীতি কাটাতে এক অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ।

◆ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of CCE) :

★ আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, অনুভূতিগত দিক, মূল্যবোধের বিকাশ, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ প্রভৃতি দিকের বিকাশ যাচাই করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক (cognitive domain), অনুভূতিগত দিক (affective) ও দক্ষতামূলক দিক (Psychomotor Domain) প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কাম্যসামর্থ্য কতটুকু অর্জন করেছে সেটি যাচাই করে।

★ নিরবচ্ছিন্ন সঠিক মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের (Multiple tools and Technique) সাধনী ও কৌশল ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীর Scholastic and Co-scholastic Areas এবং সামর্থ্য পরিমাপের জন্য। যেমন—পর্যবেক্ষণ, ব্যবহারিক পরীক্ষা মৌখিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, কুইজ বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiments) প্রকৃতি পাঠ ও বনসৃজন, দলগত আলোচনা, পরিষ্কার পরিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি।

★ এটি সামর্থ্যভিত্তিক। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতা সমস্ত দিকের উপর জোর দেয়।

★ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ধারাবাহিকতা (Regularity and continuity)। সারা শিক্ষাবর্ষ জুড়ে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন চলতে থাকে। প্রস্তুতিকালীন (Fomative Evaluation) ও পর্যায়ক্রমিক (Summative Evaluation) মূল্যায়ন সারাবছর ধরে চলতে থাকে।

★ এটি হল সার্বিক তাই Scholastic ও Co-scholastic Area উভয়ক্ষেত্রের উপর সমান গুরুত্ব দেয়।

★ এখানে প্রারম্ভিক স্তরগুলিতে প্রস্তুতিকালীন (Fommative) ও পরবর্তী স্তরগুলিতে পর্যায়ক্রমিক মূল্যয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

★ এই মূল্যায়ন সারা শিক্ষাবর্ষ জুড়ে চলে। তাই শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে না।

◆ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের উপযোগীতা (Utility of CCE) :

★ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শিক্ষণ-শিখন (Teaching-Learning Process) প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা।

★ শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নির্ণয় ও তার প্রতিকারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা।

Scanned with CamScanner

★ সকল শিক্ষার্থীকে কাম্য মানে নিয়ে আসা।
★ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ দেওয়া,
★ শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের সার্বিক মূল্যায়ন করা।
★ এর সাহায্যে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার সংশোধন ও উন্নয়ন করা যায়।
★ শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা গঠনে সক্ষম কিনা এবং যতটুকু শিখছে তা প্রয়োগ করতে পারছে কিনা নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন তার স্বচ্ছ ধারণা দেয়। বিদ্যালয় ও সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে (একক বা দলগত ভাবে) অংশগ্রহণ করছে কিনা এবং সেক্ষেত্রে সক্ষম কিনা তার প্রতিফলন থাকে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নে।
★ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও নথীবদ্ধকরণ হয়। তাই এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপর চাপ সৃষ্টি করে না।

◆ **নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মূলনীতি** (Principles of Continuous and Comprehensive Evaluation.) :

কতকগুলি নীতি অনুসরণ করে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে কর্মসূচি প্রয়োগ করা হয় বা পরিচালিত হয়। এই নীতিগুলি হল–

Flexibility : নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের অন্যতম নীতি হল নমনীয়তা। প্রত্যেক বিদ্যালয় নিজের সুযোগ সুবিধা, নিজের সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী মূল্যায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করবে এবং সংশোধনী পাঠ (Remedial Teaching) ও সংশোধনী অভীক্ষার (Remedial Test) এর ব্যবস্থা করবে। এর বাঁধা ধরা (Rigid scheduled) কোনো নিয়ম অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

Functionality : মূল্যায়ন খুব কলাকৌশল ভিত্তিক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Technical and ambitions) হওয়ার প্রয়োজন নেই। এরজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ের প্রচলিত অবস্থা ও কাঠামোতে (Existing situation) এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Accountability : নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়বদ্ধতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যায়ন করা, শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করা, সংশোধনী পাঠের ও সংশোধনী অভীক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

Economy : নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত দেখা যায় সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন যেখানে প্রচলিত আছে সেখানে পঠন-পাঠনের দিবসের সংখ্যা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন ও শিক্ষণ কার্য দিবসের মধ্যে সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। কারণ মূল্যায়ন হল শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার (Teaching-

ebook.dascoaching.in

Learning Process) এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই কোনোভাবে মূল্যায়নের জন্য (মূল্যায়ন সংশোধনী পাঠ, সংশোধনী অভীক্ষা প্রভৃতির কারণে) শিক্ষণের ক্ষতি যেন না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

Illumination : সর্বোপরি নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন করার সময় বিদ্যালয়ের অবস্থা (Condition), শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা (Number of Teaching Personnel), শিখন সম্পদ (Learning Resources), শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ প্রভৃতি যা শেখানোর প্রক্রিয়া। (Teaching Learning Process) কে প্রভাবিত করে সেগুলি বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের বা পারদর্শিতা (Pupils performance) বিচার করতে হবে।

◆ সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগর সমস্যা (Problems of Implementation of CCE) :

তত্ত্বগতভাবে সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি যে বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে দ্বিমত না থাকলেও এই পদ্ধতিটি বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। **এই অসুবিধাগুলি হল–**

(১) শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি থাকা।
(২) বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা যথেষ্ট কম থাকা।
(৩) বিশেষ কোনো কারণে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন দিবসের সংখ্যা হ্রাস, সময়াভাব এবং সেজন্য বিশেষ করে সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করতে না পারা।
(৪) সরঞ্জামের অভাব, অর্থাভাব (যার ফলে প্রশ্নপত্র/উত্তরপত্র সরবরাহে সমস্যা)।
(৫) পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি লভ্য সময় সাপেক্ষে বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত হওয়া।
(৬) বহুকালব্যাপী প্রচলিত সাবেকি পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি, অভিভাবকদের বিপুল অংশের এবং শিক্ষক সমাজের ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের একাংশের অনুগত্যবোধ ও বিশেষ দুর্বলতা।
(৭) সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের যৌক্তিকতা, এর শিক্ষা বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি, রূপায়ণ প্রকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক অংশের সবিশেষ অবহিত না হতে পারা বা এসব বিষয়ে তাঁদের সকলকে ঠিকমতো বোঝাতে অসফল হওয়া।
(৮) পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব।
(৯) পরিকল্পনামাফিক পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন, সংশোধনী পাঠ—এসবের ব্যবস্থা করতে না পারা।
(১০) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একাংশের মধ্যে নয়া পদ্ধতি প্রয়োগে বর্দ্ধিতশ্রম ও সময় প্রদানে ভীতি ও অনীহা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

❑ ৫.২.৩ গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Formative and summative evaluation) :

শিক্ষাক্ষেত্রে যে ধরনের মূল্যায়ন আমরা করে থাকি তাদেরকে বৃহত্তর অর্থে শ্রেণিবিভাগ করলে সাধারণত প্রধান দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় formative এবং summative evaluation নামে পরিচিত। শিক্ষার সমস্ত ধরনের উপাদানগুলিকে এই দুই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন নির্বাচন করা হয় তেমনি তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(i) **Formative Evaluation :**

Michael Seriven 1967 পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রথম formative এবং summative evaluation শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। কোনো শিক্ষাবর্ষে Teaching - learning চলাকালীন যে ধরনের মূল্যায়ন করা হয় তাকে formative evaluation বলে। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা, শিক্ষকের অদক্ষতা ও শিক্ষাকার্যক্রমের পদ্ধতিগত অপসঙ্গতি নির্ণয় করে সংশোধনের মাধ্যমে ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রাখার উপায় হল গঠনমূলক মূল্যায়ন।

আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসেবে formative evaluation অধিক পরিচিত unit text বা semester system ব্যবহার করে করা হয়ে থাকে। কোনো একটি শ্রেণির সামগ্রিক syllabus কে কয়েকটি unit-এ বিভাজন করে তার উপর শিক্ষাদানের পাশাপাশি পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে ওই আংশিক মূল্যায়ন করা হয় যা পরবর্তীকালে একত্রিতভাবে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে। আমরা জানি ইতিহাসের ধারণা অবিচ্ছেদ্য ঘটনাক্রম। সুতরাং শিক্ষার্থীর এই ধারাবাহিক ধারণা পেতে প্রতিটি স্তরের বা unit-এর বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা উচিত যা এই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমের করা হয়। শিক্ষণ শিক্ষার্থীর স্বশিখন ও স্ব-শিখন প্রক্রিয়া হিসেবে এর গ্রহনযোগ্যতা অনেক বেশি। formative evaluation বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নমনীয় হয়ে থাকে। প্রয়োজনভিত্তিক স্থানীয়ভাবে শিক্ষকরা এই ধরনের evaluation করে থাকে।

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় পাঠদান চলাকালীন প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা তা যে মূল্যায়নের সাহায্যে বিচার করা হয় তাকেই গঠনমূলক বা পাঠ চলাকালীন মূল্যায়ন।

- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ N. E. Gronlund (1985) গঠনমূলক মূল্যায়নের সংজ্ঞায় বলেছেন— "Formative evaluation is used to monitor learning progress during instruction and to provide continuous feedback to both pupil and teacher concerning learning successes and failures."
- শিক্ষাবিদ **R. L. Ebel** এবং **D. A. Frisbie** (1986)-এর মতে — "Formative evaluation is conducted to monitor the instructional process, to determine wheather learning is taking place as planned."

- শিক্ষামনোবিদ **W. Wiersma** এবং **S. G. Jurs** বলেছেন — "Formative evaluation occurs over a period of time and monitor student progress."

◆ গঠনধর্মী মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Formative Evaluation) :

উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যথা—

(১) কোনো একটি শিক্ষাবর্ষব্যাপী এই মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়।

(২) এই মূল্যায়ন পাঠদান চলাকালীন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত করে।

(৩) শিক্ষার্থীর ভুল ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে।

(৪) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার কাজে সহায়তা করে।

(৫) যে-কোনো কর্মসম্পাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে গঠনমূলক মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(৬) শিক্ষা প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই মূল্যায়ন গুরত্ব আরোপ করে।

(৭) এই মূল্যায়ন যে-কোনো সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে।

(৮) এর পরিধি সংকীর্ণ।

(৯) চলতি শিক্ষার্থীদের (running or current students) জন্য এই মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

(১০) মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলিকে খোঁজার চেষ্টা করে এই গঠন[illegible] মূল্যায়ন।

(১১) গঠনমূলক মূল্যায়নের পরিকল্পনাটি নমনীয় প্রকৃতির হয় ফলে সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব।

(১২) এই মূল্যায়ন দৈনন্দিন মূল্যায়নের (day-to-day evaluation) উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

(১৩) কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে গঠনমূলক মূল্যায়নের গুরত্ব অধিক হলেও যত সময় বাড়তে থাকে অর্থাৎ প্রকল্প যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় এর গুরুত্ব কমতে থাকে। সময়ের সাথে গঠনমূলক মূল্যায়নের গুরুত্ব হ্রাস পাশের লেখচিত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

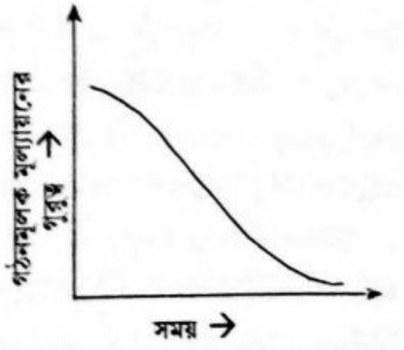

Scanned with CamScanner

(১৪) গঠনমূলক মূল্যায়নের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মডেলটি হল শিক্ষাবিদ **D.L. Stuffebeam**-এর প্রস্তাবিত **CIPP** মডেল। এই মডেলে মূল্যায়নের চারটি উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(i) **Context Evaluation (C)** : এই মূল্যায়নে কোনো নতুন প্রকল্প বা কর্মসূচি সূচনার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা হয় এবং এই কর্মসূচি কীভাবে বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতিবিধানে সক্ষম তাও বিচার করা হয়।

(ii) **Input Evaluation (I)** : নতুন কর্মসূচি বা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান, মানবসম্পদ (যেমন— শিক্ষক, শিক্ষার্থী) ও পরিকাঠামোর মূল্যায়ন হল Input evaluation।

(iii) **Process Evaluation (P)** : শিক্ষার্থীর অন্তিম আচরণ (Terminal behaviour) হল মূল্যায়নের ফলশ্রুতি। তাই শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক আচরণকে (Entry behaviour) প্রত্যাশিত অন্তিম আচরণে পরিবর্তিত করার জন্য কী কী প্রক্রিয়া, শিক্ষণ পদ্ধতি, কৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন এবং সেগুলি কতটা সহজলভ্য তার মূল্যায়ন শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(iv) **Product Evaluation (P)** : শিক্ষাব্যবস্থার গুণগতমান যাচাই করা হয় মূল্যায়নের ফলাফলের গুণগতমানের ভিত্তিতে। কোনো একটি শিক্ষাসময়কালের (period or session) শেষে শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরণ সন্তোষজনক হলে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরণকেই মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল (Product) হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

(i) সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Evaluation) :

সামগ্রিক মূল্যায়ন একটি গতানুগতিক ধারণা যেখানে কোনো শিক্ষার্থীদের সারা বছরের সমগ্র কার্যকলাপের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে। কোনো এক শিক্ষাবর্ষের শেষে পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থী কতটা অনুধাবন বা গ্রহণ করতে পেরেছে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করে তার পাণ্ডিত্য নির্ধারণ করা হয় এবং গ্রেড প্রদান করা হয়। Summarive evaluation এ শিক্ষার্থীর উপর বৃহত্তর চাপ তৈরি হওয়ায় বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে formative evaluation গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই পদ্ধতি একইসঙ্গে ব্যবহার করলে বৃহত্তর অর্থে মূল্যায়ন সার্থক হবে।

কোনো কর্মসূচি বা কোনো প্রকল্পের শেষে শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলি কতখানি চরিতার্থ হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা কতখানি পারদর্শিতা অর্জন করেছে সে সম্পর্কিত তথ্য যে মূল্যায়নের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয় তাকেই সংকলনধর্মী বা প্রান্তিক মূল্যায়ন বলে।

- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **N. E. Gronlund** (1985) সংকলনধর্মী মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন— "Summative evaluation typically comes at the end of a course (or unit) of instruction. It is designed to determine the extent to which the instructional objectives have been achieved and is used primarily for assigning course grades or certifying pupil mastery of the intended learning outcomes."
- শিক্ষাবিদ **Ebel** এবং **Frisbie** (1986) বলেছেন— "Summative evaluation is conducted at the end of an instructional segment to determine if learning is sufficiently complete to warrant moving the learner to the next segment of instruction."
- শিক্ষাবিদ **W. Wiersma** & **S. G. Jurs** (1990) প্রান্তিক মূল্যায়নের সংজ্ঞায় বলেছেন— "Summative evaluation is done at the conclusion of instruction and measures the extent to which students have attained the desired outcomes."

◆ সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Summtive Evaluation) :

উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে সংকলনধর্মী মূল্যায়নের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যথা—

(১) সংকলনধর্মী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত নির্দেশনামূলক কর্মসূচির সার্থক রূপদানের জন্য।

(২) সংকলনধর্মী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয় কোনো একটি সেমিস্টার (৬ মাস অন্তর) বা শিক্ষাবর্ষের শেষে।

(৩) কাঙ্ক্ষিত আচরণগত উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতটা সংঘটিত হয়েছে এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা সংকলনধর্মী মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব।

(৪) সংকলনধর্মী মূল্যায়ন শিক্ষার্থী এবং কোনো কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে শিক্ষককে feedback প্রদান করে।

(৫) কোনো একটি কর্মসূচি বা প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে নাকি, সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংকলনধর্মী মূল্যায়ন সহায়তা করে।

(৬) এই মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

(৭) এই মূল্যায়নের কৌশলগুলি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং সর্বজনগ্রাহ্য।

Scanned with CamScanner

(৮) এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি ব্যাপক।

(৯) সংকলনধর্মী মূল্যায়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মডেলটি হল শিক্ষাবিদ্ Stake প্রবর্তিত **'Countenance Evaluation'** বা **'Responsive Evaluation'**। Stake-এর মতে—

মূল্যায়ন (Evaluation) = পরিমাপ (Measurement) + বিচারকরণ (Judgement)

বা মূল্যায়ন (Evaluation) = বিবরণ (Description) + বিচারকরণ (Judgement)

'Countenance Evaluation'-এ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সকল সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাণগত ও গুণগত বিবরণ দেওয়া হয়। এই বিবরণগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো হয়। একে **"বিবরণ ম্যাট্রিক্স"** (Description Matrix) বলে। এই ম্যাট্রিক্সে "কী হয়েছে" (What is) তার বিবরণ থাকে। এই ম্যাট্রিক্সের বিবরণগুলি "বিচারকরণ ম্যাট্রিক্সের" (Judgement Matrix) "কী হওয়া উচিত ছিল" (What should be) বিবৃতিগুলির সাথে তুলনা করা হয়।

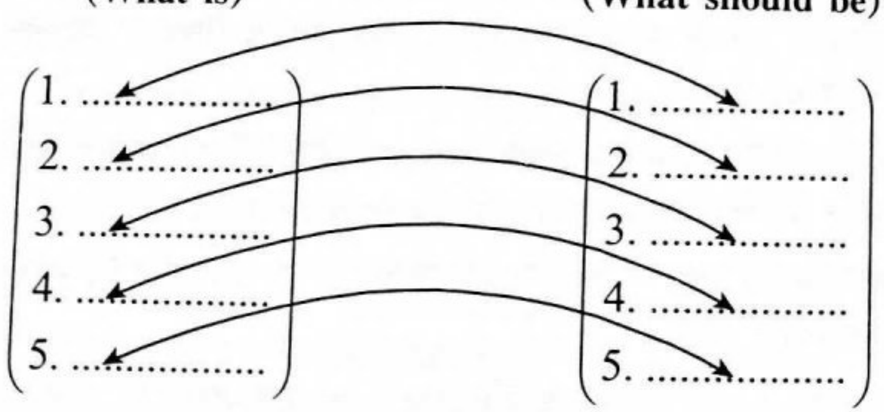

বিবরণ ম্যাট্রিক্স
(Description Matrix)

বিচারকরণ ম্যাট্রিক্স
(Judgement Matrix)

(১০) কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে সংকলনধর্মী মূল্যায়নের গুরুত্ব কম থাকলেও যত সময় বাড়তে থাকে অর্থাৎ, প্রকল্প যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় এর গুরুত্ব ততই বাড়তে থাকে। সময়ের সাথে সংকলনধর্মী মূল্যায়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাশের চিত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

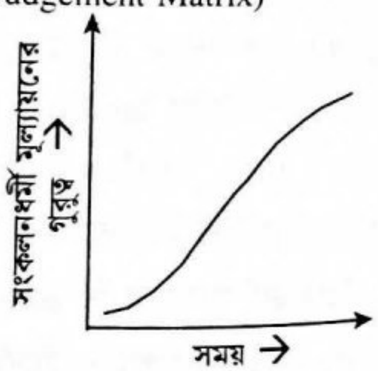

◆ **গঠনমূলক ও সংকলনধর্মী মূল্যায়নের পার্থক্য (Differences between Formative and Summative Evaluation) ঃ**

গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation)	সংকলনধর্মী মূল্যায়ন (Summative Evaluation)
(১) কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি চলাকালীন প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা তা এই মূল্যায়নের সাহায্যে যাচাই করা হয়।	(১) কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির শেষে শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতখানি সংঘটিত হয়েছে এবং তারা কতখানি পারদর্শিতা অর্জন করেছে তা এই মূল্যায়নের সাহায্যে যাচাই করা হয়।
(২) কোনো একটি শিক্ষাবর্ষব্যাপী এই মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়।	(২) এই মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয় কোনো একটি সেমিস্টার (৬ মাস অন্তর) বা একটি শিক্ষাবর্ষের শেষে।
(৩) এই মূল্যায়ন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রত্যাশিত গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা এবং নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ধারাবাহিক তদারকি ও feedback প্রদানে সাহায্য করে।	(৩) এই মূল্যায়নের মাধ্যমে কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে নাকি সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই মূল্যায়ন সাহায্য করে।
(৪) এই মূল্যায়নে সাধারণত শিক্ষককৃত অভীক্ষা কিংবা আদর্শায়িত অভীক্ষা (যেমন— পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহের উপযোগী প্রশ্নগুচ্ছ ইত্যাদি) প্রয়োগ করা হয়।	(৪) এই মূল্যায়নে সর্বজনগ্রাহ্য, নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ কৌশল ব্যবহৃত হয়। (যেমন— মাধ্যমিক পরীক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদি)
(৫) এই মূল্যায়নের বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ও বিশেষীকৃত।	(৫) এই মূল্যায়নের বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও সাধারণ।
(৬) এই মূল্যায়নে ব্যবহৃত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মডেলটি হল Stuffebeam-এর CIPP মডেল।	(৬) এই মূল্যায়নে ব্যবহৃত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মডেলটি হল Stake-এর 'Countenance Evaluation' মডেল।
(৭) চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য এই মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।	(৭) পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য এই মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।
(৮) কোনো কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে এই মূল্যায়নের গুরুত্ব অধিক হলেও প্রকল্প যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় এর গুরুত্ব কমতে থাকে।	(৮) কোনো কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে এই মূল্যায়নের গুরুত্ব কম থাকলেও প্রকল্প যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় এর গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

Scanned with CamScanner

❑ ৫.২.৪ নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন (Diagnose and remediation) :

ইতিহাস শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী যেমন সম মানের হয় না তেমনি সকল শিক্ষক সকল বিষয় সমান সমান দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাদান করতে পারেন না। শিক্ষার্থীর জন্মগত বা অর্থ সামাজিক পরিবেশগত কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থী পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে না। আবার অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ বিষয় স্বচ্ছতার সঙ্গে বুঝতে পারে না। শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার ত্রুটিজনিত কারণেও অনেক সময় বিষয়ের বোধগম্যতা আসে না। অনেক সময় ইতিহাসের যে সমস্ত কর্মচর্চা করা হয় সেগুলি শিক্ষার্থীরা ভয়ের কারণে বা জড়তার কারণে যথাযথ ভাবে বুঝতে পারে না। যেভাবেই হোক না কেন যখন বিষয়বস্তুর অস্বচ্ছতা যুক্তকরণে বা ত্রুটি যুক্ত করণে শিক্ষক পুনরায় শিক্ষাদানের যে নীতিগ্রহণ করেন তাকে Remedial Teaching বলে। মনে রাখতে হবে Remedial Teaching সব শিক্ষার্থীর সবসময় সব বিষয়ে দরকার পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় সাধারণ বা উচ্চমানের (বুদ্ধ্যঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে) শিক্ষার্থীরাও কোনো বিশেষ বিষয় বুঝতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ একই ধরনের দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পুনঃশিক্ষাদান প্রয়োজন।

◆ **সংশোধনমূলক শিক্ষণের জন্য দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ** (Identification and Diagnosis of backword learners for remedial teaching) : কোনো বিশেষ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে প্রথমেই দুর্বল বা সংশোধনযোগ্য শিশুদের নির্বাচন করতে হবে। সাধারণত যে ধরনের Test-এর মাধ্যমে এই নির্বাচন করা হয় সেগুলি হল Pre-test নামে পরিচিত। বিশেষ বিষয়ের উপর diagnostic Test বা Attainment test দ্বারা নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থীদের বেছে নিতে হয়। ধরা যাক, দশম শ্রেণির 'ফ্যাসিবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' নামক কোনো Chapter-এ ১৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০-৩০ জন ৩০ নম্বরের মধ্যে ১০-এর নীচে পেয়েছে। ওই শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন Psychological Test-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর IQ বিশেষ আগ্রহ ইত্যাদি পরিমাপ করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীর গৃহ পরিবেশগত আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বিচার করতে হবে। বিদ্যালয় পরিবেশের ত্রুটি, শিক্ষকের পাঠদান সংক্রান্ত ত্রুটি থাকলে তাও বিবেচনা করতে হবে।

● **সংশোধনমূলক শিক্ষণ** (Remedial Teaching) : Diagnostic Test মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক দুর্বল শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত করার পরে তাদের সমস্যার নিরিখে পুনঃশিক্ষণ পরিকল্পনা করতে হয়। যে ক্ষেত্রে ইতিহাস শিক্ষক প্রয়োজনীয় আরো অনেক বেশি পরিমাণে। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে বিষয়বস্তু খুব সহজ ও সরল ভাষায় পুনরায় শিক্ষণ কার্যে ব্রতী হবেন। Interactive approach ও শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সমস্যায় সমাধান করবেন। প্রয়োজনে তিনি Self Instructional Material তৈরি

করে ওই ধরনের শিক্ষার্থীদের পড়তে উৎসাহিত করবেন। সাধারণত পুনঃশিক্ষণে অনেক সময় শিক্ষক বিরক্তবোধ করেন। কিন্তু Remedial Teaching-এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ভিত্তিক ত্রুটিগুলি মোচন করা এবং শিখনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

পুনঃশিক্ষণের পরবর্তী কার্যাবলি (Post Teaching Activities in Remedial Teaching) : পুনঃশিক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত আচরণ রপ্ত করতে পারল কিনা তার জন্য পুনরায় একটি Test করা প্রয়োজন। এই Post test-এর মাধ্যমে পুনরায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিমাপ করা হয়। যেসব শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান হল না তাদের পুনরায় নির্বাচিত করে পূর্বের মতই আবার শিক্ষাদান করতে হয়। তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্যায় কথা মাথায় রেখে সেগুলির সমাধানও প্রয়োজন। ইতিহাস শিক্ষণে remedial Teaching অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ ইতিহাসের ঘটনা অবিচ্ছেদ্য নয়। সময়ের নিরিখে ধারাবাহিক ঘটনা-প্রবাহ জনিতে বিশেষ কোনো একটি ঘটনা অজানা থাকলে পূর্ণাঙ্গ ঘটনার ধারণা গঠনে স্বচ্ছতা আসে না।

❑ ৫.২.৫ মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা (Construction of assessment tools like achievement test) :

● **পারদর্শিতার অভীক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Achievement Test) :**

বিভিন্ন শিক্ষামনোবিদ্ পারদর্শিতার অভীক্ষাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নীচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হল—

Thorndike এবং Hagen (1969) বলেছেন, "The type of ability test that describes what a person has learned to do is called an achievement test." অর্থাৎ, পারদর্শিতার অভীক্ষা হল একধরনের দক্ষতা-পরিমাপক অভীক্ষা যার সাহায্যে কোনো ব্যক্তির কর্মসম্পাদন মূলক শিখন পরিমাপ করা হয়।

Gronlund (1977)-এর মতে "an achievement test is a systematic procedure for determining the amount a student has learned through instruction." অর্থাৎ, শিক্ষাগত নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন পরিমাপের সুসংবন্ধ প্রক্রিয়াই হল পারদর্শিতার অভীক্ষা।

Popham W. James তাঁর 'Modern Educational Measurement' (1990) গ্রন্থে পারদর্শিতা অভীক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন— "Tests is the cognitive or psychomotor realm are often focussed on an examinee's attainment at a given time ; these tests are usually referred to as achievement tests."

Scanned with CamScanner

মনোবিদ্ J.C. Nunnely বলেছেন, "The purpose of achievement test is to measure progress in School upto a particular point in time." অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের কোনো বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত তার শিক্ষাগত অগ্রগতির পরিমাপের কৌশলই হল পারদর্শিতার অভীক্ষা।

উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী সুনিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা বিশেষ কোনো কর্মসম্পাদনের যে দক্ষতা অর্জন করে তা পরিমাপ করার কৌশলই হল পারদর্শিতার অভীক্ষা।

◆ **উত্তম পারদর্শিতা-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Good Achievement Test) ঃ**

Gronlund এবং Linn (1990) একটি উত্তম পারদর্শিতা-অভীক্ষার নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন। যথা—

(i) অভীক্ষাটি কাঠিন্যমাত্রা ও পার্থক্য নির্ণায়ক মাত্রার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে এবং প্রয়োগ করা হবে।

(ii) পরিমাপযোগ্য আচরণের একটি বিবরণ থাকবে।

(iii) প্রতিটি পরিমাপযোগ্য আচরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অভীক্ষাপদ থাকবে।

(iv) অভীক্ষা প্রয়োগ ও স্কোরদানের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে।

(v) বিভিন্ন শিক্ষাস্তর ও বয়সের জন্য অভীক্ষার পৃথক পৃথক নর্ম্ (norm) থাকবে।

(vi) সদৃশ এবং তুলনীয় বিকল্প অভীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(vii) অভীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলী ও নমুনা উত্তরপত্র থাকবে।

(viii) নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ হতে হবে এবং প্রাপ্ত স্কোরগুলি পরস্পর তুলনাযোগ্য হতে হবে।

◆ **পারদর্শিতার অভীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Achievement Test) —**

উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ—

(1) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কতখানি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে তা পরিমাপ করা।

(2) বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যগুলি শ্রেণিকরণ করা।

(3) যে ধরনের শিখন অভিজ্ঞতাগুলি এই উদ্দেশ্যপূরণে সর্বাধিক কার্যকরী সেগুলি আবিষ্কার করা।

(4) মূল্যায়ন ও নবীকরণের দ্বারা পাঠক্রমের উন্নতিসাধন করা।

(5) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের জন্য সংশোধনমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(6) বিশেষ বিশেষ পাঠের জন্য প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা।

(7) শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে শ্রেণিকরণ করা।

(8) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

(9) পুরস্কার ও মেধাবৃত্তি প্রদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচন করা।

(10) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির গুণগত মানের তুলনা করা।

(11) শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি অভিভাবকদের নিকট তুলে ধরা, যাতে তাঁরা সন্তানদের উপর সামর্থ্যবহির্ভূত চাহিদা পোষণ না করেন।

12) বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও ক্রমোন্নতির হার নির্ণয় করা।

◆ **পারদর্শিতার অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Achieve-ment Test) :**

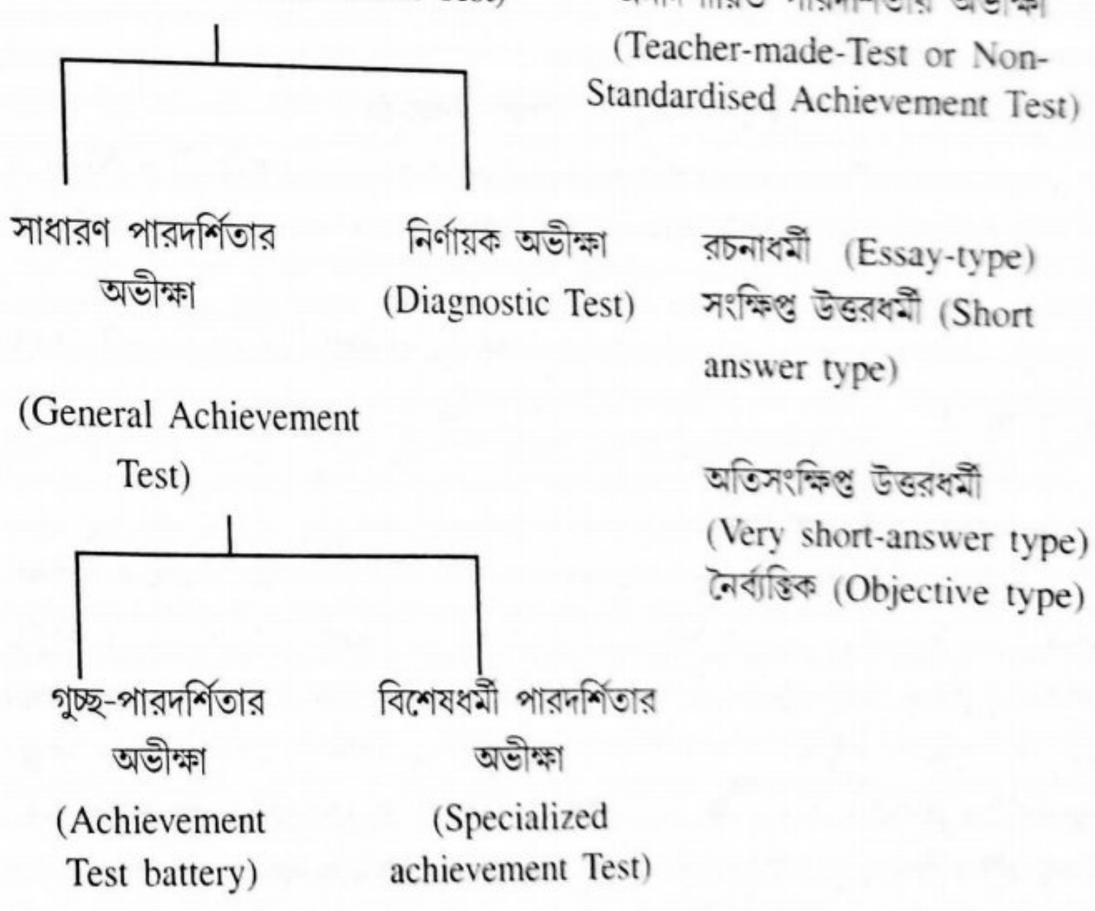

Scanned with CamScanner

● **আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা ঃ** যে সমস্ত শিক্ষাগত পারদর্শিতার অভীক্ষা উপযুক্ত নিয়ম ও বিধি অনুসারে প্রস্তুত করা হয় ও প্রয়োগ করা হয় এবং যেগুলির নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা আছে এবং যেগুলি থেকে প্রাপ্ত স্কোরসমূহ পরস্পর তুলনাযোগ্য তাদের আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা বলা হয়। ইহা দুই প্রকার। যথা—

(i) **সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষা ঃ** যে সমস্ত পারদর্শিতার অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিক্ষামূলক অগ্রগতিকে একটি মাত্র সাংখ্যমান দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাদের সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষা বলে। এই অভীক্ষা দুই ধরনের হয়। যথা—

(a) **গুচ্ছপারদর্শিতার অভীক্ষা ঃ** এই সমস্ত অভীক্ষা দ্বারা বিদ্যালয়ে পরিচালিত বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত কর্মসম্পাদন দক্ষতার পরিমাপ করা হয়।

(b) **বিশেষধর্মী পারদর্শিতার অভীক্ষা ঃ** এই সমস্ত অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোনো কর্মসম্পাদন দক্ষতার পরিমাপ করা হয়।

(ii) **নির্ণায়ক অভীক্ষা ঃ**

English এবং English (1958) নির্ণায়ক অভীক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন— "One designed to locate the particular source of a person's difficulties in learning, especially in school subjects, thus providing clues to what further measures of instruction, guidance, or study are needed. অর্থাৎ, নির্ণায়ক অভীক্ষা গঠন করা হয় শিক্ষার্থীদের বিষয়গত দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণ-পদ্ধতি ও নির্দেশনার পরিকল্পনা রচনা করার জন্য।

◆ **কয়েকটি আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষার উদাহরণ ঃ**

(i)মেট্রোপলিটান পারদর্শিতার অভীক্ষা (Metropolitan Achievement Test; MAT)।

(ii) সিকোয়েন্সিয়াল টেস্ট অফ্ এডুকেশান্যাল প্রোগ্রেস্ (Sequential Tests of Educational Progress; STEP) ।

(iii) স্কোনেলের পাটিগণিতের নির্ণায়ক অভীক্ষা (Schonell's Diagnostic Test in Arithmetic)।

(iv) আইওয়া পাঠের পারদর্শিতার অভীক্ষা (Iowa Reading Test)।

● **শিক্ষক-নির্মিত অভীক্ষা ঃ**

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি ও কর্মসম্পাদন দক্ষতা পরিমাপের জন্য শিক্ষকগণ তাঁদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অভীক্ষা প্রস্তুত করেন, যা শিক্ষক-নির্মিত অভীক্ষা হিসাবে পরিচিত। এই ধরনের অভীক্ষা নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম ও বিধি অনুসারে প্রস্তুত করা হলেও এগুলির যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকে না এবং অভীক্ষার প্রাপ্ত স্কোরগুলিও তুলনাযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট এই অভীক্ষা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষক-নির্মিত অভীক্ষা চার ধরনের হয়। যথা—

(i) **রচনাধর্মী অভীক্ষা ঃ**

Gilbert Sax তাঁর 'Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation (1989)' গ্রন্থে রচনাধর্মী অভীক্ষা সম্পর্কে বলেছেন, "Essay test is a test containing questions requiring the student to respond in writing. Essay tests emphasise recall rather than recognition of correct alternative. It may require relatively brief responses or extended responses." এই ধরনের অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষর্থীর যুক্তিসম্মত চিন্তনক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান, সুসংহত বক্তব্য-উপস্থাপনক্ষমতা ও রচনাশৈলীর পরিমাপ করা হয়।

W.B. Monroe এবং R.E. Carter (1993) রচনাধর্মী প্রশ্নের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে 17 টি প্রকারভেদের নাম উল্লেখ করেছেন।

যথা—

(1) তাৎপর্য নির্ণায়ক প্রশ্ন
(2) বর্ণনামূলক প্রশ্ন
(3) উপায় নির্ধারণমূলক প্রশ্ন
(4) সম্পর্ক নির্ণয়মূলক প্রশ্ন
(5) সমালাচনা বা মূল্যায়ন ভিত্তিক প্রশ্ন
(6) সমস্যামূলক প্রশ্ন
(7) প্রমাণমূলক প্রশ্ন
(8) তালিকা নির্ণায়ক প্রশ্ন
(9) কার্যকারণমূলক প্রশ্ন
(10) যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন
(11) তুলনামূলক প্রশ্ন
(12) প্রয়োগমূলক প্রশ্ন
(13) আলোচনামূলক প্রশ্ন
(14) সংক্ষিপ্তকরণ প্রশ্ন
(15) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন
(16) উদাহরণমূলক প্রশ্ন
(17) উদ্দেশ্যবিবৃতিমূলক প্রশ্ন

(ii) **সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী অভীক্ষা ঃ** বিশিষ্ট শিক্ষামনোবিদ্ N.E. Gronlund (1985) বলেছেন— "The short-answer item that can be answered by a word, phrase, number or symbol."

এই ধরনের অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীরা দু-একটি বাক্যের সাহায্যে অভীক্ষাপদের উত্তর দেয়।

(iii) **অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী অভীক্ষা ঃ** এই ধরনের অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীকে একটি মাত্র শব্দ বা বাক্যের সাহায্যে উত্তর দিতে বলা হয়।

(iv) **নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ঃ** নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে শিক্ষামনোবিদ Lou M. Carey (1988) বলেছেন— "Objective test items require students to work or select a correct or best answer. These items are called objective because they can be scored more objectively than any other type of item used to measure students' performance."

এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরদানের সময় শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট শব্দ বা সংখ্যা বা চিহ্ন নির্বাচন করতে হয় যা ঐ প্রশ্নের সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য উত্তর।

Scanned with CamScanner

নমুনা-১

Class : সপ্তম
Subject : ইতিহাস
Unit : মুঘল সাম্রাজ্য

1. Instructional Objectives :
(i) বাবর কীভাবে বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তা বলতে পারবে।
(ii) হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল আফগানের যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল তার ধারণা দিতে পারবে।
(iii) শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবে।
(iv) আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যে যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার ধারণা দিতে পারবে।
(v) জাহাঙ্গীর-এর সময় মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদার ও আফগানদের যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে পারবে।
(vi) শাহাজাহানের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বলতে পারবে।
(vii) ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবে।

2. Making Design :

ebook.dascoaching.in

(i) Weightage to unit / sub-units
(ii) Weightage to Instructional objectives.
(iii) Weightage to type of questions.
(iv) Weightage to levels of difficulty
(v) Weightage to length and time aloted.

(i) Weightage to unit / sub-units

Unit	Sub-units	Total Marks	% of Marks
মুঘল সাম্রাজ্য	বাবর	4+3=7	23.33%
,,	হুমায়ুন	1	3.33%
,,	আকবর	9+1=10	33.33%
,,	জাহাঙ্গীর	1	3.33%
,,	শাহাজাহান	1	3.33%
,,	ঔরঙ্গজেব	6	20 %
,,	শেরশাহ	4	13.33%

(ii) Weightage to Instructional objectives :

Objectives	Marks	%of Marks
Knowledge	12	40%
Understanding	5	16.67%
Application	9	30%
Skill	4	13.33%
	= 30	= 100%

(iii) Weightage to type of questions :

Type of questions	Marks for each	No. of questions	Total marks	% of marks
Very	1	8	8	26.67%
Short	3	4	12	40%
Essay	5	2	10	33.33%
			= 30	= 100%

(iv) Weightage to Level of difficulty :

Objectives	Marks	%of Marks	difficulty level
Knowledge	12	40%	প্রশ্নপত্রের কাঠিন্যমান মাঝারি ধরনের
Understanding	5	16.67%	
Application	9	30%	
Knowledge	12	40%	

(v) Weightage to length and time aloted :

Tipe of questions	Expected lengh (Wa/se)	Expected time	Total time	% of Time
Very short	1sen.	1 min	8 mins	13.33%
Short	400 words	4 mins	16 mins	26.67%
Essay	150 words	18 mins	36 mins	60.0%

3. Blueprint :

	Knowledge			Understanding			Applicatio			Skill			Total
	VSA	S	E	VSA	S	E	VSA	S	E	VSA	S	E	
	$(4)_1$	$(1)_3$	$(1)_5$	$(2)_1$	$(1)_3$	–	$(1)_1$	$(1)_3$	$(1)_5$	$(1)_1$	$(1)_3$	–	
Total	12			5			9			4			30

Scanned with CamScanner

বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের সংখ্যা এবং বন্ধনীর বাইরে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ধার্য করা নম্বর নির্দেশ করছে।

4. **Test paper construction :**

বিদ্যালয় ঃ —

বিষয় ঃ ইতিহাস

পাঠ্যবিষয় ঃ মুঘল সাম্রাজ্য

শ্রেণি ঃ সপ্তম

নির্দেশ ঃ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক উত্তর যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নের ডানদিকে নম্বরের নির্দেশ আছে।

● **বিভাগ - ক**

১। অনধিক একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ 1x8=8

(i) '১৫২৬' - এর গুরুত্ব কী? (A)

(ii) চৌসার যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল? (K)

(iii) দীন-ই-ইলাহির মূল বক্তব্য কী? (U)

(iv) 'পাট্টা'- প্রথা কে প্রবর্তন করেন? (K)

(v) ভারতবর্ষের মানচিত্রে দিল্লি নির্দেশ কর। (S)

(vi) হিন্দুদের ওপর ঔরঙ্গজেব এবং আকবরের মনোভাবের কি পার্থক্য ছিল? (U)

(vii) কোন্ মুঘল সম্রাটের আমলে বাংলা ভালোভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? (K)

(viii) শাহাজাহানের শাসনকালের সময় সীমা নির্দেশ কর। (K)

● **বিভাগ - খ**

২। সংক্ষেপে (৪০টি শব্দে) উত্তর দাও । 3x4=12

(i) মুঘল সাম্রাজ্যের একটি বংশ তালিকা প্রস্তুত কর। (S)

(ii) শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা ৩টি বৈশিষ্ট্য লেখ। (U)

(iii) ইতিহাসে খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব কী? (A)

(iv) মনসবদারী প্রথা কী? (K)

● **বিভাগ - গ**

৩। বিশদে (১৫০টি শব্দে) উত্তর দাও । 5x2=10

(i) দাক্ষিণাত্য ক্ষত কী? (K)

(ii) আকবরের রাজপুত নীতির গুরুত্ব নির্ণয় কর। (A)

6. **Question wise Analysis :**

Question No.	Type of questions	Objectives	Marks aloted	Expected time	Expected length
1. i)	VSA	A	1	1 mi	1 sen.
ii)	VSA	K	1	1 ,,	1 ,,
iii)	VSA	U	1	1 ,,	1 ,,
iv)	VSA	K	1	1 ,,	1 ,,
v)	VSA	S	1	1 ,,	1 ,,
vi)	VSA	U	1	1 ,,	1 ,,
vii)	VSA	K	1	1 ,,	1 ,,
viii)	VSA	K	1	1 ,,	1 ,,
2. i)	SA	S	3	4 ,,	40 Words
ii)	SA	U	3	4 ,,	40 ,,
iii)	SA	A	3	4 ,,	40 ,,
iv)	SA	K	3	4 ,,	40 ,,
3. i)	E	K	5	18 ,,	150 ,,
ii)	E	A	5	18 ,,	150 ,,

VSA : Very Short answer.
SA ; Short answer
E ; Essay type
K : Knowledge
U : Understanding
A : Application
S : Skill

5. **Marking Scheme :**

● **বিভাগ - ক**

১। Scoring Key :

(i) প্রথম পাণিপাথের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

(ii) শের খান এবং হুমায়ুনের মধ্যে।

(iii) পরধর্মসহিষ্ণুতা।

(iv) শেরশাহ।

Scanned with CamScanner

(v)

(vi) হিন্দুদের ওপর আরোপিত 'জিজিয়া কর' আকবর তুলে নিয়েছিলেন, ঔরঙ্গজেব পুনরায় আরোপ করেছিলেন।

(vii) জাহাঙ্গীর

(viii) ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রি: পর্যন্ত।

● **বিভাগ - ক** (SA)

২।

(i) মুঘল সাম্রাজ্যের (১৫২৬-১৭০৭) একটি বংশ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(ii) শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার যেকোনো তিনটি সঠিক বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে। যেমন—ধর্ম নিরপেক্ষতা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, প্রজা কল্যাণ কামীতা ইত্যাদি।

(iii) খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব লিখতে হবে।

(iv) মনসবদারী প্রথার ধারণা দিতে হবে।

৩।

(i) দাক্ষিণাত্য ক্ষতের ধারণা দিতে হবে।

(ii) আকবরের রাজ পুতনীতির গুরুত্ব লিখতে হবে—মুঘলদের পক্ষে এটি কতটা লাভজনক ও রাজপুতদের ক্ষেত্রে এটি কতটা কল্যাণকর—এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে লিখতে হবে।

নমুনা-২

Class : সপ্তম

Subject : ইতিহাস

Unit : সিপাহী বিদ্রোহ

পূর্ণমান - ৩০

সময় - ১ ঘন্টা

1. Instructional Objectives :

(i) সিপাহী বিদ্রোহের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

(ii) সিপাহী বিদ্রোহের বিস্তার সম্পর্কে বলতে পারবে।

(iii) সিপাহী বিদ্রোহের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি মানচিত্রে চিহ্নিত করতে পারবে।

(iv) সিপাহী বিদ্রোহের নেতা-নেত্রীর নাম বলতে পারবে।

(v) সিবাপী বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(vi) বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ শণাক্ত করতে পারবে।

(vii) সিপাহী বিদ্রোহের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবে।

2. Making Design :

(i) Weightage to unit / sub-units

(ii) Weightage to Instructional objectives.

(iii) Weightage to type of questions.

(iv) Weightage to levels of difficulty

(v) Weightage to length and time aloted.

Scanned with CamScanner

(i) Weightage to unit/sub-units

Unit	Sub-units	Total Marks	% of Marks
সিপাহী বিদ্রোহ	কারণ	6	20%
,,	সূচনা/বিস্তার	3	10%
,,	প্রকৃতি	4	13.34%
,,	নেতৃবৃন্দ	2	6.67%
,,	ব্যর্থতার কারণ	6	20%
,,	ফলাফল	5	16.67 %
,,	গুরুত্ব	4	13.34%

(ii) Weightage to Instructional objectives :

Objectives	Marks	%of Marks
Knowledge	12	40 %
Understanding	5	30 %
Application	9	20 %
Skill	4	10 %
	= 30	= 100%

(iii) Weightage to type of questions :

Type of questions	Marks for each	No. of questions	Total marks	% of marks
Very	1	10	10	33.34%
Short	3	5	10	33.34%
Essay	5	2	10	33.34%
			= 30	= 100%

(iv) Weightage to Level of difficulty :

Objectives	Marks	%of Marks	difficulty level
Knowledge	12	40%	প্রশ্নপত্রের কাঠিন্যমান মাঝারি ধরনের
Understanding	9	30%	
Application	6	20%	
Knowledge	3	10%	

(v) Weightage to length and time aloted :

Tipe of questions	Expected lengh (Wa/se)	Expected time	Total time	% of Time
Very short	2 words	11 min	10 mins	16.67%
Short	30 words	4 mins	20 mins	33.34%
Essay	200 words	15 mins	30 mins	50%

3. Blueprint :

বিষয় : সপ্তম

পাঠ্যবিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : নবম

পূর্ণমান - ৩০

সময় - ১ ঘন্টা

	Knowledge			Understanding			Applicatio			Skill			Total
	VSA	S	E	VSA	S	E	VSA	S	E	VSA	S	E	
	$(5)_1$	$(1)_3$	$(1)_5$	$(2)_1$	$(1)_2$	$(1)_5$	$(2)_1$	$(2)_2$	–	$(1)_1$	$(1)_2$	–	
Total	12			9			6			3			30

বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের সংখ্যা এবং বন্ধনীর বাইরে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ধার্য করা নম্বর নির্দেশ করছে।

4. **Test paper construction :**

বিদ্যালয় ঃ কাঁচরাপাড়া সারদাদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বিষয় ঃ ইতিহাস

পাঠ্যবিষয় ঃ সিপাহী বিদ্রোহ

শ্রেণি ঃ নবম

নির্দেশ ঃ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। উত্তর যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নের ডানদিকে নম্বরের নির্দেশ আছে।

● **বিভাগ - ক**

১। দুই এক কথায় উত্তর দাও ঃ 12x1=12

(ক) মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের বড়ো লাট কে ছিলেন। (K)

(খ) কত সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়? (K)

(গ) মঙ্গল পান্ডে কে ছিলেন? (K)

(ঘ) কোন্ মোঘল সম্রাট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? (K)

(ঙ) কোথায় সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল? (K)

Scanned with CamScanner

(চ) লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব-বিলোপ নীতি কেন প্রয়োগ করা হয়েছিল? (U)

(ছ) পূর্ববর্তী কোন্ কোন্ বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে তোমার মনে হয়? (A)

(জ) ব্রিটিশদের সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক কেমন ছিল? (A)

(ঝ) ১৮৫৭ সালে উন্নয়নমূলক সংস্কার বলতে কি বোঝো? (S)

(ঞ) নিম্নলিখিত স্থানগুলি মানচিত্রে চিহ্নিত কর : (S)

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, নাগপুর।

● **বিভাগ - খ**

২।(ক) এনফিল্ড রাইফেল কী? (K) 4x2=8

(খ) মহাবিদ্রোহের গুরুত্ব কী ছিল? (A)

(গ) সিপাহী বিদ্রোহে কী হিন্দু - মুসলমান ঐক্য ছিল?
তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। (U)

(ঘ) সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলী সিপাহী বিদ্রোহকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?
তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। (A)

● **বিভাগ - গ**

৩।(ক) মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ কী ছিল? (K) 2x5=10

(খ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে কেন সিপাহী বিদ্রোহ বা সামরিক বিদ্রোহ বলা হয়? (U)

5. **Marking Schame :**

● **বিভাগ - ক**

Very Short Type

১। **Scoring Key :**

(ক) লর্ড ক্যানিং

(খ) ১৮৫৭ সালে।

(গ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ।

(ঘ) মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কলকাতা রাজ্যের ১২ মাইল উত্তরে ব্যারাকপুরে।

(চ) সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্য।

(ছ) সন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোচ বিদ্রোহ, ফরাজী ও ওয়াহাবী এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ।

(জ) মোগল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোঘল পরিবার থেকে রাজা উপাধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে, লর্ড ক্যানিং-র এই ঘোষণায় মুসলমানদের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্কের অবনতি

(ঝ) পাশ্চাত্য শিক্ষা, সতীদাহ নিবারণ, রেলপথ ও টেলিগ্রামের পবর্তন।

(ঞ)

● **বিভাগ - খ (SA) Marking Scheme**

২।

(ক) এনফিল্ড রাইফেলের ধারণা দিতে হবে।

(খ) নিম্নলিখিত পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে লিখতে হবে—

- মুঘল সাম্রাজ্যের সমূলে পতন
- প্রশাসনিক পরিবর্তন
- রাজনৈতিক গুরুত্ব
- মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাবের পরিবর্তন

(গ) নিম্নলিখিত পয়েন্টের উপর জোর দিয়ে উত্তর করতে হবে—

- সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ।
- হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাহাদুর শাহকে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতীক বলে গ্রহণ করা।

(ঘ) সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন নারীশিক্ষা প্রসার প্রভৃতি সমাজ সংস্কার মূলক কার্যাবলী গোঁড়া হিন্দুদের সংস্কারে চরম আঘাত হেনেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করনের প্রয়াস। ফলে ভারতবাসী বিট্রিশ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে উত্তর লিখতে হবে।

৩। **Ecpected Outline of Answer**	**Marks division**	**Full Marks**
ক। a. বৃহৎ জনসাধারণের অভাব	1	
b. সংহতি ও আদর্শের অভাব	1	5
c. সংগঠন ও রণকৌশলের ত্রুটি	1	
d. প্রতিভাবান নেতার অভাব।	1	

Scanned with CamScanner

e. যোগাযোগ সুবিধার অভাব।

খ। ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রধানত তিনটি মতো ধারা প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতধারার উপর ভিত্তি করে উত্তরটি লিখতে হবে। এই মত ধারা তিনটি হল—

- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হল সামন্ত প্রভুদের বিদ্রোহ
- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হল সিপাহীদের বিদ্রোহ
- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

6. **Question wise Analysis :**

Question No.	Type of questions	Objectives	Marks aloted	Expected time	Expected length
1. i)	VSA	K	1	1 mi	2 words
ii)	VSA	K	1	1 ,,	2 ,,
iii)	VSA	K	1	1 ,,	2 ,,
iv)	VSA	K	1	1 ,,	2 ,,
v)	VSA	K	1	1 ,,	2 ,,
vi)	VSA	U	1	1 ,,	2 ,,
vii)	VSA	A	1	1 ,,	2 ,,
viii)	VSA	A	1	1 ,,	2 ,,
ix)	VSA	U	1	1 ,,	2 ,,
x)	VSA, SA	S	1.2 = 3	5 ,,	–
2. i)	SA	K	2	4 ,,	30 Words
ii)	SA	U	2	4 ,,	30 ,,
iii)	SA	A	2	4 ,,	30 ,,
iv)	SA	K	2	4 ,,	30 ,,
3. i)	E	K	5	15 ,,	200 ,,
ii)	E	U	5	18 ,,	150 ,,

VSA : Very Short answer.
SA ; Short answer
E ; Essay type
K ; Knowledge
U : Understanding
A : Application
S : Skill

নমুনা-৩

বিদ্যালয়ের নাম :
বিষয় :
শ্রেণি : নবম
পাঠ একক : মোঘল যুগের ইতিহাস

পূর্ণমান - ৩০
সময় - ১ ঘন্টা

১. **Instructional Objectives :**

(ক) মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবরের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে পারবে।

(খ) হুমায়ূনের রাজত্বকালে মোঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে।

(গ) মোঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পিছনে সম্রাট আকবরের ভূমিকা কেমন ছিল তা নির্ণয় করতে পারবে।

(ঘ) সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।

(ঙ) সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(চ) মোঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি মানচিত্রে নির্দেশ করতে পারবে।

(ছ) সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হয়েছিল সে বিবরণ দিতে পারবে।

(জ) মোঘল সাম্রাজ্যের পতনে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা কতখানি তা ব্যাখ্যা দিতে পারবে, মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. **Making Design :**

(ক) weightage to unit / subunits.

(খ) weightage to instructional objectives.

(গ) weightage to type of questions

(ঘ) weightage to levels of difficulty

(ঙ) weightage to length and time alloted.

Scanned with CamScanner

ক. **Weightage to unit / sub units :**

Unit	Sub-unit	Name	Marks	%of Marks
মোগল যুগের ইতিহাস	U1	বাবর কর্তৃক মোঘল শাসন হুমায়ূনের রাজ্যবিস্তার	6	20%
,,	U2	আকবরের রাজত্বকাল	12	40%
,,	U3	জাহাঙ্গীরের, শাহজাহানের ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল	12	40%

খ. **Weightage to instructional objectives :**

Objectives	Marks	%of Marks
Knowledge	12	40%
Understanding	10	34%
Application	4	13.33 %
Skill	4	13.33 %
Total	30	100 %

গ. **Weightage to type of questions :**

Types of Question	Marks of each question	No of Questions	Total Marks	%of Marks
Very short	1	10	10	34%
short	2	4	8	26.66%
Essay	6	2	12	40 %
Total			30	100.66 %

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

খ. **Weightage to level of difficulty :**

Objectives	Marks	%of Marks	Difficulty level
Knowledge	12	40%	প্রশ্নপত্রের কাঠিন্যমান নানারি ধরনের
Understanding	10	34%	
Application	4	13.33%	
Skill	4	13.33%	

ঙ. **Weightage to length and time allotted :**

Types of Question	Expected length word/sent.	Expected time	Total time	%of time
Very short	2 words	1 min	10 min	16.67%
short	30 words	4 min	16 min	26.67%
Essay	200 words	17 min	34 min	56.67 %

৩. **Blue Print :**

বিষয় : ইতিহাস

পাঠ্যবিষয় : মোঘল যুগের ইতিহাস

শ্রেণি : নবম

পূর্ণমান : ৩০

সময় : ১ ঘন্টা

Objectives	Knowledge			Understanding			Application			Skill			Total		
Types of questions / Sub units	E	SA	VSA	E	SA	VSA	E	SA	VSA	E	SA	VSA	E	SA	VSA
U1	-	-	$(1)_1$	-	-	$(1)_1$	-	-	-	-	-	$(1)_1$	-	-	$(3)_3$
U2	$(1)_6$	$(1)_2$	$(1)_1$	-	$(1)_2$	$(1)_1$	-	$(1)_2$	$(1)_1$	-	-	$(1)_1$	$(1)_6$	$(3)_6$	$(4)_4$
U3	-	-	$(2)_2$	$(1)_6$	-	-	-	-	$(1)_1$	-	$(1)_2$	-	$(1)_6$	$(1)_2$	$(3)_3$
Sub Total	$(1)_6$	$(1)_2$	$(4)_4$	$(1)_6$	$(1)_2$	$(2)_2$	-	$(1)_2$	$(2)_2$	-	$(1)_2$	$(2)_2$	$(2)_{12}$	$(4)_8$	$(10)_{10}$
Total	12			10			4			4			30		

Note : বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের সংখ্যা এবং বন্ধনীর বাইরে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ধার্য করা নম্বর নির্দেশ করেছে।

Scanned with CamScanner

8. **Test paper constraction :**

বিষয় : ইতিহাস

পাঠ্যবিষয় : মোঘল যুগের ইতিহাস **পূর্ণমান :** ৩০

শ্রেণি : নবম **সময় :** ১ ঘন্টা

নির্দেশ : সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। উত্তর যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নের ডানদিকে নম্বরের নির্দেশ আছে।

● **বিভাগ - ক**

১। **অনধিক দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ** ১০ x ১ = ১০

ক. মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (K)

খ. মোঘল সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্য সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোন্‌টি (K)

গ. শৈশবে আকবরের অভিভাবক কে ছিলেন? (K)

ঘ. জাহাঙ্গীরের পূর্বনাম কী ছিল? (K)

ঙ. দিন-ই-ইলাহীর মূল কথা কী? (U)

চ. ১৫৭৬ সালের গুরুত্ব কী? (A)

ছ. আকবর ও ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির মূল পার্থক্য লেখো? (A)

জ. মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের সময় রেখা দেখাও? (S)

ঝ. সমকালীন মানচিত্রে আগ্রা চিহ্নিত করো। (S)

ঞ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কর্তৃক ব্যবহৃত কামানের বিশেষত কী ছিল? (U)

● **বিভাগ - খ**

২। **অনধিক দুই একটি বাক্যে উত্তর দাও :** ৪ x ২ = ৮

ক. দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ কবে, কার সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল? (K)

খ. মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। (U)

গ. ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করণে আকবর অনুসৃত রাজপুত নীতির গুরুত্ব কী ছিল? (A)

ঘ. মোঘল সম্রাটদের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। (S)

● **বিভাগ - গ**

৩।

৬ x ২ = ১২

ক. মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (K)

খ. শাহজাহানের রাজত্বকালকে কেন সুবর্ণযুগ বলা হয়? বিশ্লেষণ করো। (U)

8. **Marking Scheme :**

● **বিভাগ - ক**

Scoring Key

১। ক. জাহির-উদ্দিন মহম্মদ, বাবর

খ. আগ্রায় যমুনার তীরে তাজমহল।

গ. বৈরাম খাঁ।

ঘ. সেলিম

ঙ. দৈবাদেশ

চ. কামান থাকায় ইব্রাহিমের সেনাবাহিনী সহজেই বিধ্বস্ত হয়।

ছ. হলদিঘাটের প্রান্তরে রাণা প্রতাপের সঙ্গে মোঘলদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

জ. আকবর ছিলেন গুল-ই-কুল বা পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মূল ব্রত ছিল দার-উল-ইসলামে অর্থাৎ ভারতকে মুসলমানের দেশে পরিণত করা।

ঝ.

১৫৫৬ খ্রি: আকবরের সিংহাসন লাভ

১৫৬১ খ্রি: মালব জয়

১৫৭০ খ্রি: মাড়োয়ার জয়

১৬০১ খ্রি: আসিড়গড় জয়

১৬০৫ খ্রি: আকবরের মৃত্যু

ঞ.

● **বিভাগ - খ**

২। ক. দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ ১৫৫৬ খ্রি: হিমুর সঙ্গে আকবরের সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্রা আকবর দখল করে নেয়।

খ. মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যে কোনো একটি কারণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

গ. আকবরের রাজপুত নীতির উদ্দেশ্য, রাজপুত নীতির কৌশল ও ফলাফল সংক্ষেপে লিখতে হবে।

Scanned with CamScanner

● বিভাগ - গ

মোঘল সম্রাটদের তালিকা

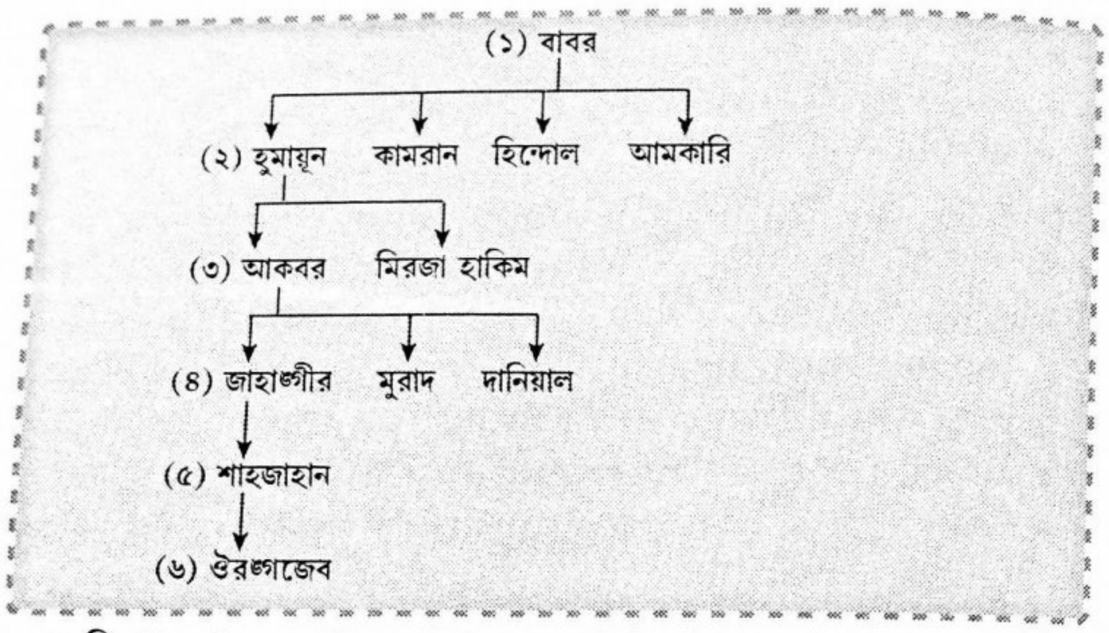

● বিভাগ - গ

৩। নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলিকে ভিত্তি করে উত্তর লিখতে হবে।

ক. ● এক উন্নত ও মানবতাবাদী শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন।
- প্রশাসন পরিচালনার জন্য অসংখ্য বিভাগ সৃষ্টি।
- ভূমি ও রাজস্ব নীতির প্রবর্তন।
- মবসবদারী প্রথা প্রচলন।
- জায়গিরদার প্রথা প্রচলন।
- সেনাবাহিনী গঠন।
- প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা।

খ. ● সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি
- অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায়।
- বিপুল সমৃদ্ধি।
- অসাধারণ শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি।

৬. **Question wise Analysis :**

Question No.	Type of questions	Objectives	Marks aloted	Expected time	Expected length
১. ক.	VSA	K	1	1 min	2 Words
খ.	VSA	K	1	1 min	2 ,,
গ.	VSA	K	1	1 min	2 ,,
ঘ.	VSA	K	1	1 min	2 ,,
ঙ.	VSA	U	1	1 min	2 ,,
চ.	VSA	U	1	1 min	2 ,,
ছ.	VSA	A	1	1 min	2 ,,
জ.	VSA	A	1	1 min	2 ,,
ঝ.	VSA	S	1	1 min	2 ,,
ঞ.	VSA	S	1	1 min	2 ,,
২. ক.	SA	K	2	4 min	30 Words
খ.	SA	U	2	4 min	30 ,,
গ.	SA	A	2	4 min	30 ,,
ঘ.	SA	S	2	4 min	30 ,,
৩. ক.	E	K	6	17 min	200 Words
খ.	E	U	6	17 min	200 ,,

VSA : Very Short answer.
SA ; Short answer
E ; Essay type
K ; Knowledge
U : Understanding
A : Application
S : Skill

Scanned with CamScanner

নমুনা-৪

বিদ্যালয়ের নাম :
বিষয় : ইতিহাস
শ্রেণি : একাদশ
পাঠ একক : সাম্রাজ্য থেকে বিশ্বযুদ্ধ

পূর্ণমান - ৩০
সময় - ১ ঘন্টা

১. Instructional Objectives :

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
(খ) ভার্সাই সন্ধির মূলনীতিগুলি আলোচনা করতে পারবে।
(গ) ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ করতে পারবে।
(ঘ) যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে।
(ঙ) জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে।
(চ) ক্ষতিপূরণ সমস্যা সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবে।
(ছ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কেলগ ব্রিঁয়া চুক্তির গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবে।

২. Making Design :

(ক) weightage to unit / subunits.
(খ) weightage to instructional objectives.
(গ) weightage to type of questions.
(ঘ) weightage to levels of difficulty
(ঙ) weightage to length and time alloted.

ক. Weightage to unit / sub-units :

Objectives	Marks	%of Marks	Marks	%of Marks
সাম্রাজ্য থেকে বিশ্বযুদ্ধ	U1	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ, ভার্সাইসন্ধি	10	33.33 %
,,	U2	ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলি, যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা	8	26.66 %
,,	U3	ক্ষতিপূরণ সমস্যা ক্ষতিসংঘ, কেলগ ব্রিঁয়া চুক্তি	12	40 %

খ. Weightage to Instructional objectives :

Objectives	Marks	%of Marks
Knowledge	14	40.67 %
Understanding	9	30 %
Application	6	20 %
Skill	1	3.33 %
Total	30	100%

গ. Weightage to type of questions :

Types of Question	Marks of each question	No of Questions	Total Marks	%of Marks
Very short	1	10	12	33.33 %
short	2	4	8	26.67 %
Essay	6	2	12	40 %
Total			30	100 %

ঘ. Weightage to Level of difficulty :

Objectives	Marks	%of Marks	Difficulty level
Knowledge	12	46.67%	প্রশ্নপত্রের কাঠিন্যমান সহজ
Understanding	9	30%	
Application	6	20%	
Knowledge	3	10%	
Skill	1	3.33 %	
Total	30	100 %	

ঙ. Weightage to length and time time allotted :

Tipe of questions	Expected lengh Word/Sent	Expected time	Total time	% of Time
Very short	2 words	1 min	10 mins	16.67%
Short	30 words	5 mins	20 mins	33.34%
Essay	200 words	15 mins	30 mins	50%
Total			60 min	100%

Scanned with CamScanner

৩. Blue Print :

বিষয় : ইতিহাস
পাঠ্যবিষয় : সাম্রাজ্য থেকে বিশ্বযুদ্ধ
শ্রেণি : একাদশ

পূর্ণমান : ৩০
সময় : ১ ঘণ্টা

Objectives	Knowledge			Understanding			Application			Skill			Total		
Types of questions / Sub units	E	SA	VSA	E	SA	VSA	E	SA	VSA	E	SA	VSA	E	SA	VSA
U1	$(1)_6$	$(2)_4$	$(2)_2$	$(1)_6$	-	-	-	-	$(1)_1$	-	-	$(1)_1$	$(2)_{12}$	$(2)_4$	$(4)_4$
U2	-	-	-	-	-	$(1)_1$	-	-	$(1)_1$	-	-	-	-	-	$(2)_2$
U3	-	-	$(2)_2$	-	$(1)_2$	-	-	$(1)_2$	$(1)_2$	-	-	-		$(2)_4$	$(4)_4$
Sub Total	$(1)_6$	$(2)_4$	$(4)_4$	$(1)_6$	$(1)_2$	$(1)_1$	-	$(1)_2$	$(4)_4$	-	-	$(1)_1$	$(2)_{12}$	$(4)_8$	$(10)_{10}$
Total	14			9			6			1			30		

Note : বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের সংখ্যা এবং বন্ধনীর বাইরে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য কাট করা নম্বর নির্দেশ করেছে।

৪. Test paper constraction :

বিদ্যালয় :
বিষয় : ইতিহাস
পাঠ্যবিষয় : সাম্রাজ্য থেকে বিশ্বযুদ্ধ
শ্রেণি : একাদশ

নির্দেশ : সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। উত্তর যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নের ডানদিকে নম্বরের নির্দেশ আছে।

● **বিভাগ - ক**

১। অনধিক দুই এক কথায় উত্তর দাও ঃ ১০ x ১ = ১০

ক. ত্রিশক্তি চুক্তি কাদের নিয়ে গঠিত হয়?
খ. ভার্সাই সন্ধি কতসালে স্বাক্ষরিত হয়?
গ. জেনেভা প্রোটোকল কোন দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
ঘ. ইয়ং কমিটি কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
ঙ. বিসমার্ক/উড্রো উইলসন/পয়েঁকার কে চৌদ্দদফা শর্ত ঘোষণা করেন?
চ. ত্রিশক্তি মৈত্রী সম্পাদিত হয় _____ সালে। (A)
ছ. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় _____ সালে। (A)

জ. জেনেভা প্রোটোকলের গুরুত্ব কী ছিল? (A)
ঝ. চতুঃশক্তি চুক্তির ধারণাটির গুরুত্ব নির্ণয় কর। (A)
ঞ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর। (S)

● **বিভাগ - খ**

২। ক. সেরোজোভা হত্যাকান্ড কত শালে ঘটেছিল? এই ঘটনায় কে কাকে হত্যা করেছিলেন? (K)
খ. Big Four বা চার প্রধান নামে কারা পরিচিত। (K)
গ. জাতিসংঘের দুটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। (U)
ঘ. ভয়েস পরিকল্পনা কেন গুরুত্বপূর্ণ (A)

● **বিভাগ - গ**

৩। ৬ x ২ = ১২
ক. ত্রিশক্তি আঁতাত কেন ও কীভাবে গড়ে ওঠে? (U)
খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের কারণগুলি কী ছিল তা আলোচনা কর। (K)

৪. Marking Scheme :

● **বিভাগ - ক**

Scoring Key

১। ক. ইতালী জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে নিয়ে
খ. ১৯১৯ সালের ২৮ শে জুন স্বাক্ষরিত হয়।
গ. গ্রিস ও চেকোশ্লোভাকিয়া এই দুটি দেশ নিয়ে গঠিত হয়।
ঘ. মার্কিন অর্থনীতিবিদ আওয়েন ভি ইয়ং এর নেতৃত্বে।
ঙ. উড্রো উইলসন।
চ. ১৯০৭ সালে।
ছ. ১৯১৯ সালের ২৮ শে এপ্রিল।
জ. এই প্রোটোকল অনুযায়ী যে কোন ধরনের আক্রমনাত্মক যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে অভিহিত করা হয় এবং দলিলে স্বাক্ষর কোনা দেশেই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না।
ঝ. চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্থির হয় যে, সকলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পারস্পরিক অধিকার মেনে চলবে এবং কোনো মত পার্থক্য দেখা দিলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেবে।

Scanned with CamScanner

ঞ.

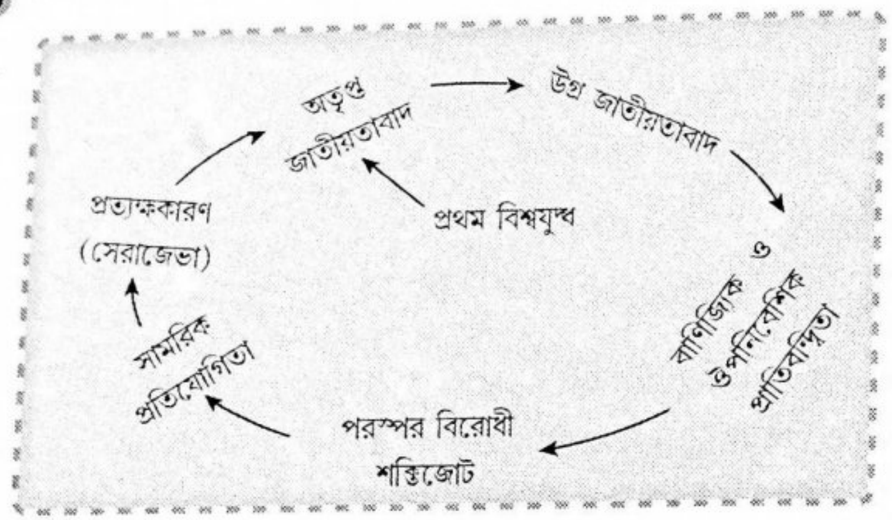

● **বিভাগ - খ**

২। ক. ১৯১৪ সালের ২৮ সে জুন। ইউনিয়ন অব ভেথ এর সদস্য ন্যাভরিলো প্রিন্সেস অ স্টিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড ও পত্নী সোফয়াকে হত্যা করেছলেন।

খ. মার্কিন রাস্ট্রপতি উড্রো উড্রো উইলম্বন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেশোঁ এবং ইতালীর প্রধানমনত্রী অর্লান্ডো।

গ. (i) পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে।
(ii) ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে।

ঘ. জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনরুজ্জীবন ছাড়া ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন অর্তনীতি বিশেষজ্ঞ চার্লস ভয়েস এর নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়।

● **বিভাগ - গ**

৩। ক. ● কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের মৈত্রী সম্পর্ক উপেক্ষা।
● রাশিয়ার ক্ষুব্ধ হওয়া।
● ফ্রাঙ্কো রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া।
● ফ্রান্সের নিঃসঙ্গতার অবসান।
● কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব।
● ইংল্যান্ডে ফ্রান্সের পারস্পরিক বিরোদের অবসান।
● ইংল্যান্ড-ফ্রান্স রাশিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত।

খ. ● সামরিক দিক থেকে মিত্রপক্ষের শক্তি অপেক্ষা জার্মানির শক্তি দুর্বল।
● স্পল্প মেয়াদী যুদ্ধ উপকণ।
● নৌশক্তির দুর্বলতা।
● কুটনীতির দ্বারা ত্রিশক্তি জোটে ভাঙন।

● আক্রমনাত্মক যুদ্ধ অপেক্ষা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অপরাদর্শী
● ইতালীর জার্মানির প্রতি সহযোগীতাহীন।

৬. **Question wise Analysis :**

Question No.	Type of questions	Objectives	Marks aloted	Expected time	Expected length
১. ক.	VSA	K	1	1 mim	2 Words
খ.	VSA	K	1	1 mim	2 ..
গ.	VSA	K	1	1 mim	2 ..
ঘ.	VSA	K	1	1 mim	2 ..
ঙ.	VSA	U	1	1 mim	2 ..
চ.	VSA	U	1	1 mim	2 ..
ছ.	VSA	A	1	1 mim	2 ..
জ.	VSA	A	1	1 mim	2 ..
ঝ.	VSA	S	1	1 mim	2 ..
ঞ.	VSA	S	1	1 mim	2 ..
২. ক.	SA	K	2	5 mim	30 Words
খ.	SA	K	2	5 mim	30 ..
গ.	SA	U	2	5 mim	30 ..
ঘ.	SA	A	2	5 mim	30 ..
৩. ক.	E	U	6	15 mim	200 Words
খ.	E	K	6	15 mim	200 ..

VSA : Very Short answer.
SA : Short answer
E ; Essay type
K ; Knowledge
U : Understanding
A : Application
S : Skill

Scanned with CamScanner

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 2

১। মূল্যায়ন কী? (Whst is evaluation.)
২। গঠনধর্মী মূল্যায়ন কাকে বলে? (What is Formative evaluation)
৩। সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন কাকে বলে? (What is competency based evaluation)
৪। মূল্যায়ণ ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference between evaluation and measurement?)
৫। মূল্যায়নের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন। (Write two purposes of evaluation.)
৬। মূল্যায়নের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন। (State two importance of evaluation.)
৭। মূল্যায়নের কৌশল হিসাবে রেটিং স্কেল কী? (What is observation as evaluation device?)
৮। মূল্যায়নের কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণ কাকে বলে? (What is observation as evaluation device?)
৯। সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন কাকে বলে? (What is summative evaluation)
১০। প্রশ্নমালা কী? (What is questionnaire?)
১১। প্রবণতা কী? (What is optitude?)
১২। মনোভাব বা প্রতিন্যাস কী? (What is attitude?)
১৩। নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন কাকে বলে? (What is diagnose and remediation)
১৪। সমষ্টিগত মূল্যায়ণ কাকে বলে? (What is summative evaluation?)
১৫। কোনো অভীক্ষার নৈব্যক্তিকতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by objectivity of a test?)
১৬। একটি সুঅভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by reliability of a good test?)
১৭। একটি ভালো অক্ষীক্ষার যথার্থতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by validity of a good test?)
১৮। অভীক্ষার আদর্শায়ন বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by standardization of a test?)
১৯। একটি সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of a good test?)

২০। অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by practicality of a test?)
২১। রচনাধর্মী পরীক্ষা কাকে বলে? (What is Essay type test?)
২১। নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক পরীক্ষা কাকে বলে? (What is Objective type test?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। মূল্যায়ণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (State the nature and characteristics of evaluation.)
২। পরিমাপের ধারণা দিন। (Give the concept of measurement?)
৩। সামর্থভিত্তিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (State the characteristics of competency based evaluation.)
৪। সামর্থভিত্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব উল্লেখ করুন। (State the importance of competency based evaluation.)
৫। মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the purpose of evaluation?)
৬। মূল্যায়ণের গুরুত্বগুলি কী কী? (What are the purpose of evaluation?)
৭। প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of a questionmaire?)
৮। সাক্ষাৎকার এর বিভিন্ন পর্যায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (Describe in brief the different steps of Interview.)
৯। সমষ্টিগত মূল্যায়ণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (State the different characteristies of summative evaluation.)
১০। গঠনমূলক মূল্যায়ণ ও সমষ্টিগত মূল্যায়ণের মধ্যে পার্থক্য কী? (What are the different between formative and summative evaluation?)
১১। রচনাভিত্তিক পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (State the characteristics of Essay type test.)
১২। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (State the characteristics of Objective type test.)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks – 10

১। মূল্যায়ণের পরিধি আলোচনা করুন। (Discuss the scope of evaluation.)
২। মূল্যায়ণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (Describe the importance of evaluation.)

Scanned with CamScanner

৩। মূল্যায়ণের কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণ মূলক কৌশল বর্ণনা করুন। (Describe the observational technique as an evaluation device.)

৪। প্রশ্নমালা কী? প্রশ্নমালার গঠন বর্ণনা করুন। (What is questionnaire? Describe the formation of a questionnaire.)

৫। নিরবিচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ণের ধারণা বর্ণনা করুন। (Describe the concept of continuous and comprehensive Evaluation or CCE.)

৬। পারদর্শিতার অভীক্ষা কী? ইতিহাসে পারদর্শিতা অভীক্ষা গঠন আলোচনা করুন। What is Achievement Test? Discuss the construction of Achievement Test in History.)

৭। বিদ্যালয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করুন। (Discuse review of present evaluation system in West Bengal at School Level.)

৮। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইতিহাস মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতির উপায় পর্যালোচনা করুন। (Discuse suggestion for improving present evaluation system in West Bengal at Secondary and Higher Secondary Level in History.)

Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

ব্যবহারিক অংশ

PRACTICUM [Engagement with Field]

নতুন বিএড পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যতম বিষয় **'সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ইতিহাস)'** [(Pedagogy of Social Science Teaching (History)] এখানে একটি অর্ধ রয়েছে এবং সিলেবাসের শেষে একটি অংশ রয়েছে, যেটি হল— 'Practicum' অর্থাৎ এই কোর্সের প্রায়োগিক অংশ। এটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে এক ক্রেডিট (One Credit) বা 50 নম্বর। এই Practicum-এর বরাদ্দ সময় 32টি ক্লাস (Class hour)।

Any two of the following :-

- Visit to
  - Historical Places
  - Ecological Places
  - Commercial Places
  - Political Places
- Organization of Programmes
  - Environment Awareness
  - Social Awareness
  - Election Awareness
  - Blood Donation
  - Exhibition
  - Demonstration of Lab-based activities wherever applicable

ভূমিকা : এই পত্রে ব্যবহারিক বা প্রয়োগিক অংশে দুই ধরনের বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ধরনে রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান, বাস্তু সংস্থানগত স্থান, বাণিজ্যিক স্থান এবং রাজনৈতিক স্থান পরিদর্শন। দ্বিতীয় ধরনে রয়েছে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রোগ্রাম সংগঠিতকরণ। এই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র হল—পরিবেশ সচেতনতা (Environment Awareness), সামাজিক সচেতনতা (Social Awareness), নির্বাচন সচেতনতা (Election Aareness), রক্তদান (Blood Donation), প্রদর্শনী (Exhibition) এবং পরীক্ষাগার ভিত্তিক প্রতিপাদন (Demonstration of Lab-based activities)।

Scanned with CamScanner

পাঠক্রমের নির্দেশ অনুসারে উপরোক্ত বিষয়গুলি সংগঠিত করার জন্য দলবদ্ধ আলোচনা, বক্তৃতা, আলোচনা, যুক্তভাবে অংশগ্রহণ করা, দলবদ্ধ কাজ করা, গৃহকাজ বা নির্দিষ্ট কোনো অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান পরিদর্শন এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

এই ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক অংশটিতে মোট ৬৪ ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দকৃত সময় তাত্ত্বিক (theoretical) বিষয় এর দ্বিগুণ এবং দুই ক্রেডিট রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ (৫০ শতাংশ)। এর দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, এই অংশে কোনো ক্ষেত্রে গুরুত্ব তাত্ত্বিক অংশের থেকে বেশি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী বা ভাবী শিক্ষক তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে তা যথেষ্টভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিখবেন এবং প্রয়োগ করবেন। এর উদ্দেশ্য হল সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা গঠনের যে উদ্দেশ্য নির্ধারিত করা হয়েছে সেগুলি হাতে-কলমে কাজে লাগাতে পারবেন এবং ত্রুটি বিচ্যুতি নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলির ধারণা গঠনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।

❑ কর্মসম্পাদনের শর্তাবলি :

এই ব্যবহারিক অংশটি সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষককে কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে তা শেখাতে হবে। মনে রাখা দরকার— এই পাঠক্রম সম্পন্ন করে শিক্ষার্থী কিন্তু একজন ভবিষ্যতের শিক্ষক হয়ে উঠবেন এবং তিনি ভবিষ্যতের নাগরিক গড়তে সাহায্য করবেন।

এই ব্যবহারিক অংশটি সম্পন্ন করতে তিনটি অংশের দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন :

(১) কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাক্ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা।

(২) কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ।

(৩) সমালোচনা ও উপসংহার।

উপরোক্ত তিনটি দিক সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) **কার্য-সম্পাদনের জন্য প্রাক্ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা :** যে-কোনো ব্যবহারিক কার্য সম্পন্ন করতে হলে প্রাথমিকভাবে সেই কার্যটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির ধারণা থাকা দরকার। যে-কোনো কার্যের ধারণাগত দিক হল প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা। বিষয়বস্তুর ধারণা বলতে কী বোঝায়? বিষয়বস্তুর ধারণা বলতে বোঝায় কার্যটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তৃতি বিবরণ। বিষয়টির পরিচিতি বা ধারণা সঠিকভাবে গঠন করতে হলে বিষয়টির অর্থ ও সংজ্ঞা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব বা উপযোগিতার দিকগুলি বিশেষত ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সঙ্গে বিষয়বস্তুটির সম্পর্ককে উপলব্ধি করা দরকার। কার্য সম্পাদনকারী

ব্যক্তিকে বিষয়বস্তুটি এত ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যেন তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। কোনো বিষয়বস্তুকে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে বা উপলব্ধি করে যদি ঐ বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে বলা যেতে পারে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণাগত দিকটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

(২) **কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ :** ব্যবহারিক কার্য সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ। কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে বিশ্লেষণী দক্ষতার দ্বারা সমগ্র বিষয়বস্তুটিকে তার বিভিন্ন অংশে পৃথক করা বা ভেঙে ফেলা দরকার। এটি হল বিযুক্তিকরণের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপ অংশে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করা দরকার হয়। অর্থাৎ সমগ্র সমস্যাটিকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করে অংশগুলিকে সনাক্ত করতে হবে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে হবে। এর ফলে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি যে বিশ্লেষণী দক্ষতার পরিচয় দেবেন তার ফলশ্রুতিতে ব্যবহারিক কার্যসম্পাদনে অনেকখানি সহজ হতে পারে।

বিশ্লেষণী দক্ষতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলে, পরের ধাপে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির কর্তব্য হল বিষয়বস্তুটির সম্পর্কে সঠিক ভাবনা গঠন করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে সংগ্রহ করা, তাদের অনুশীলন ও পুনরালোচনা করা। শুধুমাত্র তত্ত্ব পর্যালোচনাই নয়, বিভিন্ন তথ্যাবলিও সেই সঙ্গে সংগ্রহ করতে হবে। ব্যবহারিক কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষযবস্তুটির সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও তথ্যাবলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য যথেষ্ট ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সম্পর্কে আনুপূর্বিক জ্ঞান এবং সুস্পষ্ট আধিপত্য থাকতে হবে।

তথ্যাবলি সংগ্রহ করার সময়ও কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তিকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়, তথ্যগুলিকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হতে হয়, তাদের যথার্থতাও থাকা জরুরি।

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল নির্বাচন করা দরকার। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত উৎসের উল্লেখ করা যেতে পারে :

(i) শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

(ii) শিক্ষার্থীদের কার্যের বিশ্লেষণ

(iii) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন টুল (tool) বা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেগুলি আগে থেকেই যদি পাওয়া যায়, তাহলে ভালো নতুবা কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তিকে নিজে থেকেই tool প্রস্তুত করে নিতে হয়।

Scanned with CamScanner

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল (tool) অবলম্বন করা যেতে পারে :

(i) পর্যবেক্ষণ (observation)
(ii) সাক্ষাৎকার (interview)
(iii) প্রশ্নপত্র (questionnaire)
(iv) প্রক্ষেপণ (projection)
(v) ব্যক্তি তদন্ত (case study)

উপাত্ত সংগ্রহের পরবর্তী কার্যটি হল উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং তার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান। প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে; ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে, ছোটো ছোটো দল থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু উপাত্ত রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আবার কিছু তথ্য রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়াই বিশ্লেষণ করা যায়। কিছু উপাত্ত বা পরিমাণগত দিক নির্দেশ করে না, সেগুলিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি লিপিবদ্ধ করা দরকার।

উপাত্ত বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত তথ্যাবলির ব্যাখ্যা প্রদান এবং প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লেষণ-এর প্রেক্ষিতে সাধারণীকরণে পৌঁছে গিয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

(৩) **সমালোচনা ও উপসংহার :** সামগ্রিক কার্য সম্পাদন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মূল্যায়ন করা দরকার। এই মূল্যায়নের প্রসঙ্গে সম্পাদিত কার্যটির সামগ্রিক সমালোচনার প্রয়োজন হয়। কার্যটির সম্পাদনের ব্যাপারে যদি আরো উন্নতি ঘটানো বা আরো ভালো ফলাফল করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা করা দরকার।

❑ **ব্যবহারিক অংশ** (Practicum) :

এক্ষেত্রে পাঠক্রমে দুই ধরনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনো দুটি বিষয় প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী বা ভাবী শিক্ষককে হাতে কলমে কাজ করতে হবে। প্রথম ধরনের বিষয়ে আছে—

স্থান পরিদর্শন (Visit to place)

স্থান পরিদর্শনের অংশে আছে :

(১) ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Historical Places)
(২) বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শন (Visit to Ecological Places)
(৩) বাণিজ্যিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Commercial Places)
(৪) রাজনৈতিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Political Places)

ভাবী শিক্ষক যখন কোনো স্থান পরিদর্শন বা পরিভ্রমণের কাজটি করবেন তখন তাঁকে পরিদর্শন বা পরিভ্রমণের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত দুটি বিষয় হল ক্ষেত্রকর্ম (Fieldwork) সম্পাদন এবং অন্যটি হল

ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field survey)। এই ক্ষেত্রকর্ম এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার সম্পর্কে ভাবী শিক্ষকের কিছু ধারণা থাকা দরকার।

স্থান পরিদর্শনের কার্যটি সম্পন্ন করার পর ভাবী শিক্ষক তাঁর আনুপূর্বিক বিবরণ তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নলিখতভাবে উপাদান করা হল—

(১) **ভূমিকা :** যে স্থানটি পরিদর্শন করা হয়েছে তার সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পূর্বপরিকল্পনার কিছু কথাও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

(২) **পরিদর্শনের উদ্দেশ্য :** স্থানটি কেন পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পাঠ্যসূচির কোন্ উদ্দেশ্যটি পূরণ করার জন্য তথা শিক্ষা লাভের জন্য সম্পন্ন হয়েছে তা এই অংশে উল্লেখ করা থাকবে।

(৩) **পরিদর্শন পদ্ধতি :** পরিদর্শন পদ্ধতিটিকে তিনটি অংশে বা পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। সেগুলি হল—(ক) প্রাক্‌ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্ব (খ) ক্ষেত্র সমীক্ষাকাল পর্ব (গ) ক্ষেত্রসমীক্ষা পরবর্তী পর্ব।

(৪) **পরিদর্শন বর্ণনা :** যে নির্দিষ্ট স্থানটি পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল তা পরিদর্শন তথা পর্যবেক্ষণের পর স্থানটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার প্রকৃতি অনুসারে স্থানটির প্রাকৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বাস্তুসংস্থাগত, বাণিজ্যিক অথবা রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) **স্থানটির তাৎপর্যপূর্ণ দিক :** নির্ধারিত এবং পরিদর্শিত স্থানটির যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি বর্তমান সেগুলি সবিস্তরে বর্ণনা করতে হবে।

(৬) **পরিদর্শনকালীন সমস্যা ও অসুবিধা :** নির্ধারিত স্থানটি পরিদর্শনকালে ভাবী শিক্ষক যদি কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হন এবং সেই অসুবিধার কারণে সমস্যায় পড়েন তাহলে সেই অসুবিধা বা সমস্যার নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

(৭) **ভবিষ্যৎ পরামর্শ :** পরিদর্শনকালে অসুবিধা বা সমস্যাগুলি সম্পর্কে যাতে ভবিষ্যতে অন্য পরিদর্শকরা সচেতন হতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য ভাবী শিক্ষক বা ক্ষেত্রসমীক্ষকের কিছু পরামর্শ থাকা দরকার এই অংশে

(৮) **ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আশা :** নির্ধারিত স্থানটি পরিদর্শনের পর ভাবী শিক্ষকের সামগ্রিক উপলব্ধি জন্মাবে তার প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আশা প্রত্যাশার একটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা থাকবে।

(৯) **উপসংহার ও মন্তব্য :** ভাবী শিক্ষক একটি বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য উপস্থাপন করে অংশে প্রতিবেদনের উপসংহার টানবেন।

Scanned with CamScanner

❂ (১) ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Historical Places) :

ইতিহাস পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক ভ্রমণের (Educational Excursion) গুরুত্ব অপরিহার্য অপরিসীম। ইতিহাসের ঘটনাকে বাস্তবায়িত, চাক্ষুষ ও জীবন্ত করে তুলতে গেলে ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ একান্ত অপরিহার্য। তবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। তাই বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত ঘটনাবলি ও মানচিত্র পাঠের সঙ্গে এক নিবিড় ও আত্মিক যোগ-সাজস গড়ে তোলা যায় এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে। দেখে, শুনে শিখতে পারলে বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে সেই শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমন অনেক ঐতিহ্যবাহী মন্দির, মসজিদ, গির্জা, অট্টালিকা, ভগ্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রাসাদ, মিনার, স্মৃতিসৌধ প্রাচীন কীর্তি প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন করলে অতীত ঘটনাবাহি সত্যি বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় "Travelling makes a man perfact" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দেশভ্রমণ হল প্রকৃত শিক্ষার গবেষণাগার।'

● শিক্ষণে ভ্রমণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance of Excursion in Teaching History) :

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষামূলক ভ্রমণের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন–

(i) ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীদের সামনে পুস্তকের লব্ধ জ্ঞানের সামগ্রী প্রত্যক্ষ হয়, ফলে তাদের মানসচক্ষে ইতিহাসের নির্জীব ও বিমূর্ত বিষয় বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

(ii) ভ্রমণ শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমির হাত থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দেয়।

(iii) শিক্ষা ভ্রমণের দ্বারা বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ইতিহাস শিক্ষায় পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়। (History is the unending dialogue between the present and the past)।

(iv) হাতে-কলমে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের (Work experience) মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ করলে ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান আরও পরিপক্ক হয়।

(v) ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই জাতীয় পরিচয় হয় চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ। Johnson তাঁর Teaching of History গ্রন্থে বলেছেন—"The most effective appeal to the sence of reality is of course through reality itself."

(vi) ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করলে, কোনো স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, ঐ স্থানের অতীত ঐতিহ্য ভৌগোলিক পরিবেশ ও বিশেষত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বাস্তবজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

(vii) শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে, ভীতির ভাব দূর হয়, ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব ও সমবেদনার মনোভাব গড়ে ওঠে।

(viii) ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নায়কদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে দাঁড়ালে ঐতিহাসিক চেতনা জীবন্ত বলে মনে হয়।

(ix) এই ভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জন্মায়। অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

(x) ঐতিহাসিক ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথনে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হয়।

(xi) ঐতিহাসিক ভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশলাভ হয়।

(xii) তবে ভারতের বহু ভ্রমণযাগ্য ঐতিহাসিক স্থান দেখার আগ্রহ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে থাকে। আজও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, মথুরা, থানেশ্বর, বারানসী, আগ্রা, দিল্লি, তক্ষশীলা, নালন্দা, সাঁচি, অজন্তা, আন্দামান নিকোবর, সিমলা, ভাইজ্যাক, আরাকু, পুরী, গোয়া, সুরাট, মাদ্রাজ, কুরুক্ষেত্র, ব্যাঙ্গালোর, অমৃতসর।

এছাড়া আমার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের কয়েকটি জায়গা ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, বেড়াচাঁপা, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, মুকুটমণিপুর, গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন, সজনেখালি, বকখালি, হলদিয়া, নবদ্বীপ, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন, কৃষ্ণনগর, কলকাতা প্রভৃতি।

সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, ইতিহাস শিক্ষণ প্রসঙ্গে এই ভ্রমণ একান্ত অপরিহার্য শিক্ষার অঙ্গ। কারণ ভ্রমণ শুধু আমাদের আনন্দদায়ক না হয়ে উদার মানসিকতা ও চরিত্র গঠনে এবং বাস্তব জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থটিতে বলেছিলেন—দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে জাতীর উন্নয়ন করা যায়। তিনি মনে করেন, যে জাতি যত বেশি দেশভ্রমণ করে সে জাতি তত বেশি সভ্যতার, অগ্রগতির পথে বলিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বস্তুত আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় নিদর্শনগুলি যেমন— ছবি, মডেল, চার্ট, পুস্তক, মানচিত্র, Historical album, মূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিজেদের বিদ্যালয়ে Museum গড়তে পারে। তাই বিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় শিক্ষামূলক ভ্রমণ নিঃসন্দেহে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং ইতিহাস পাঠে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

Scanned with CamScanner

● **ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ :**

কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনকালে ভাবী শিক্ষক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার অবশ্যই চেষ্টা করবেন। সেই সমস্ত বিষয়গুলি হল—

(১) পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত স্থানটির অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়। অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকবে স্থানটির অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ। রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে তার প্রাদেশিক অবস্থান।

(২) ঐতিহাসিক স্থানটির উৎপত্তি ও বিকাশগত বৈশিষ্ট্য।

(৩) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাপ্তির সময়কাল।

(৪) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাপ্তির কারণসমূহ।

(৫) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবদানকারীদের অবদানের সামান্য পরিচয়।

(৬) স্থানটির অতীত ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে বর্তমান ঐতিহাসিক গুরুত্বের তুলনামূলক পরিচয়।

(৭) স্থানটির উন্নয়ন ও অবনমন অথবা ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা জড়িত থাকলে তারও পরিচয়।

(৮) স্থানটির বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণের পরিচয়, সরকারি পদক্ষেপ ও দায়িত্ব পালনের পরিচয়।

(৯) ঐতিহাসিক স্থানটির রাস্তাঘাট, স্থানীয় যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

(১০) স্থানটিতে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন—গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতির পরিচয়।

(১১) স্থানটির জনবিন্যাস সংক্রান্ত পরিচয়, যেমন—কত ধরনের জাতি, আদিবাসী গোষ্ঠী প্রভৃতির জনসংস্থাগত বিবরণ। মানুষের পেশাভিত্তিক জীবনের পরিচয় ইত্যাদি।

(১২) ঐতিহাসিক স্থানটির ঐতিহ্যগত শিল্প সংক্রান্ত পরিচয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্যের পরিচয়, অন্যান্য শিল্প-সাহিত্যগত পরিচয় এবং বিবরণ।

(১৩) ঐতিহাসিক স্থানটির উৎসব ও পার্বণ সংক্রান্ত পরিচয়।

(১৪) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্তমানে কতখানি প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(১৫) ঐতিহাসিক স্থানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণাধর্মী কার্যের পরিচয়।

● **ঐতিহাসিক স্থানের কিছু দৃষ্টান্ত :**

ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে.স্বদেশে মোটামুটি তিন দিক থেকে আমরা ভাগ করতে পারি। (i) আঞ্চলিক ক্ষেত্র, (ii) প্রাদেশিক ক্ষেত্র (iii) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র।

(i) **আঞ্চলিক ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক স্থান :** ভাবী শিক্ষকের (প্রশিক্ষণরত) নি
জেলা বা অবস্থিত ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পা
যেমন—উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত বেড়াচাঁপা, নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগ
বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ জেলায় মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি। ব্যক্তির নিজে
জেলার ঐতিহাসিক স্থানটি তার নিকট আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান হিসে
বিবেচিত হতে পারে।

(ii) **প্রাদেশিক ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক স্থান :** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ঐতিহাসি
স্থানগুলিকে এই অংশে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন—

(iii) **রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক স্থান :** আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুবমিনার
লালকেল্লা।

প্রতিবেদন লিখনে সাধারণ নিয়মাবলি

(১) সাধারণত A-4 মাপের (30 সেমি দৈর্ঘ্য ও 21 সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট) কাগজের সাদা পৃষ্ঠায় সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতিবেদন লিখতে হবে।

(২) কর্মসূচি সংগঠিতকরণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তথা প্রতিবেদনটি প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীগণ তথা ভাবী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কম বেশি 15-20 পৃষ্ঠায় রচনা করবে।

(৩) প্রতি পৃষ্ঠার বাঁদিকে ও ওপরের দিকে 35 মিলিমিটার এবং ডানদিকে ও নীচের দিকে 20 মিলিমিটার জায়গা বাদ দিতে হবে বা মার্জিন রাখতে হবে।

(৪) হাতের লেখা হবে পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট, নির্ভুল বানান যুক্ত ও সুন্দর।

(৫) মলাট পৃষ্ঠার ওপরের দিকে সংগঠিত কর্মসূচিটির নাম বা শিরোনাম লিখতে হবে।

(৬) মাঝের অংশে স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে শিক্ষার্থীর নাম।

(৭) নীচের অংশে লিখতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং যে শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষাটি দেওয়া হচ্ছে সেই শিক্ষাবর্ষের উল্লেখ থাকবে।

(৮) ভিতরের প্রথম পৃষ্ঠায় থাকবে সংগঠিত কর্মসূচিটির শিরোনাম, শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রতিবেদন উপস্থাপনের শিক্ষাবর্ষ।

(৯) ভিতরের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় থাকবে বিষয়সূচি এবং তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে শুরু হবে প্রতিবেদনের মূল লেখা।

(১০) প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে প্রাসঙ্গিক কিছু ছবি বা আলোকচিত্র এবং তথ্যাবলি।

(১১) প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে থাকবে শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর।

(১২) প্রতিবেদনের সবশেষে শিক্ষকের মূল্যায়ন বা মন্তব্য সহ স্বাক্ষর।

Scanned with CamScanner

❑ ঐতিহাসিক স্থানের চিত্র

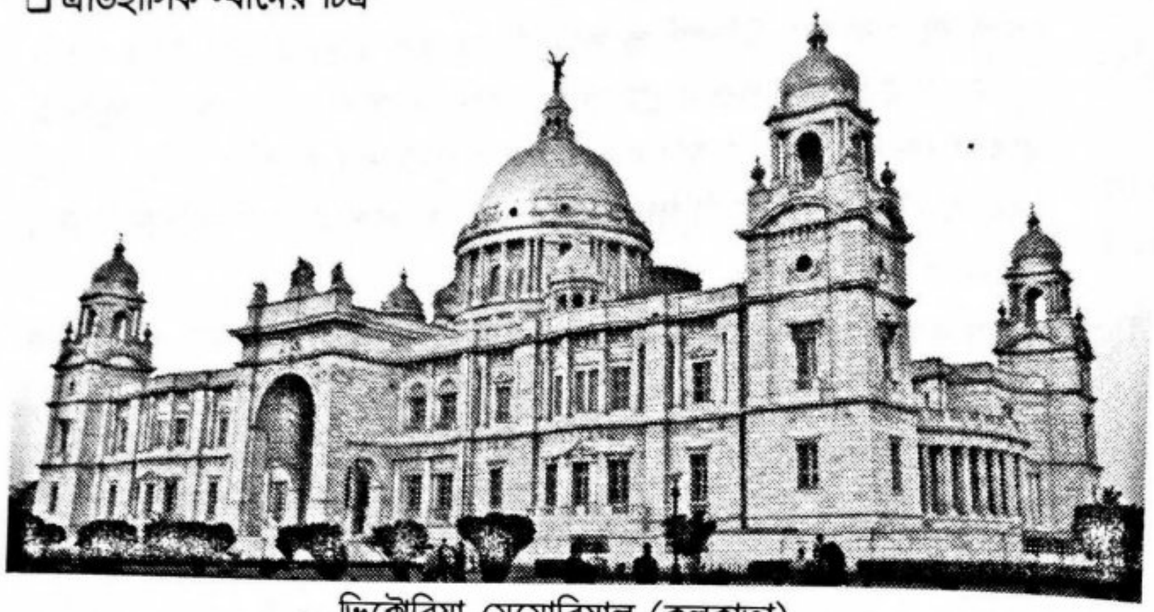

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (কলকাতা)

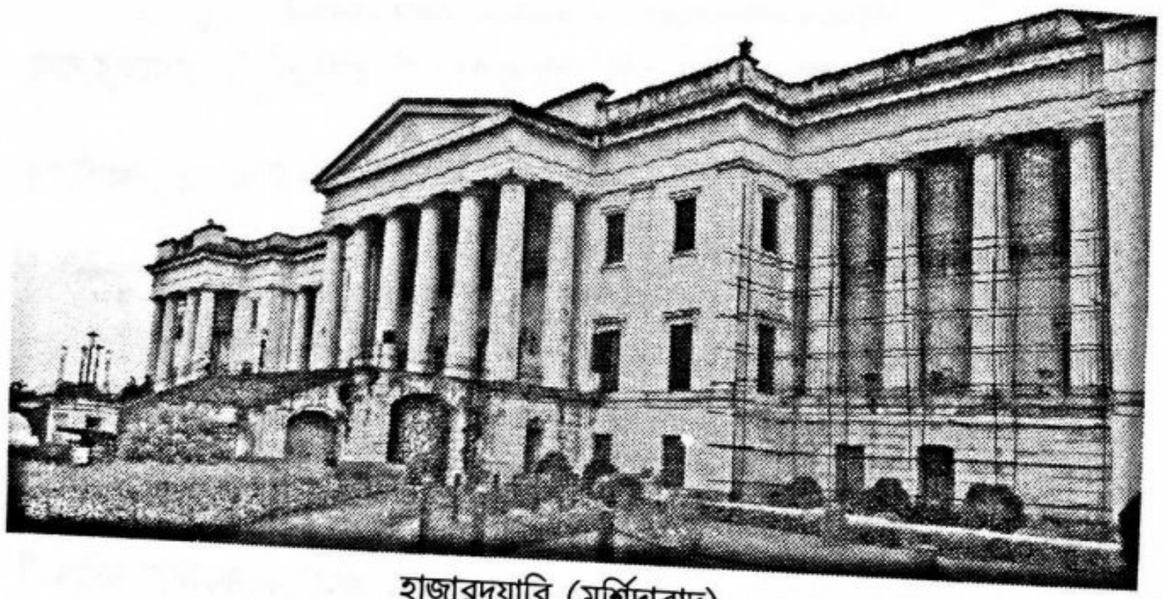

হাজারদুয়ারি (মুর্শিদাবাদ)

রাজবাড়ি (কোচবিহার)

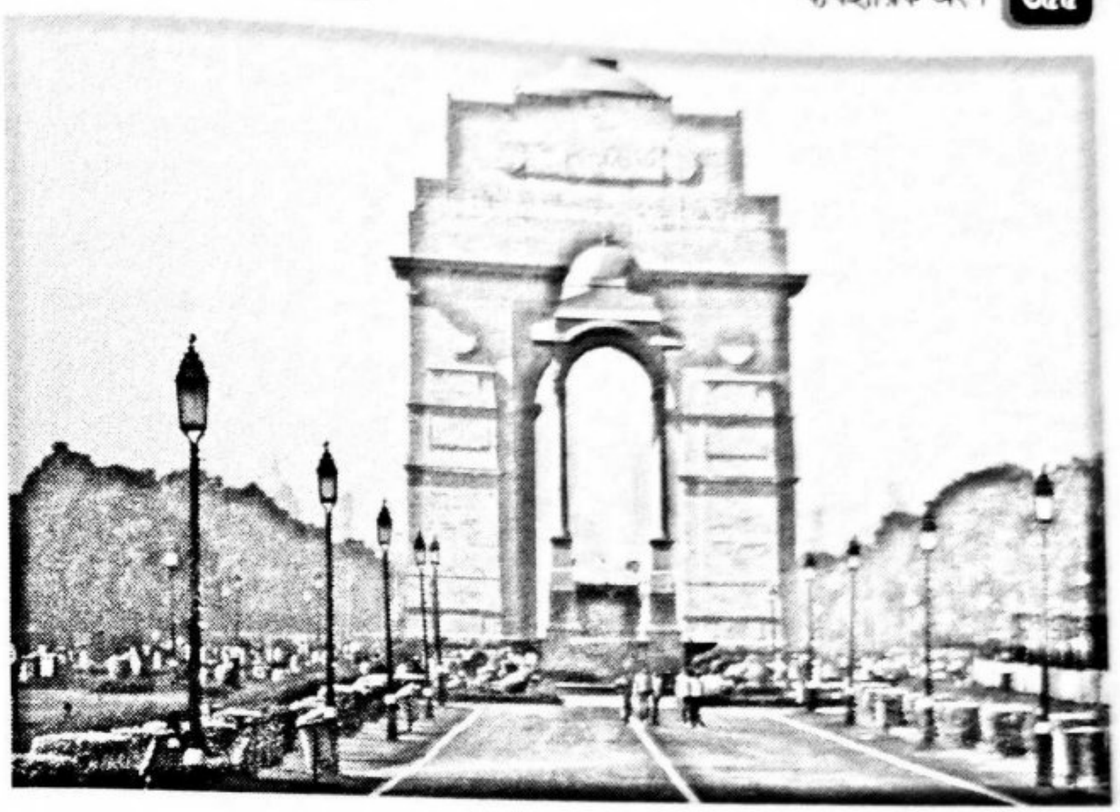

ইন্ডিয়া গেট (দিল্লি)

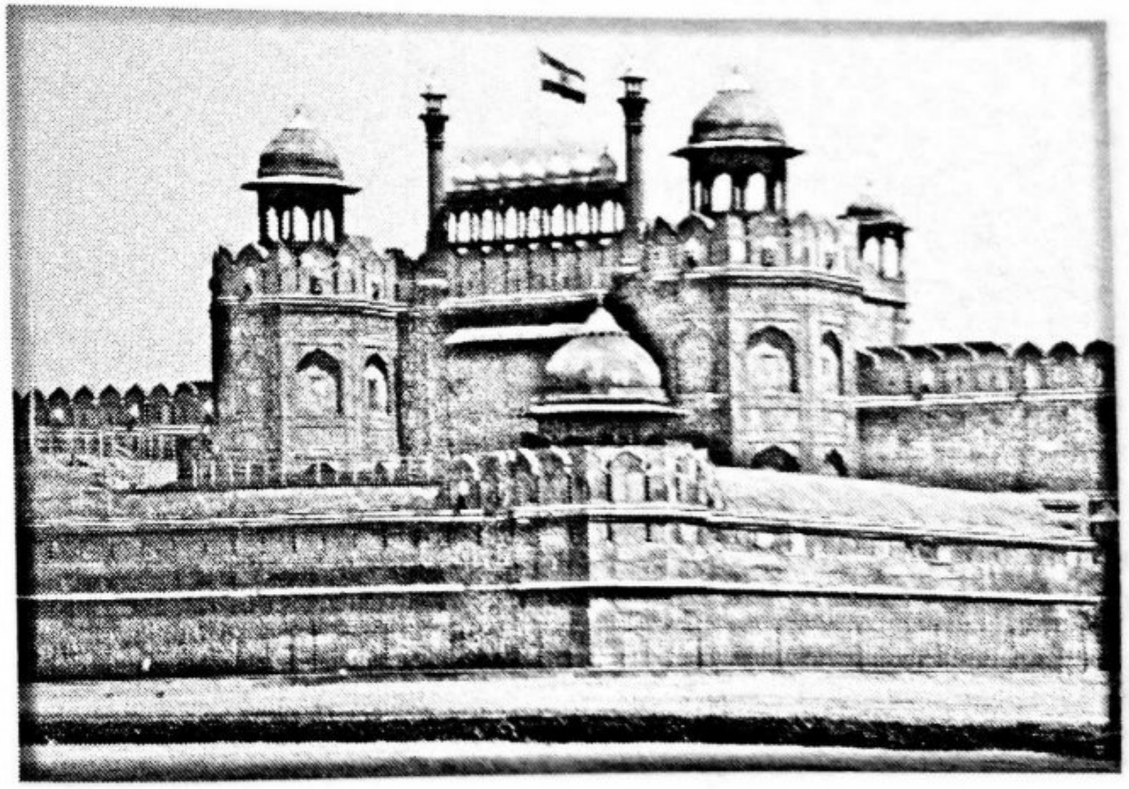

লালকেল্লা (দিল্লি)

Scanned with CamScanner

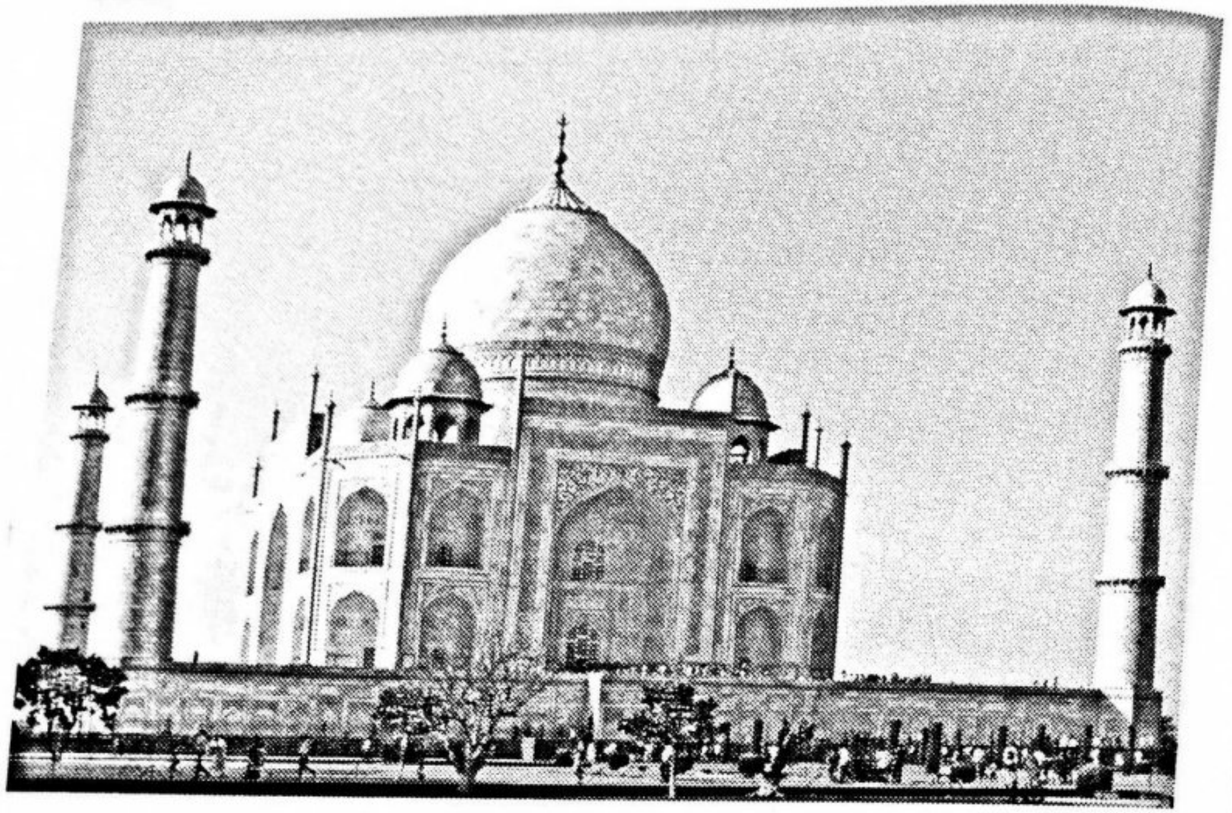

তাজমহল (আগ্রা)

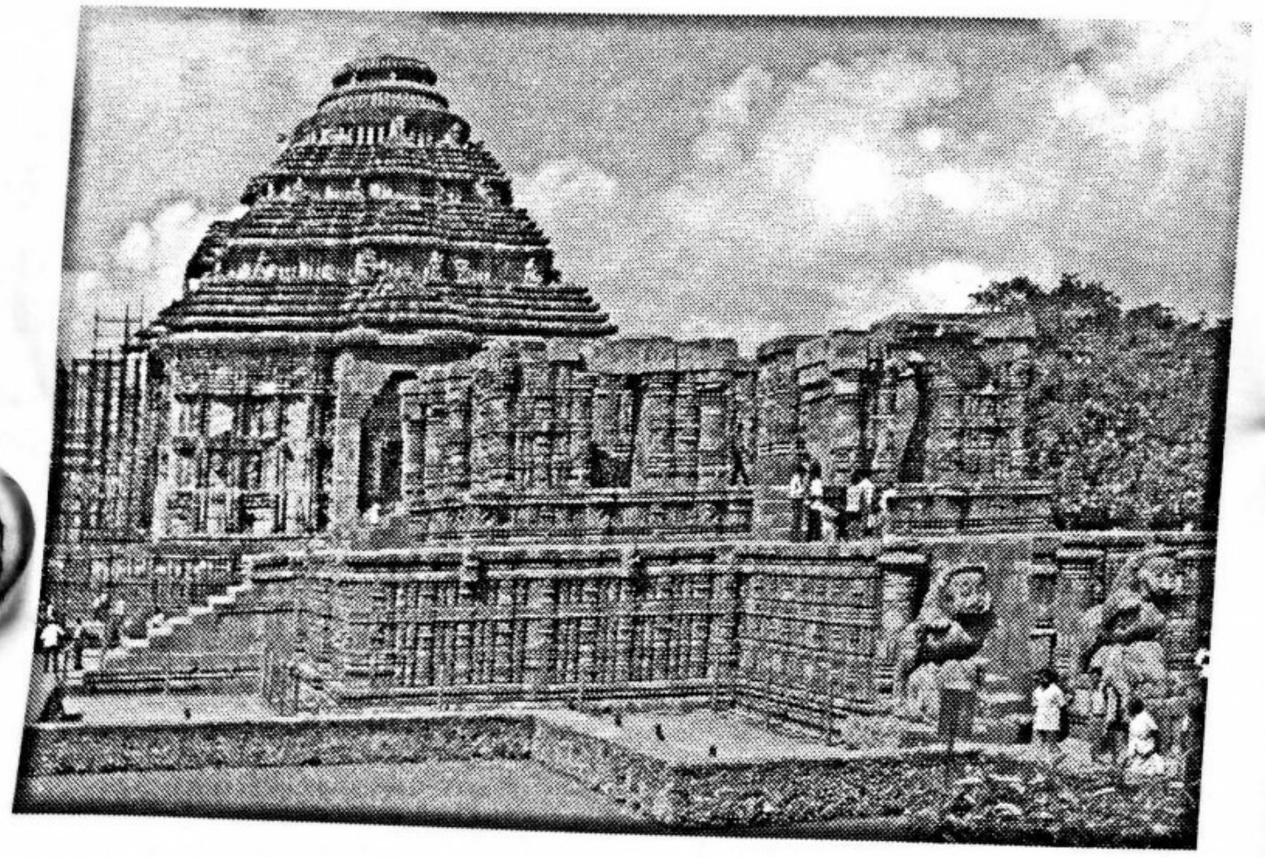

কোনারক মন্দির (ভূবনেশ্বর)

ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে নিম্নলিখিত ফর্ম্যাটে

(i) **ভূমিকা (Introduction) :** ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন প্রসঙ্গ উত্থাপন।

(ii) **উদ্দেশ্য (Objectives) :** যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শন করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যগুলি এক এক করে উল্লেখ করতে হবে।

(iii) **সামগ্রিক পরিকল্পনা (Total Planning) :** ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শনের জন্য কীভাবে সামগ্রিক পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ এই অংশে থাকবে। স্থান পরিদর্শনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে সম্পন্ন করা হবে তার পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে তুলে ধরা দরকার।

(iv) **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning) :** সমগ্র পরিদর্শনের কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান কীভাবে করা হয়েছে, আর্থিক সংস্থানের পর প্রাপ্ত অর্থ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কোথায় কীভাবে কত পরিমাণ খরচ করা হয়েছে তার বিস্তৃত ও স্পষ্ট একটি বিবরণ থাকবে এই অংশে।

(v) **পরিদর্শনের বিবরণ (Description of visit) :** মূল পরিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা থাকবে এই অংশে। স্থানটির অবস্থান, জলবায়ু, উৎপত্তি, বর্তমান অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বা অংশগুলির বিবরণ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সহ আলোচনা থাকা দরকার এই অংশে।

(vi) **প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance) :** ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতখানি তা এই অংশে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(vii) **উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark) :** সমগ্র পরিদর্শনের পর উপসংহারমূলক সামান্য আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য এই অংশে স্থান পাবে।

(viii) **কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) :** সমগ্র পরিদর্শনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া গেছে সেই সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এই অংশে।

Scanned with CamScanner

✪ (২) বাস্তু সংস্থানগত স্থান পরিদর্শন (Visit to Ecological Places) :

❑ বাস্তু সংস্থানের ধারণা (Concept of Ecology) :

ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তু সংস্থান শব্দটির মধ্যে প্রাচীনত্ব নেই। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন **হেনরি থোরু** (Henry Thoreaw) কিন্তু তিনি তাঁর পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেননি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল (Ernst Haeckel) প্রথম এই শব্দটি বর্তমান অর্থে ব্যবহার করেন। 'Ecology' শব্দটি দুটি গ্রিক মূল শব্দ 'oikos' এবং 'logy' থেকে উদ্ভূত। 'oikos' (ইকোস) শব্দটির অর্থ হল গৃহ (আবাস বা বাস্তু) এবং 'logy' (লজি) শব্দটির অর্থ হল বিজ্ঞান (বা শাস্ত্র)। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তুসংস্থান হল জীব সমূহের 'আবাস' বা 'বাস্তু' সম্পর্কে অধ্যায়ন বা জ্ঞানচর্চা।

আপন অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি জীবের কতকগুলি চাহিদা থাকে। পরিবেশ থেকেই জীব তার প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করে। এইভাবে জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীব আর পরিবেশের সম্পর্কটি বেশ জটিল প্রকৃতির। জীবের সঙ্গে পরিবেশের অন্তর্গত জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার উপাদানের দ্বারাই প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা জীব এইভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। কোনো একটি জীব তার বেঁচে থাকার জন্য তার নির্দিষ্ট পরিবেশে কীভাবে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলির সঙ্গে সহাবস্থান করে তা নিম্ন বর্ণিত রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

ebook.dascoaching.in

জীব ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে অবস্থানকারী কোনো জীব কীভাবে তার খাদক গোষ্ঠীর হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে, রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, স্ব-প্রজাতি রক্ষার্থে অপত্যের সৃষ্টি করে, আশ্রয় বা বাসস্থান তৈরি করে, প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবেশের সঙ্গে জীবটির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জীব ও পরিবেশের এই পারস্পরিক সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন বা পঠনপাঠন হল বাস্তুসংস্থানের বিষয়বস্তু। এই প্রেক্ষিতে বাস্তুসংস্থানগত কতকগুলি মূল প্রশ্ন হল—

(১) কোনো একটি জীব কেন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে অবস্থান করে?

(২) জীবটির তার নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছাড়া অন্যত্র কেন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়?

(৩) জীবটি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য কীভাবে সংগ্রহ করে?

(৪) জীবটি কীভাবে তার অপত্য জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়?

(৫) জীবটি তার জন্ম লাভের পর কীভাবে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে?

(৬) জীবটির মৃত্যুর কারণগুলি কী কী?

সুতরাং পরিবেশের সঙ্গে জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আরও বহু প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে জীব-পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাত্র জীবের কথা ধরা হয়েছে। প্রশ্নগুলি একই প্রজাতিভুক্ত সমস্ত জীবের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি আবার কোনো একটি অঞ্চলে সমগ্র জীব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হল একটি জীবগোষ্ঠী তার পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে কার্যকরী ব্যবস্থা বা প্রণালী গড়ে তোলে তাকে বলা হয় **বাস্তুতন্ত্র** (Ecosystem)। অন্যদিকে কোনো একটি স্থানের জলবায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলির ভিত্তিতে ওই নির্দিষ্ট স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণী স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যে বৃহৎ জীবতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তাকে বলা হয় **বায়োম**। যেমন—নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্য বায়োম। বিভিন্ন বায়োম সম্মিলিতভাবে গড়ে তোলে **জীবমণ্ডল** (Biosphere)।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থান (Ecological Places) :

বাস্তুসংস্থানকে ভিত্তি করে বা জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে বাস্তুসংস্থানগত স্থানগুলি। সেদিক থেকে একটি বৃহৎ প্রাকৃতিক অঞ্চল যেমন সুন্দরবন বাস্তু সংস্থানগত স্থান তেমনি আবার সুন্দরবনের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঞ্চল যেমন—কোনো পুকুর, নদী, জলাজমি ইত্যাদি। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ এই সমস্ত অঞ্চল বা স্থানগুলিতে জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল, খাদ্য পিরামিড, বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের ধারণা গঠনের জন্য প্রশিক্ষণরত শিক্ষক বা ভাবী শিক্ষকের কোনো বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শন করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। মানব সভ্যতাকে

Scanned with CamScanner

বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গঠন, পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রাখার প্রাসঙ্গিকতা, পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের প্রয়োজন আছে।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের শিক্ষাগত গুরুত্ব :

বাস্তু সংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত শিক্ষামূলক গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ আসে সেগুলি হল—

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ।

(২) পরিবেশের সঙ্গে জীবের পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়াকে উপলব্ধি করা।

(৩) বাস্তুতন্ত্রের বাস্তব ধারণা গঠন।

(৪) বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী জীবদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

(৫) কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যশৃঙ্খলের গুরুত্ব উপলব্ধি।

(৬) কোনো বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে কোনটি উৎপাদক, তার প্রকৃতি, কোনটি খাদক, কোনটি কোন শ্রেণির খাদক তা সনাক্তকরণ এবং উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে জানার সুযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ।

(৭) বাস্তুতন্ত্রের অবস্থানকারী সজীব উপাদানগুলির একটির পরিবর্তন কীভাবে অন্যটির জীবনে প্রভাব বিস্তার করে তা জানার সুযোগ।

(৮) বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জড় উপাদানগুলির সঙ্গে সজীব উপাদানের সম্পর্ক, জড় উপাদানগুলির পরিবর্তনে সজীব উপাদানগুলির পরিবর্তনে কী প্রভাব ফেলে তা জানার সুযোগ লাভ।

(৯) বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভারসাম্য নষ্ট করার ক্ষেত্রে মানুষের কার্যাবলি উপলব্ধি।

(১০) বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্টের প্রেক্ষিতে মানবজীবনে তার প্রভাব ও সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধি।

(১১) নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বাস্তুতন্ত্রের সঠিক রক্ষণে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপলব্ধি।

(১২) বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলির বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ :

বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনকালে ভাবী শিক্ষককে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার অবশ্যই চেষ্টা করবেন। সেই সমস্ত বিষয়গুলি হল—

(১) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটি ভৌগোলিক অবস্থান। রাজনৈতিক অবস্থানগত পরিচয়ও জানা প্রয়োজন।

(২) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির উপাদানগুলির সম্পর্কে পরিচয়।

(৩) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির জড় উপাদান, সজীব উপাদানগুলি কী কী সে সম্পর্কে ধারণা।

(৪) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির মধ্যে সজীব উপাদানগুলি খাদ্য-খাদক সম্পর্কে কীভাবে আবদ্ধ সেই সম্পর্কে পরিচয়।

(৫) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির অতীত ও বর্তমান অবস্থার পরিচয়।

(৬) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির মধ্যে উপাদানগুলির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য কতখানি বজায় আছে।

(৭) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মানবীয় ভূমিকা কতখানি বর্তমান।

(৮) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে তা পুনরুদ্ধারের জন্য স্থানীয় মানুষ ও সরকারি ক্ষেত্রে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং দায়িত্ব পালনে তাদের ভূমিকা কতখানি।

(৯) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটিতে কোনো সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা।

(১০) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটিতে কোনো জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) বিলুপ্তি ঘটেছে কিনা, বিলুপ্তির সম্ভাবনা আছে কিনা, থাকলে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থানের কিছু দৃষ্টান্ত :

দার্জিলিং, ডুয়ার্স-অঞ্চল, হিমালয়ের পাদদেশ, হিমালয়ের ওপর অন্যান্য অঞ্চল, সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া, বিহারীনাথ প্রভৃতি পাহাড়ি অঞ্চল, বীরভূম ও বাঁকুড়ার পশ্চিমপ্রান্তে ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের পুকুর, স্থানীয় বনাঞ্চল, জলাজমি ইত্যাদি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে নানান ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তুসংস্থানগত স্থান।

Scanned with CamScanner

❑ বাস্তুসংস্থানগত স্থানের চিত্র

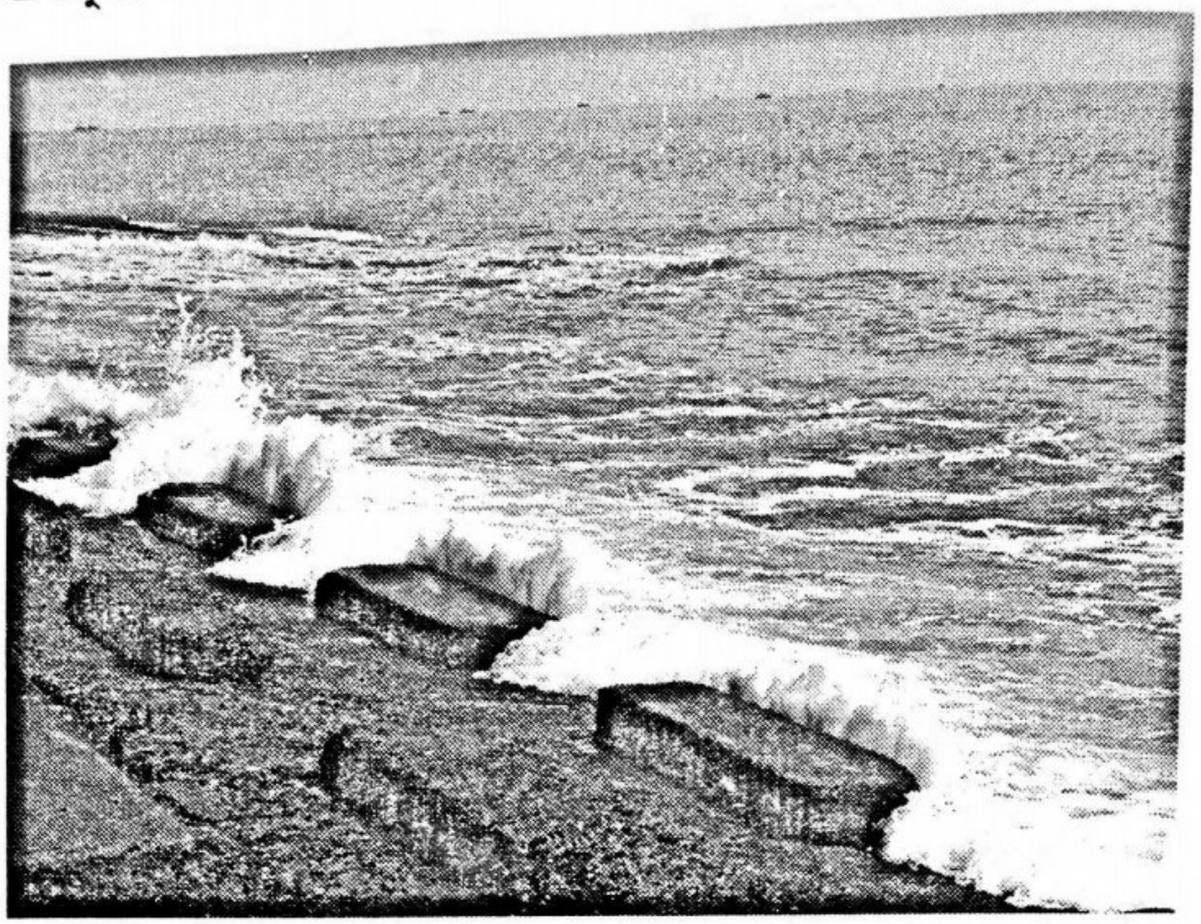

দিঘার সমুদ্র সৈকত

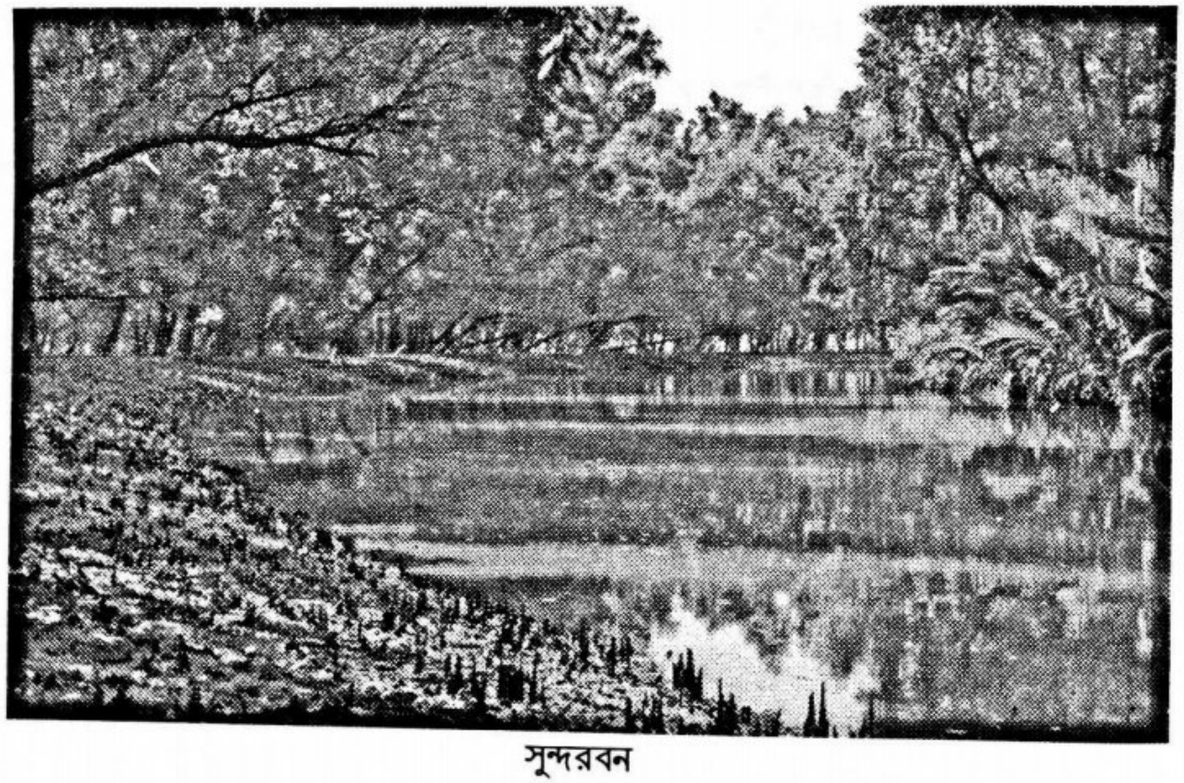

সুন্দরবন

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মসূচি সংগঠিত করার পর প্রশিক্ষণরত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ভাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিবেদন উপস্থাপনের (Reporting) বিষয়টি নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে করা যেতে পারে।

(১) ভূমিকা (Introduction)
(২) উদ্দেশ্য (Objectives)
(৩) কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work)
(৪) আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan)
(৫) কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme)
(৬) প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance)
(৭) উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark)
(৮) কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programmes)

ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক এই বিভাগটিতে আছে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি সংগঠিতকরণ। এই বিভাগের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) পরিবেশ সচেতনতা (Environment Awareness)

(ii) সামাজিক সচেতনতা (Social Awareness)

(iii) নির্বাচন সচেনতা (Election Awarness)

(iv) রক্তদান (Blood Donation)

(v) প্রদর্শনী (Exhibition)

(vi) পরীক্ষাগার ভিত্তিক কার্যাবলির প্রতিপাদন (Demonstration of Lab-based activities)

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণকে শিক্ষার্থী বা ভাবী শিক্ষকদের মধ্যে ধারণা ও তাদের প্রয়োগশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মসূচি সংগঠিতকরণের কথা এখানে বলা হয়েছে। সেই অনুসারে কাঙ্ক্ষিত ধারণা গঠন ও সেগুলির প্রয়োগশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্তীকরণের মাধ্যমে ভাবী শিক্ষকগণ ভবিষ্যতে নিজেদের কর্মস্থল বা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসারে পাঠদানের কাজটি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে এবার আমরা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

(1) পরিবেশ সচেতনতা (Environment Awareness) :

পরিবেশ সচেনতা কথাটির মধ্যে দুটি পৃথক শব্দ বর্তমান, একটি হল পরিবেশ ও অন্যটি হল সচেতনতা।

প্রথমেই আমরা দেখে নিই 'পরিবেশ' ও 'সচেনতা' বলতে কী বোঝায়? পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চারপাশের অবস্থানকারী বিভিন্ন উপাদান সমূহ, যেমন—জল, মাটি, আলো, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল, মরুভূমি, পশু-পাখি, বিভিন্ন জীবজন্তু ও কীট পতঙ্গ, উদ্ভিদ, জীবাণু প্রভৃতি এবং তাদের পারস্পরিক বিষয় নিয়ে একটি মাধ্যম। 'পরিবেশ'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'environment' যার মূলে রয়েছে ফরাসি শব্দ 'environ', যার অর্থ হল পার্শ্ববর্তী এলাকা বা আমরা যাকে বলি 'চারপাশ'। সুতরাং পরিবেশ বলতে আমরা বোঝাতে পারি, আমাদের চারপাশে যা রয়েছে তা, অর্থাৎ যে বাস্তব পরিধির মধ্যে আমরা বাস করি, সেই পরিধিতে অবস্থানকারী বস্তু সমূহ। আমাদের বসবাসের পরিধিতে অবস্থানকারী এই সমস্ত বস্তুগুলিকে বলা হয় পরিবেশের উপাদান। এই সমস্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার সম্মিলিত সত্তাই হল পরিবেশ।

এবার দেখা যাক সচেতনতা (awarness) বলতে কী বোঝায়? সচেতনতা বা awarness হ'ল কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি বা সমস্যার বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করার দক্ষতা বা সামর্থ্য। এই ধরনের দক্ষতা বা সামর্থ্য বিকাশলাভ করে তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে। এই তিনটি পর্যায় হল—সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও ধারণা গঠন। সংবেদন-এর দ্বারা যে প্রাথমিক অনুভূতি জন্মায় তাকে অর্থবহ করে তোলে প্রত্যক্ষণ। প্রাথমিক অনুভবের অর্থপূর্ণ উপলব্ধির পর মানুষ যখন একটা বোধে উপনীত হয় তখনই ঘটে ধারণা। এইভাবে প্রত্যয় লাভ মানবিক সচেতনতার এক ধরনের সক্রিয় অবস্থা। সেদিক থেকে শিক্ষা মানুষের সচেতনতার প্রকাশ ঘটায়। সুতরাং সচেতনতার অর্থ বলা যেতে পারে চেতনার সঙ্গে অর্থাৎ দেখে শুনে বুঝে কোনো কার্যসম্পাদন করা।

এবার আমরা বলতে পারি 'পরিবেশ সচেতনতা' বলতে বোঝায় আমাদের চারপাশে অবস্থানকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদান সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ককে যথার্থভাবে উপলব্ধি বা অবগতিকরণ যা পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বলতে পারি বৃক্ষছেদন রোধ ও বৃক্ষরোপণ কার্য—পরিবেশ সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এই ধরনের পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সচেনতার শিক্ষা। এটি এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে পরিবর্তিত পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের উপযোগী করে তোলে।

● পরিবেশ সচেতনতার বিভিন্ন দিক (Scope of environment awarness) :

পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রথাহীন ও প্রথাগত উভয় ধরনের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। সেগুলি হল :

(i) সামাজিক সচেতনতা (Social awareness)

(ii) বাস্তবজীবন পরিস্থিতি উপলব্ধি (Exposure to real life situation)

(iii) পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে ধারণা (Concepts of environment conservations)

(iv) স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable development)

উপরোক্ত চারটি দিক সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(i) সামাজিক সচেতনতা (Social awareness) :

সবচেয়ে উন্নত ও বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষ স্বীকৃতি পেলেও অন্যান্য জীবের মতো পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তারও সৃষ্টি হয়েছে এই প্রকৃতিতে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের কাছে পরিবেশ প্রতিভাত হয়েছে দু'ভাবে—প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ হিসেবে। মানুষকে

Scanned with CamScanner

তার অস্তিত্ব রক্ষা তথা জীবন ধারণের জন্য নির্ভর করতে হয় দুটি মৌলিক উপাদানের উপর, সেগুলি জল, মাটি, সূর্যালোক, বায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী। এই উপাদানগুলির মধ্যে মানুষ নিজে প্রাণী উপাদান এবং মানুষ ছাড়া অন্যান্য সজীব উপাদানগুলির পরিবেশকে দূষিত করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেই। অথচ মানুষ নিজে বুদ্ধিমান ও উন্নত জীব হওয়া সত্ত্বেও দূষণে তার ভূমিকা যথেষ্ট। এই বিষয়ে মানুষের যথেষ্ট সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। সমাজের সমস্ত মানুষকে সচেতন করার এই বিষয়টিই হল সামাজিক সচেতনতা।

(ii) বাস্তব জীবন পরিস্থিতি উপলব্ধি (Exposure to real life situation) :

পরিবেশ ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় পরিবেশের গুরুত্ব, মানুষের করণীয় ও দায়িত্ব এই বিষয়গুলিকে নিয়ে চিন্তা করতে হলে মানুষকে তার নিজের বাস্তব জীবন পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রতিটি স্বতন্ত্র পারিবেশিক পরিস্থিতিতে সেখানকার মানুষকে উপলব্ধি করার দরকার বাস্তব জীবন পরিস্থিতি বা সেখানকার সমস্যাগুলিকে নিয়ে। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের যেমন বৃক্ষচ্ছেদন ও ভূমিক্ষয় সম্পর্কে সচেতন করা দরকার তেমনি সমতলের মানুষের জ্ঞান থাকা দরকার জলদূষণ, মাটি দূষণ, বায়ুদূষণ প্রভৃতি সম্পর্কে।

(iii) পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয় ধারণা (Concept of environment conservation) :

পরিবেশে অবস্থানকারী বস্তুসমূহ বা উপাদানগুলির প্রকৃতপক্ষে বিনাশ ঘটে না, ঘটে সেগুলির রূপান্তর। বস্তু বা উপাদানগুলির এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশকে মানুষের সংযমী ও বিবেচনাধর্মী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সংরক্ষণ গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজবদ্ধ মানুষের সমস্ত রকম উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকৃতির সজীব ও জড় উপাদানগুলির যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণবিদদের যুক্তিসম্মত নির্দেশ কার্যকরী করাকে বলা হয় **পরিবেশ সুরক্ষা**। এই প্রসঙ্গেই এসেছে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি। এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা থাকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(iv) স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable development) :

প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে এবং এগুলির পরিবর্ত দ্রব্য উদ্ভাবন করতে না পারলে মানুষের প্রয়োজনীয় সীমিত সম্পদমূলক উপাদানগুলি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই ঘটনা পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। এই পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রসঙ্গটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

- স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে বর্তমান চাহিদা যেমন মেটানো যায় তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না।
- স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং মানুষের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

- স্থিতিশীল উন্নয়ন সামাজিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় রক্ষা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে হ্রাস করতে সক্ষম।

স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকটি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা একটি অতীব উল্লেখযোগ্য বিষয় যা শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বিস্তৃতি ঘটানো দরকার আছে সমস্ত রকম মানুষের মধ্যে। পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কতকগুলি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—

(ক) ক্ষেত্র সমীক্ষা সম্পাদন
(খ) অনুসন্ধান মূলক কার্যসম্পাদন
(গ) প্রকল্পমূলক ক্রিয়া সম্পাদন
(ঘ) প্রচারকার্য, বিতর্কসভার আয়োজন, সেমিনার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হলে যে কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্মাণ ও বাস্তবায়িত করার পর প্রতিবেদন লিখনের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

❑ **পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচির চিত্র**

চিত্র-১

Scanned with CamScanner

চিত্র-২

চিত্র-৩

প্রতিবেদন লিখন (Reporting) এর কাজটি নিম্নলিখিত ছক বা ফর্ম্যাটকে (format) অনুসরণ করে করা যেতে পারে :

● **প্রতিবেদন লিখন (Reporting) :**

(১) **ভূমিকা (Introduction) :** পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি সম্পর্কে দু-চারটি কথা, তার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করতে হবে। পরিবেশ সচেতনতার যে দিকটি সম্পর্কে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হবে।

(২) **উদ্দেশ্য (Objectives) :** পরিবেশ সচেতনতার যে দিকটি কর্মসূচি সংগঠিতকরণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যগুলি পয়েন্ট ভিত্তিক উল্লেখ করতে হবে।

(৩) **কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work) :** পরিবেশ সচেতনতার সুনির্দিষ্ট দিকটি যা সংগঠিত করা হচ্ছে বা হয়েছে তার বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তুলে ধরতে হবে। কর্ম পরিকল্পনাটি পর্যায়ক্রমিক ভাবে কীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার পরিকল্পিত বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা থাকবে।

(৪) **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan) :** আর্থিক সংস্থানের বিষয়, তা খরচ করার সুনির্দিষ্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি স্বচ্ছ রূপরেখা থাকবে এই অংশে।

(৫) **কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme) :** গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে কীভাবে সমগ্র কর্মসূচিটি সংগঠিত করা হয়েছে তা আনুপূর্বিক বিবৃত করা হবে এই অংশটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য, চিত্রাবলি পরিবেশিত করা হবে।

(৬) **প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and importance) :** পরিবেশ সচেতনতার সুনির্দিষ্ট দিকটি যা সংগঠিত করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে কতখানি তা উল্লেখ করতে হবে।

(৭) **উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remarks) :** সমগ্র কর্মসূচি রূপায়ণ তথা সংগঠিত করার পর উপসংহারমূলক সামান্য আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য এই অংশে স্থান পাবে।

(৮) **কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) :** সমগ্র কর্মসূচিটি পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করতে গিয়ে যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিকটি তুলে ধরতে হবে সযত্নে ও আন্তরিকভাবে।

পরিবেশ সচেতনতা প্রসঙ্গে কয়েকটি দিক : পরিবেশ সচেতনতা প্রসঙ্গে যে সমস্ত দিকগুলি পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল :

Scanned with CamScanner

(১) বৃক্ষছেদন হ্রাস ও বৃক্ষরোপণ কার্যাবলি
(২) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গ
(৩) পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন
(৪) বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোনো গ্রাম্য পরিবেশ সমীক্ষা
(৫) বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোনো শহরাঞ্চলের কোনো ওয়ার্ডের পরিবেশ সমীক্ষা ইত্যাদি।

(2) সামাজকি সচেতনতা (Social awareness) :

সামাজিক সচেনতার বিষয়টিতে দুটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, একটি সমাজ প্রসঙ্গ এবং অন্যটি হল সচেতনতার প্রসঙ্গ। আমরা প্রথমে সমাজ বা সামাজিক প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সমাজ সম্বন্ধে সমাজ তাত্ত্বিকগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে মোটামুটিভাবে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে—একটি হল প্রক্রিয়া এবং অন্যটি হল সুসংবদ্ধ কাঠামো। দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই পরস্পর পৃথক নয়, দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলশ্রুতি। **ম্যাকাইভার** এর মতো সমাজতাত্ত্বিক সমাজকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন, তাঁর মতে—সমাজ সতত পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্বন্ধজাল (ever-changing web of social relationships)। আবার সমাজকে যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক সুসংবদ্ধ কাঠামো হিসেবে দেখেছেন তাঁদের মতে— সমাজ হল ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার সমাবেশে গড়ে ওঠা সুসংবাদ এক কাঠামো।

সচেতনতার প্রসঙ্গটি আমরা আলোচনা করেছি পরিবেশ সচেতনতার প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে। সেখানে আমরা দেখেছি সচেতনতা বলতে বোঝায় চেতনা বা উপলব্ধির সঙ্গে অর্থাৎ দেখেশুনে বুঝে কার্য-সম্পাদন করা।

সুতরাং সামাজিক সচেতনতা বলতে আমরা বোঝাতে পারি সমাজের সমস্ত সদস্য বা মানুষকে জীবন পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলি বিষয়ে সচেতন করার প্রসঙ্গ।

পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার মতো সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত জরুরি হল সচেতনতার শিক্ষা (awarness education)। এই ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়া সমাজবদ্ধ মানুষকে পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সামাজিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক এক অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ। সমাজতাত্ত্বিক **জিনসবার্গ** (Ginberg) এর মতানুসারে প্রধান গোষ্ঠী আর প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ই সামাজিক কাঠামো। অন্যদিকে **স্যামুয়েল কোনিগ** (Samuel Koenig) এর মতানুসারে মানুষের কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যেই রয়েছে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রা

সংক্রান্ত নানাবিধ মানবিক সম্পর্ক। এই সমস্ত পরিবর্তনশীল মানবিক সম্পর্কই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। মানব সমাজের গঠনগত দিক থেকে তার কার্যকারণ দিক পৃথক করা সম্ভব নয়। বরং সামগ্রিক দিক থেকে বলা যেতে পারে সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বিত রূপই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। এই সামাজিক প্রক্রিয়াই সমাজকে করে তোলে গতিশীল। এই সামাজিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরন প্রসঙ্গে **পার্ক ও বার্জেস** (Park and Burges) যা বলেছেন তা হল :

(i) প্রতিযোগিতা (Competition)
(ii) দ্বন্দ্ব (Conflict)
(iii) উপযোজন (accomodation)
(iv) আত্তীকরণ

সমাজতাত্ত্বিক **মারটন** এবং **ম্যাকাইভার** উপরিউক্ত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন সহযোগিতাকে (co-operation)। এই সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সহযোগিতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাধান প্রক্রিয়া বলে সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। সমাজের অস্তিত্ব সহযোগিতাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। সমাজতাত্ত্বিক সি. এইচ. কুলে (C. H. Cooley) তাঁর 'Social Organization' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক সচেতনতা ও বিচারশীল সহযোগিতা সম্প্রসারণই ইতিহাসের মূল ঘটনা এবং সহযোগিতার মতো সামাজিক প্রক্রিয়া ছাড়া সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক সতেনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজ ও সামাজিক ক্রিয়াকে যথাযথ অনুধাবন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক সচেতনতার বিভিন্ন দিক : যে-কোনো একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বা বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে বা জাতির জীবন ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতার বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা যেতে পারে। যেগুলি মানব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা তথা প্রগতির ধারাকে বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। সেইরকম কতকগুলি সামাজিক সচেতনতার দিক হল :

(i) সর্বজনীন শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রচার ও প্রসার,
(ii) বয়স্ক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার,
(iii) সমাজ জীবনে কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ,
(iv) সমাজ সেবামূলক ক্রিয়ার অংশগ্রহণ,
(v) সৃষ্টিশীল সামাজিক কাজের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন,
(vi) সমাজ কল্যাণমূলক মূল্যবোধ গঠন,
(vii) সামাজিক সংহতি স্থাপন,
(viii) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সামাজিক সচেতনতার উপরোক্ত বিভিন্ন দিকগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি সংগঠিতকরণ সম্ভব। এজন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সেগুলি হল :

(ক) ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্পাদন
(খ) অনুসন্ধানমূলক কার্য সম্পাদন
(গ) প্রকল্প ভিত্তিক কার্য সম্পাদন
(ঘ) প্রচারকার্য, বিতর্কসভা, সেমিনার বা আলোচনা চক্রে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি।

❑ **সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচির চিত্র**

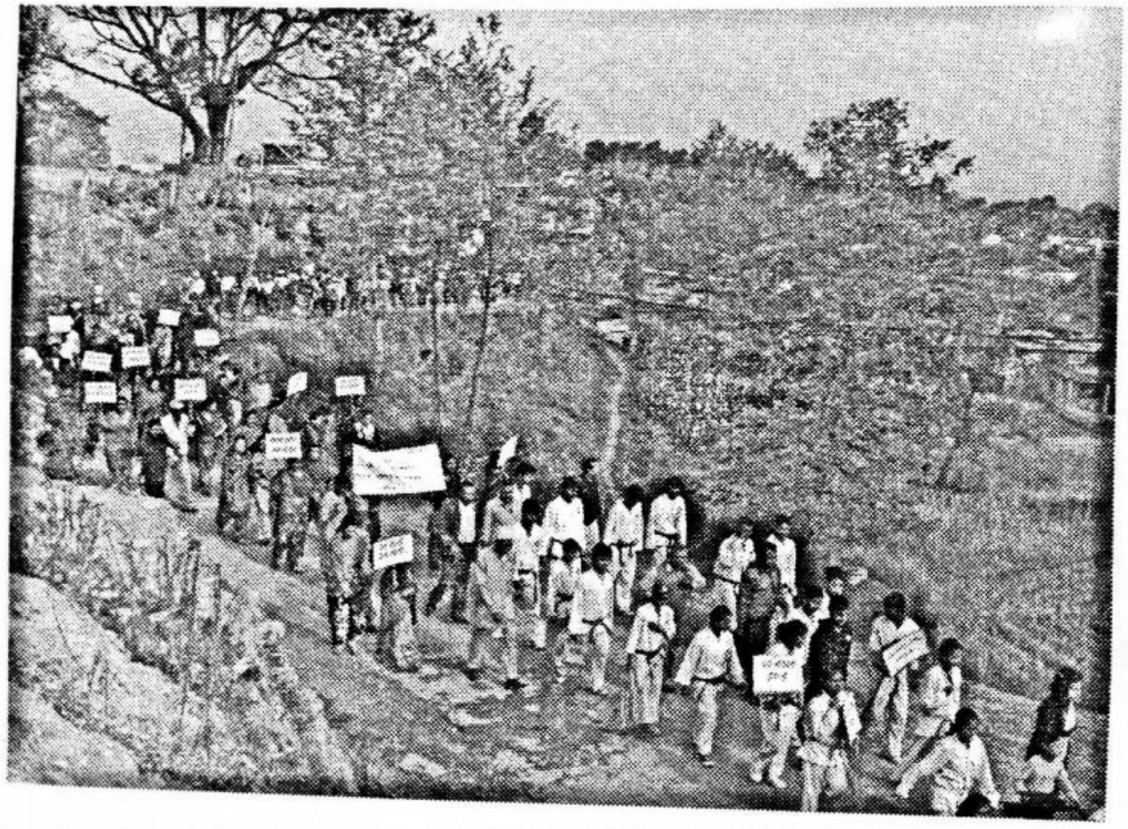

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মসূচি সংগঠিত করার পর প্রশিক্ষণরত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ভাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিবেদন উপস্থাপনের (Reporting) বিষয়টি নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে করা যেতে পারে।

(১) ভূমিকা (Introduction)
(২) উদ্দেশ্য (Objectives)
(৩) কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work)
(৪) আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan)
(৫) কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme)
(৬) প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance)
(৭) উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark)
(৮) কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

(4) রক্তদান (Blood Donation) :

'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল্য নাই'। এ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ আসে, মানুষ যায়। অনাদিকাল ধরে চলেছে যাওয়া আর আসার এই অনন্ত খেলা। মৃত্যু তো জন্মেরই অনিবার্য পরিণতি। মানুষ তাই যুগে যুগে এই মৃত্যুকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছে। চেয়েছে জন্মগ্রহণের ঋণকে অর্থময় করে তুলতে। মানুষের বড়ো পরিচয় সে সামাজিক জীব। পারস্পরিক সহযোগিতায় তার অগ্রগতি, পরহিতে প্রাণদান তার স্থায়ী সুখ, প্রেমমৈত্রীর মেলবন্ধনে তার অস্তিত্ব, বিকাশ। বিচ্ছিন্নতায় তার ধ্বংস। স্বার্থপরতায় তার অনগ্রসরতার অভিশাপ। যুগে যুগে তাই ইতিহাস -সাহিত্য-কাব্যে উচ্চারিত হয়েছে মানবসেবার জয়গান। 'রক্তদান' সেই পরহিত ব্রতেরই এক সুমহান ঐতিহ্য। বর্তমান বিশ্বে এর ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাই আরও বেশি।

সেই প্রাচীন যুগ থেকেই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছেন ভিষকশ্রেণি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও হয়েছে উন্নতি। কিন্তু এক মানুষের রক্ত অন্য মানুষের দেহে সঞ্চালিত করে তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল আধুনিক যুগে। এজন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে চলেছে দিনের পর দিন অক্লান্ত সাধনা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একদিন রক্তদানের প্রাথমিক জটিলতা দূর হল। তাঁরা দেখেছেন মানবদেহে অন্য প্রাণীর রক্ত সঞ্চালন করে কোনো ব্যক্তিতে নিরাময় করা যায় না। বরং তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। দেখেছেন মানুষের রক্তও নির্বিচারে অন্য মানুষের দেহে সঞ্চালিত করা যায় না। রক্তের উপাদান এক হলেও ব্যক্তিভেদে তার তারতম্য ঘটে। ভিয়েনার চিকিৎসা-বিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ড স্টিনার** এক স্মরণীয় নাম। তিনি রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে আরও গবেষণা করলেন। মানুষের রক্তকে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হল, A, B, AB আর O গ্রুপ। অবশ্য রক্তের গ্রুপ

Scanned with CamScanner

নির্ণয়ের প্রথম কৃতিত্ব বিজ্ঞানী **Landois**-এর ১৮৭৫ সাল। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলিয়েই সুস্থদেহের রক্ত তার মধ্যে সঞ্চালিত করা হয়। অবশ্য তার আগে Rh গ্রুপও দেখা হয়।

রক্তদান শুভচেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে এক মহান ব্রত। পরহিতের এর অভ্রান্ত প্রমাণ। মুমূর্ষ মানুষকে বাঁচানোর প্রয়োজনে ছাত্র-যুবক, কত খ্যাত-অখ্যাত মানুষ এসে মিলিত হয় এই কর্মযজ্ঞে। রক্তদান সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই রয়েছে ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে ২৫০ সি. সি. রক্ত এককালে টেনে নেওয়া যায়। এতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। ঘাটতি রক্ত সাতদিনের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যায়। শুধু রক্তদান নয়, রক্ত সংরক্ষণও এর একটি প্রয়োজনীয় দিক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন রক্তদানের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। রক্তসংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হয়েছে আবিষ্কৃত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্লাড-ব্যাঙ্ক। হাসপাতালে, চিকিৎসাকেন্দ্রে রয়েছে এই ব্লাড-ব্যাঙ্ক। প্রথম ব্লাড-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে। সময় ১৯৩৭ সাল। প্রতি সুস্থ মানবদেহ থেকে ২৫০ সি.সি. রক্ত নিয়ে একটি বোতলে রাখা হয়। বোতলটি ৫০ সি.সি. অ্যাসিড সাইট্রেট ডেক্সট্রেজ সম্বলিত। বোতলের রক্ত জমাট না বাঁধার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন বৈজ্ঞানিক **Houstain,** ১৯১৪ সালে। রক্তের গ্রুপ ধরে প্রত্যেকটি বোতলকে পৃথক পৃথক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। প্রতিটি বোতলের গায়ে সেই রক্তের ব্যবহারযোগ্য সময়সীমাও উল্লেখ থাকে। রক্তের অবিকৃত থাকা নির্ভর করে তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার ওপর। ৪° ডিগ্রি থেকে ৬° সেন্টিগ্রেড তাপসমন্বিত ফ্রিজে তিন মাস পর্যন্ত এই রক্ত বিশুদ্ধ থাকে।

রক্তদান মানুষের সদ্‌বৃত্তির এক অমলিন অভিজ্ঞান। এখানে সাদা-কালোর ভেদ ঘুচে যায়। ধর্মান্ধতার ঠাঁই নেই। সব রক্তের রং লাল। জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রক্তদান এক পবিত্র কর্তব্য। মনুষ্যত্বের প্রকাশ। মনে রাখতে হবে, রক্তদানের অর্থ একটি অকাল মৃত্যুকে রোধ করা, একজন মুমূর্ষকে বাঁচিয়ে তোলা। এ জনসেবারই অঙ্গ। মানুষ নামেরই বড়ো পরিচয়। স্বার্থপরতার পাষাণ প্রাচীরে আজ মানুষের বিবেক মাথা কুটছে। কেঁদে কেঁদে ফিরছে এক দগ্ধ প্রাণ। রক্তদান হয়তো মানুষের এই কান্নার অবসান, দহন-জ্বালায় শীতল প্রলেপ। সময় এসেছে এই মহান ব্রতকে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার। সময় এসেছে নবজাতকের কাছে এক মহৎ অঙ্গীকার রেখে যাওয়ার। এ অঙ্গীকার মানবতার, এ অঙ্গীকার নতুন করে উজ্জীবনের, এ অঙ্গীকার স্বার্থপরতার নির্মোক ভাঙার, আত্মপরতা বলিদানের।

● **রক্তদানের গুরুত্ব :**

(১) রক্ত মানবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষ প্রতিনিয়ত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করছে। সেই খাদ্য পরিপাক যন্ত্রের নানা ক্রিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে ও দেহের ভিতরকার হরমোন ইত্যাদির সংশ্লেষে রক্তে পরিণত হচ্ছে।

(২) এই রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত হয়, সেজন্যেই মানুষ সক্রিয় ও সজীব, রক্তই জীবন। রক্তের অভাবে মৃত্যু। রক্তই প্রাণের বিকল্প। কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজও রক্ত তৈরি সম্ভব হয় নি। তাই রক্তের প্রয়োজনে মানুষ মানুষের কাছেই ছুটে আসে।

(৩) রক্তের বিকল্প রক্তই। সতেজ রক্তের ছোঁয়া পেয়েই আর্ত মরণাপন্ন মানুষ বেঁচে উঠে।

(৪) প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণ রক্ত মানুষের শরীরে থাকতে পারে। নানা কারণে দেহে রক্তের পরিমাণ কমে। ক্রমাগত রোগভোগের ফলে রক্তের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। দুর্ঘটনায় অত্যধিক রক্তক্ষরণ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বাড়ছে। রক্তের অভাবে হাজার হাজার শিশুর জীবনে নেমে আসে অকালমৃত্যুর অভিশাপ। প্রতিদিন মরছে প্রাণদায়ী সতেজ রক্তের অভাবে কত রোগাক্রান্ত মানুষ।

(৫) রক্তদানের মাধ্যমে যেমন সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যায় তেমনি অপর একটি জীবনকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভূত হয়।

(৬) অপরকে রক্তদানের মাধ্যমে অন্যদেরকেও এই দানে উৎসাহিত করা যায়।

● **রক্তদান শিবির :**

(১) ১৯২৫ সালে কলকাতায় শুরু হয় রক্তদান সঞ্চালনের কাজ। আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক মহকুমায় স্থাপিত হয়েছে ব্লাড-ব্যাঙ্ক।

(২) সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে রক্তদানে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

(৩) রক্তদানের কাজে এগিয়ে এসেছে অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এর জন্য আলোচনাচক্র, স্লাইড-প্রদর্শন ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দিন দিনই রক্তদানের সংখ্যা বাড়ছে। এগিয়ে এসেছেন অনেক সমাজসচেতন মানুষ। এ কাজে মহিলারাও পিছিয়ে নেই।

(৪) আর্ত পীড়িতের প্রয়োজনে তাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। এগিয়ে এসেছে ক্লাব সংঘ স্কুল কলেজ থেকে যুব-ছাত্র-জনতা।

(৫) স্থানীয় কোনো ক্লাবে কিংবা পূজা প্রাঙ্গণে, কোনো বিশেষ দিনে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা যেতে পারে।

(৬) স্থানীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম কিংবা মৃত্যু দিনে রক্ত সংগ্রহের অভিযান করা যেতে পারে।

(৭) স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানে খোলা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। খেলোয়াড় রক্ত দেন। রক্ত দেন অভিনেতা -শিল্পী -সাহিত্যিক। রক্তদানে অংশ নেন বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ।

Scanned with CamScanner

❑ রক্তদান কর্মসূচির চিত্র

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মসূচি সংগঠিত করার পর প্রশিক্ষণরত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ভাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিবেদন উপস্থাপনের (Reporting) বিষয়টি নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে করা যেতে পারে।

(১) ভূমিকা (Introduction)
(২) উদ্দেশ্য (Objectives)
(৩) কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work)
(৪) আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan)
(৫) কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme)
(৬) প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance)
(৭) উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark)
(৮) কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)

নমুনা-১

বিদ্যালয়ের নাম : **শ্রেণি ও বিভাগ :** নবম **গড় বয়স :** ১৫ বছর **সময় :** ৪০ মিনিট **শিক্ষকের নাম :** **তারিখ :**	**বিষয়:** ইতিহাস **পাঠ-একক:** ভারতীয় ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব **উপ-একক:** (i) 'ভারতবর্ষ' নামকরণ (ii) ভৌগোলিক উপাদানসমূহ ও তার প্রভাব (iii) আদিম জনগোষ্ঠী (iv) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (v) ইতিহাসের উপাদান—(ক) সাহিত্যিক উপাদান (খ) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। **আজকের পাঠ:** বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

Scanned with CamScanner

Planning Stage

Instructional Objectives : আজকের পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আচরণগত পরিবর্তনগত দেখা যাবে—

(i) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কারণ বলতে পারবে।

(ii) ভৌগোলিক ঐক্যের কথা বলতে পারবে।

(iii) সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পর্ক বলতে পারবে।

(iv) সংস্কৃতি ভাষার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(v) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব নিয়ে বলতে পারবে।

(vi) রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা দিতে পারবে।

(vii) ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম কীভাবে ঐক্যবোধ গড়ে তুলেছিল তা বলতে পারবে।

Engry Level Behaviour Testing:

(i) ভারতবর্ষের নামকরণ

(ii) ভৌগোলিক উপাদানসমূহের প্রভাব

(iii) আদিম জনগোষ্ঠী

উপরোক্ত বিষয়গুলি পূর্বের ক্লাসে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা থাকবে।

Method of Teaching : শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়াবেন। একইসঙ্গে তিনি লক্ষ রাখবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে।

Teaching Aids : (i) সমকালীন ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক মানচিত্র (ii) পয়েন্টার।

Teaching Learning Process

Preactive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
ENGAGEMENT	পূর্বপাঠের সংক্ষিপ্ত আলোচনা	সুপ্রভাত ছাত্রছাত্রীরা। আমরা ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা করলাম। কী কী বলা হয়েছে বলতে পারো? ঠিক বলেছ। এতদিনে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ প্রত্যেকটি উপাদান, মানুষ, ভাষা এদের মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক। কিন্তু বিরোধ কি খুব বেশি দেখা যায়? কারণ বলতে পারো।? এই উত্তর নিয়েই আমরা আলোচনা করব। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'।	শিক্ষার্থীরা সুপ্রভাত বলবে। নামকরণ, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভাগ, আদিম জনগোষ্ঠী। হ্যাঁ স্যার। না স্যার শিক্ষার্থীরা নীরব থাকবে।	শিক্ষার্থীরা পূর্বপাঠ বলতে পারবে।
Interactive Stage (Exploration, Explanation, Elaboration	প্রাথমিক ধারণা ভৌগোলিক ঐক্যবোধ	এই কয়দিনের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে যুগযুগ ধরে বিভিন্ন জাতি ভারতে এসেছে ও তারা বসতিস্থাপন করেছে। তাদের চেহারা, বর্ণ, ভাষা সব আলাদা। এই বৈচিত্র্যের কারণেই ভারতকে 'বিশ্বের সারাংশ' বলা হয়। কিন্তু এত বিভিন্নতার মধ্যেও এক ঐক্যের সুর চিরকাল বেজে এসেছে। একে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক' বলেছেন। এই ঐক্য গড়ে ওঠার পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এই কারণগুলো এখন আলোচনা করা হবে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভূ-ভাগ 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত। 'মনুসংহিতা' ও 'বিষ্ণুপুরাণে' এই ঐক্য সম্পর্কে শ্লোক	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	শিক্ষার্থীরা ঐক্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত বলতে পারবে।

Scanned with CamScanner

Interactive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
(Exploration, Explanation, Elaboration)		আছে। ভারতের তীর্থস্থানগুলি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তীর্থযাত্রার মাধ্যমে একজন ভারতবাসী একাত্ম অনুভব করে। 'জনগণমন' বলতে এই বিশাল ভূখণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ভারতবাসীর কথাই বলা হয়। মানচিত্র দেখ (শিক্ষক মহাশয় মানচিত্র দেখাবেন)।	শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখবে।	শিক্ষার্থীরা ভৌগোলিক ঐক্যবোধ নিয়ে বলতে পারবে
	সাংস্কৃতিক ঐক্য	যুগ যুগ ধরে আর্য, পারসিক, শক, হুণ, মোগল, পাঠান বিভিন্ন জাতি তাদের সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে কিন্তু তারা ভারতের সংস্কৃতির ঐক্য নষ্ট করতে পারেনি বরং সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যমে তারা ভারতকে সাংস্কৃতিক ঐক্য সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে। ফলে ভারতে একটি মৌলিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে—যার উদাহরণ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে	শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক ঐক্যর ধারণা দিতে পারবে।
	সংস্কৃত ভাষার প্রভাব	ভারতে প্রায় দুশোর বেশি ভাষা ও উপভাষা থাকলেও বেশিরভাগ ভাষা মূল কয়েকটি ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলো বাদ দিলে বেশিরভাগ ভাষা সংস্কৃতি ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তাই সংস্কৃতি ভাষা বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। লিপির দিক থেকে বলা যায়, উত্তর ভারতের অধিকাংশ লিপির উৎপত্তি হয়েছে ব্রাহ্মলিপি থেকে।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে	সংস্কৃত ভাষা কীভাবে ঐক্য বজায় রেখে তা বলতে পারবে।
	বিশ্ব-বিদ্যলয়ের প্রভাব	ভারতীয় ঐক্য বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মুখ্য ভূমিকা আছে। বারাণসী, তক্ষশিলা, মথুরা, নালন্দা,		

Interactive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
(Exploration, Explanation, Elaboration)		বিক্রমশীলা, নবদ্বীপ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যুগ যুগ ধরে হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসত। ফলে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে	শিক্ষার্থীরা ঐক্য গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবে।
	রাজনৈতিক ঐক্য	প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য থাকলেও রাজনৈতিক ঐক্যর আদর্শ কিন্তু প্রাচীন। 'ভারতবর্ষ' নামটির সঙ্গে সার্বভৌম অধীশ্বরের গুরুত্ব জড়িয়ে আছে। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে 'রাজচক্রবর্তী', 'রাজাধিরাজ', 'সম্রাট' ইত্যাদি উপাধি ও 'রাজাসূয়', 'অশ্বমেধ' ইত্যাদি যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব বোঝাতে এটুকুই যথেষ্ট।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপাধি ও যজ্ঞের কথা বলতে পারবে।
	ইংরেজ শাসন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম	ইংরেজ শাসনে ভারতে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। রেলপথ স্থাপন ও ডাক ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্বয় সথাপন হয়। ইংরেজদের বিতাড়িত করতে ধর্ম, ভাষা, নিরপেক্ষভাবে সবাই একত্র হয়ে আন্দোলন করে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র সবাইকে একই মঞ্চে নিয়ে আসে।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে	ঐক্য গড়তে স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব বলতে পারবে।

Scanned with CamScanner

Postactive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
(Evaluation)	ভৌগোলিক ঐক্য	তাহলে আজ আমরা এই মহান দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিয়ে আলোচনা করলাম। তোমাদের ভালো লেগেছে? বলতে পারবে ভৌগোলিক ঐক্য কীভাবে রক্ষিত হয়েছে? বাঃ দারুণ বলেছো তো।	হ্যাঁ স্যার। ভারতবর্ষ বলতেই আমরা আসমুদ্র হিমাচল হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা বুঝি।	শিক্ষার্থীরা ভৌগোলিক ঐক্যর ধারণা দিতে পারবে।
	সাংস্কৃতিক ঐক্য	সাংস্কৃতিক ঐক্য বলতে আমরা কী বুঝি? একদম ঠিক বলেছো।	যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতি ভারতে এলেও তারা আমাদের ঐক্য গঠন করতে পারেনি বরং সংস্কৃতি আদান প্রদানের মাধ্যমে আরও দৃঢ় করে তুলেছে।	সাংস্কৃতি ঐক্য নিয়ে বলতে পারবে।
	সংস্কৃত ভাষার প্রভাব	সংস্কৃত ভাষা কীভাবে ঐক্য বজায় রেখেছে। ঠিক বলেছো।	দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি ভাষা বাদ দিলে বেশিরভাগ ভাষাই সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। এইভাবে সংস্কৃত ভাষা যোগসূত্র বজায় রেখেছে।	ঐক্য গড়ে তুলতে সংস্কৃতি ভাষার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
	বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রভাব	বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কীভাবে ঐক্য বজায় রেখেছে? ঠিক বলেছো।	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যুগ যুগ ধরে অনেক ছাত্র এসে পড়াশোনা করেছে। তারা একসঙ্গে থাকতে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে।	বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির প্রভাব নিয়ে বলতে পারবে।

Postactive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
(Evaluation)	রাজনৈতিক ঐক্য	সম্রাট বা রাজাদের কয়েকটি উপাধির নাম বলতে পারবে? হ্যাঁ, ঠিক।	রাজচক্রবর্তী, রাজাধিরাজ, সম্রাট।	শিক্ষার্থীরা উপাধি বলতে পারবে।
	স্বাধীনতা সংগ্রাম	কোন্ মন্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক করেছিল? বাঃ একদম ঠিক। আজ এই পর্যন্তই।	বন্দে মাতরম।	শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্যর ধারণা দিতে পারবে।

Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

নমুনা-২

বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি ও বিভাগ : সপ্তম/ক,গ গড় বয়স : ১৩ বছর সময় : ৪০ মিনিট শিক্ষকের নাম : তারিখ :	বিষয়: ইতিহাস পাঠ-একক: ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা উপ-একক: (i) প্রাচীন বাংলা (ii) শশাঙ্ক (iii) পাল বংশ (iv) সেন বংশ (v) আঞ্চলিক শক্তি-দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি (vi) ইসলাম ও ভারত (vii) ভারতে তুর্কি আক্রমণ (ক) বাংলায় তুর্কি আক্রমণ আজকের পাঠ: পাল বংশ

বংশ তালিকা

পাল বংশ

⬇

গোপাল

(৭৫০-৭৭০ খ্রী:)

⬇

ধর্মপাল

(৭৭০-৮১০ খ্রী:)

⬇

দেবপাল

(৮১০-৮৫০ খ্রী:)

⬇

প্রথম মহীপাল

(৯৮৮-১০৩৮ খ্রী:)

⬇

রামপাল

(১০৭৭-১১৩০ খ্রী:)

Scanned with CamScanner

Planning Stage

Instructional Objectives : আজকের পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আচরণগত পরিবর্তন দেখা যাবে—

(i) 'মাৎস্যন্যায়' সম্পর্কে বলতে পারবে।

(ii) পাল বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলতে পারবে।

(iii) পাল বংশের অন্যান্য শাসকদের সম্পর্কে বলতে পারবে।

(iv) কৈবর্ত বিদ্রোহ ধারণা দিতে পারবে।

Engry Level Behaviour Testing:

(i) শশাঙ্কের শাসনকাল

(ii) শশাঙ্কের সাম্রাজ্য

(iii) কর্ণসুবর্ণ

(iv) শশাঙ্কের ধর্মীয় বিশ্বাস

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পূর্বের ক্লাসে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা আছে।

Method of Teaching : শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়াবেন। একইসঙ্গে তিনি লক্ষ রাখবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে আলোচনা অংশগ্রহণ করে।

Teaching Aids : (i) সমকালীন ভারতবর্ষের একটি রাজনৈতিক মানচিত্র (ii) পয়েন্টার।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Teaching Learning Process

Preactive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
ENGAGEMENT	পূর্বপাঠের আলোচনা	সুপ্রভাত ছাত্রছাত্রীরা। আমরা কয়েকদিন ধরেই ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ধারার কথা পড়ছি। গতকাল কী আলোচনা করেছিলাম মনে আছে? ঠিক। শশাঙ্ক কোথাকার রাজা ছিলেন? শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার কতদূর পর্যন্ত ছিল? ঠিক বলেছো। শশাঙ্ক ধর্মে কী ছিলেন বলতে পারবে? একদম ঠিক।	শিক্ষার্থীরা সুপ্রভাত জানাবে। শশাঙ্ক। গৌড়। উত্তর পশ্চিম বারাণসী শৈব	শিক্ষার্থীরা পূর্বপাঠের কথা বলতে পারবে।
	পর্যবেক্ষণ	আজ আমরা শশাঙ্কের পর বাংলার কথা ও পাল বংশের কথা আলোচনা করব।		
Interactive Stage (Exploration, Explanation, Elaboration) Exploration	বরেন্দ্র	তোমরা বাংলার অঞ্চল পড়ার সময় বরেন্দ্রর নাম শুনেছিলে? বরেন্দ্র কোন জায়গাটা বলতে পারবে? বাঃ ঠিক বলেছো। এই বরেন্দ্র অঞ্চলেই মনে করা হয় পাল বংশ শাসন করেছিল।	হ্যাঁ স্যার ভাগীরথী ও করতোয়া নদীর মাঝখানে বরেন্দ্র অবস্থিত।	বরেন্দ্রর স্থান নির্দেশ করতে পারবে।
Exploration	মাৎস্যন্যায়	কিন্তু পাল বংশ আলোচনা করার আগে বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করে নিলে ভালো হবে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় আরাজকতা ছিল। ওই	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	মাৎস্যন্যায়ের ধারণা দিতে পারবে।

Scanned with CamScanner

Preac-tive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
		যুগে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজের এলাকা ইচ্ছামতো স্বাধীন করে শাসন করতো। কোনো কেন্দ্রীয় শাসক ছিল না। বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলে, তেমনি সবল লোক দুর্বলের উপর শাসন করত। একে মাৎসন্যায় বলে।		
Interac-tive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
Expla-nation	গোপাল	বছরের পর বছর এই অরাজকতা চলার পর বাংলার প্রভাবশালী লোকেরা অষ্টম শতকের মাঝামাঝি গোপাল নামে একজনকে রাজা নির্বাচিত করে (আনুমানিক ৭৫০ খ্রী:)। এই সময় থেকেই বাংলার পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়। গোপাল বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে নিজের শাসনের আওতায় এনেছিলেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	শিক্ষার্থীরা পাল বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলতে পারবে।
	ধর্মপাল ও দেবপাল	গোপালের ছেলে ধর্মপাল (৭৭৪-৮০৬) উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করে যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম চলছিল তাতে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মপালের ছেলে দেবপাল সাম্রাজ্যবিস্তার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং উত্তর পশ্চিমে কম্বোজ দেশ থেকে পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	দেবপালের রাজ্যবিস্তার নিয়ে বলতে পারবে।

Interac-tive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
Expla-nation	পরবর্তী পাল শাসকগণ	দেবপালের পর পালদের ক্ষমতা কমতে শুরু করে কারণ নিজেদের মধ্যে কলহ। এছাড়া দাক্ষিণাত্যের আঞ্চলিক শক্তি ও ওড়িশার শাসকরা বাংলায় আক্রমণ করে। একাদশ শতকে রামপাল রাজা হন। এইসময় কৈবর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	পাল শাসনের দুর্বলতার কথা বলতে পারবে
	কৈবর্ত বিদ্রোহ	কৈবর্তরা ছিল মাঝি বা জেলে। তিনজন বিদ্রোহীর কথা জানা যায়—দিব্য, রুদোক এবং ভীম। দিব্য ছিলেন পাল রাষ্ট্রেরই কর্মচারী। তারা পাল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও বরেন্দ্র দখল করে নেয়।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে বলতে পারবে।
	রামপাল	রামপাল (১০৭২-১১২৬) পরে এই বরেন্দ্র উদ্ধার করেন। রামপালের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পাল রাজত্ব কার্যত শেষ হয়ে যায়।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	রামপাল সম্পর্কে বলতে পারবে।
Interac-tive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
Elabo-ration	শাসকদের উত্থান পতন	তাহলে এই ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীভাবে শাসক আসে যায়। কখনও শাসক উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারে না যেমন শশাঙ্ক, কখনও বা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শাসনব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়, যেমন—পালবংশ।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।	শিক্ষার্থীরা শাসকদের দুর্বলতা নিয়ে বলতে পারবে।

Scanned with CamScanner

Postactive Stage	Input	Teacher's activities	Learners' activities	Learning Outcome
Evaluation	মাৎস্যন্যায়	আচ্ছা মাৎসন্যায় কাকে বলে? একদম ঠিক বলেছো	বাংলায় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অরাজকতা ছিল। প্রত্যেক শক্তিশালী লোক নিজ নিজ এলাকা শাসন করত। একেই মাৎস্যন্যায় বলে।	মাৎসন্যায়ের ধারণা দিতে পারবে।
	গোপাল	পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ঠিক।	গোপাল	গোপালের নাম বলতে পারবে।
	দেবপাল	কে পাল বংশের রাজ্যবিস্তার করেছিল? ঠিক বলেছো।	দেবপাল	দেব পালের নাম বলতে পারবে।
	কৈবর্ত বিদ্রোহ	কৈবর্ত বিদ্রোহের দুজন বিদ্রোহীর নাম বল? একদম ঠিক। আজ এই পর্যন্তই থাক।	দিব্য ও রুদোক।	বিদ্রোহীর নাম বলতে পারবে।

Class Note .....

Scanned with CamScanner

আমাদের প্রকাশনায় B.Ed. (2 Years)-এর অন্যান্য বই

SEMESTER-I

- **শিশু ও বিকাশ** ড. বিজন সরকার
- **সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  তারিণী হালদার ❖ বিনায়ক চন্দ
- **পাঠক্রমে ভাষার বিস্তৃতি**
  ড. বীরবল সাহা ❖ শম্ভুনাথ মাজি
- **বিষয়বস্তুর ধারণা ও সম্পর্ক**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র ও বিষয়ের বোধ**
  ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ❖ ড. চন্দন অধিকারী
- **পাঠক্রমে ভাষার ভূমিকা** সোমনাথ হাজরা
- **Childhood and Growing up**
  Dr. P.K. Chand ❖ Dr. sujit Pal ❖ Rakibrita Biswas
- **পঠন প্রণালীর পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন**
  ড. বীরবল সাহা ❖ শম্ভুনাথ মাজি
- **পাঠ্যপুস্তক : পঠন ও প্রতিফলন**
  মহুয়া বন্ধু (চ্যাটার্জী) ❖ সন্দীপ শর্মা

SEMESTER-II

- **শিখন ও শিক্ষণ** ড. বিজন সরকার
- **প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম** (প্রথম ভাগ) তারিণী হালদার
- **নাটক ও শিক্ষায় চারুকলা** ড. সুজাতা রায় মান্না
- **Assessment for Learning**
  Dr. Parsuram Pradhan ❖ Dr. Mitali Panda
- **Learning & Teaching**
  Dr. Rajib Mukhopadhyay ❖ Dr. Mitali Panda
- **শিখনের মূল্যায়ন**
  অধ্যাপক (ড.) কমলকৃষ্ণ দে ❖ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট
  ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

SEMESTER-II & III (Semester II ও III-এর জন্য মেথড পেপারগুলি পৃথক খণ্ডে)

Pedagogy of Language Teaching

- **ভাষা শিক্ষণ তত্ত্ব (বাংলা)**
  ড. সুজাতা রাহা ❖ বৈশালী বসু
- **Thoughts & Practice in Teaching English**
  Sudhakar Sardar
- **নবরূপে সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ**
  গীতা দাস ❖ নিবেদিতা চৌধুরী

Pedagogy of Science Teaching

- **বিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (জীবনবিজ্ঞান)**
  ড. দেবী প্রসাদ নাগ চৌধুরী ❖ ড. সুজিত পাল ❖ অম্লান গাঙ্গুলি ❖ ড. মিতা হাওলাদার
- **বিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (ভৌতবিজ্ঞান)**
  ড. প্রতাপ কুমার জানা ❖ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট ❖ সম্পাদনা : ড. কমলকৃষ্ণ দে

Pedagogy of Mathematics Teaching

- **আধুনিক গণিত শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ** ড. সুরপতি প্রামানিক

Pedagogy of Social Science Teaching

- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ইতিহাস)**
  তারিণী হালদার ❖ গৌতম কুমার বিশ্বাস
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ভূগোল)**
  ড. জয়ারতি দাশগুপ্ত ❖ সম্পাদনা : ড. জয়ন্ত মেটে
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (দর্শন ও তর্কবিদ্যা)**
  কাকলি মুখোপাধ্যায়
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (শিক্ষাবিজ্ঞান)**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায় ❖ ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ

ebook.dascoaching.in

SEMESTER-IV

- **লিঙ্গবৈশিষ্ট্য বিদ্যালয় ও সমাজ**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায় ❖ উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **বিদ্যালয়, জেন্ডার ও সমাজ**
  ড. বীরবল সাহা ❖ শম্ভুনাথ মাজি
- **প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম** (দ্বিতীয় ভাগ)
  তারিণী হালদার ❖ ড. বিমান মিত্র
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় সংগঠন** ড. ঊর্মি চক্রবর্তী
- **বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষা**
  ড. জয়ন্ত চৌধুরী ❖ অরুণাভ সামন্ত
- **স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা**
  ড. দীপন চক্রবর্তী ❖ অরুণাভ সামন্ত
- **স্ব ধারণা** ড. বিজন সরকার
- **শান্তির জন্য শিক্ষা**
  তারিণী হালদার
- **নির্দেশনা ও পরামর্শদান**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **নির্দেশনা ও পরামর্শদান**
  মহুয়া বন্ধু (চ্যাটার্জী)
- **পরিবেশ শিক্ষা ও জনশিক্ষা**
  ড. দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী ❖ ড. সুজিত পাল
- **যোগ শিক্ষা** ড. মলয়কুমার মুখোপাধ্যায় ❖ ড. সুজিত পাল
- **বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ধারণা**
  ড. অমিতাভ রায় ❖ অরুণাভ সামন্ত

ISBN 81-89169-40-8
9788189169497

Scanned with CamScanner